কিশোর অপু

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কিশোর

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

শৈব্যা পুস্তকালয় ॥ কলিকাতা

শৈব্যা পুস্তকালয় ৮/১সি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩
থেকে রবীন বল কর্তৃক প্রকাশিত ও তাপসী প্রিণ্টার্স ৬, শিবু বিশ্বাস
লেন, কলিকাতা-৭০০০০৬ থেকে লীলা ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত।

আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ উপলক্ষে
সুলভ মূল্যে প্রকাশিত

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও অঙ্কন : গৌতম রায়

● ●

॥ আভাষ ॥
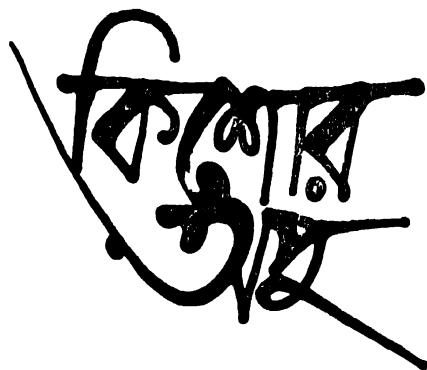
নিশ্চিন্দিপুর গ্রাম, সোনাডাঙার মাঠ, আতুরী ডাইনীর বাড়ি, প্রসন্নগুরুর পাঠশালা, নোনাগাঙের জল, বৈঁচি গাছের ঝোপ, কাশফুলের রাশি—সর্বজয়া, ইন্দির ঠাকরুণ, হরিহর, দুর্গা, অপু, লীলা—কাঠের ঘোড়া, আম আঁটির ভেঁপু আর টিনের বাঁশী—সব মিলেমিশে যেন রূপকথার রাজ্য, গ্রাম-বাংলার এক অপরূপ ছায়াছবি বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'।

সোনার কলমে লেখা বিভূতিভূষণের এই অনবদ্য চিত্র 'পথের পাঁচালী' কল্প-জগৎকেও যেন হার মানিয়েছে। অথচ এর মধ্যে বাংলার বাস্তব চিত্র, গ্রামীণ মানুষ-জন আর নিসর্গ নিষ্ঠার জীবন্ত প্রতিচ্ছবি দেখতে দেখতে একটা তৃপ্তির আবেশে মন ভরে যায়। পল্লী-বাংলার ফেলে আসা, ভুলে যাওয়া অনেক কিছুকেই যেন আবার ফিরে পাই আমরা।

রবীন্দ্র-পুরস্কারপ্রাপ্ত 'পথের পাঁচালী'র বিস্ময়কর লেখক বিভূতিভূষণ তাঁর এই গ্রন্থের মধ্যে যে অবিস্মরণীয় 'অপু'কে সৃষ্টি করে গেছেন—সে নাম, সে চরিত্র শাশ্বতকাল জাতির অন্তরে অনুরণিত হবে, গাঁথা হয়ে থাকবে। সেই মহান গ্রন্থ 'পথের পাঁচালী' থেকেই এই বই 'অপুর ছেলেবেলা'র জন্ম।

বিভূতিভূষণ ছোটদের জন্যে 'চাঁদের পাহাড়', 'মরণের ডঙ্কা বাজে', 'তালনবমী' প্রভৃতি যে সকল অনবদ্য গ্রন্থ সৃষ্টি করে গেছেন, 'পথের পাঁচালী' থেকে সৃষ্ট 'অপুর ছেলেবেলা' তাদের চেয়েও কিছু কম আকর্ষণীয় হয়নি। আর এ-কাহিনীকে সংক্ষিপ্তাকারে 'পথের পাঁচালী' থেকে ছোটদের জন্য যিনি রূপ দিয়েছেন, সেই ছোট্ট বিভূতিভূষণ হলেন, শ্রীমান্ তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বিভূতিভূষণেরই একমাত্র আত্মজ। ইতিমধ্যেই লেখক হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছেন তিনি।

আলোচ্য গ্রন্থের রূপদান প্রসঙ্গে তিনি এমনই বিজ্ঞতা ও কুশলী শিল্পীর পরিচয় দিয়েছেন, যা পড়ে ছোটরা শুধু আনন্দই পাবে না, তার সঙ্গে জ্ঞানার্জনও করবে। ছেলেমেয়েদের অভিভাবক ও শুদ্ধচিত্ত শিক্ষকদের উচিত এরূপ একখানি মূল্যবান গ্রন্থকে তাদের সামনে তুলে ধরে, তাদের জাতীয় আদর্শ ও দেশাত্মবোধকে জাগ্রত করতে সাহায্য করা।

শ্রীবসু মুখোপাধ্যায়

নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের একেবারে উত্তর প্রান্তে হরিহর রায়ের ক্ষুদ্র কোঠাবাড়ী। হরিহর সাধারণ অবস্থার গৃহস্থ, পৈতৃক আমলের সামান্য জমিজমার আয় ও দু-চারি ঘর শিষ্য-সেবকদের বার্ষিক প্রণামীর বন্দোবস্ত হইতে সাদাসিদা ভাবে সংসার চালাইতে থাকে।

পূর্ব দিন ছিল একাদশী। হরিহরের দূরসম্পর্কীয় দিদি ইন্দির ঠাকুরুণ সকালবেলায় ঘরের দাওয়ায় বসিয়া চালভাজার গুঁড়া জলখাবার খাইতেছে। হরিহরের ছয় বৎসরের মেয়েটি চুপ করিয়া পাশে বসিয়া আছে ও পাত্র হইতে তুলিবার পর হইতে মুখে পুরিবার পূর্ব পর্যন্ত প্রতিমুঠা ভাজার গুঁড়ার গতি অত্যন্ত করুণভাবে লক্ষ্য করিতেছে এবং মাঝে মাঝে ক্রমশূন্যায়মান কাঁসার জামবাটির দিকে হতাশভাবে চাহিতেছে। দু-একবার কি বলি করিয়াও যেন বলিতে পারিল না। ইন্দির ঠাকৃরুণ মুঠার পর মুঠা উঠাইয়া পাত্র নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়া খুকীর দিকে চাহিয়া বলিল, ও মা তোর জন্যে দুটো রেখে দেলাম না?—ওই দ্যাখো।

মেয়েটি করুণ চোখে বলিল, তা হোক্, পিতি, তুই খা—

দুটো পাকা বড় বীচে-কলার একটা হইতে আধখানা ভাঙিয়া ইন্দির ঠাকৃরুণ তাহার হাতে দিল। এবার খুকীর চোখ-মুখ উজ্জ্বল দেখাইল—সে পিসিমার হাত হইতে উপহার লইয়া মনোযোগের সহিত ধীরে ধীরে চুষিতে লাগিল।

ও ঘর হইতে তাহার মা ডাকিল, আবার ওখানে গিয়ে ধন্না দিয়ে বসে আছে? উঠে আয় ইদিকে!

ইন্দির ঠাকৃরুণ বলিল, থাক্ বৌ—আমার কাছে বসে আছে, ও কিছু করছে না। থাক্ বসে—

তবু তাহার মা শাসনের সুরে বলিল, না, কেনই বা খাবার সময় ওরকম বসে থাকবে? ওসব আমি পছন্দ করি নে, চলে আয় বলছি উঠে—

খুকী ভয়ে ভয়ে উঠিয়া গেল।

ইন্দির ঠাকরুণের সঙ্গে হরিহরের সম্পর্কটা বড় দূরের। মামার বাড়ীর সম্পর্কে কি রকমের বোন।

শোনা যায় পূর্বদেশীয় এক নামজাদা কুলীনের সঙ্গে ইন্দির ঠাকরুণের বিবাহ হইয়াছিল। স্বামী বিবাহের পর কালভদ্রে এ গ্রামে পদার্পণ করিতেন। এক-আধ রাত্রি কাটাইয়া, পথের খরচ ও কৌলীন্য-সম্মান আদায় করিয়া লইয়া, খাতায় দাগ আঁকিয়া পরবর্তী নম্বরের শ্বশুরবাড়ী অভিমুখে তল্পি-বাহকসহ রওনা হইতেন। কাজেই স্বামীকে ইন্দির ঠাকরুণ ভাল মনে করিতেই পারে না। বাপ-মায়ের মৃত্যুর পর ভাই-এর আশ্রয়ে দু-মুঠা অন্ন পাইয়া আসিতেছিল, কপালক্রমে সে ভাইও অল্প বয়সে মারা গেল। হরিহরের পিতা রামচাঁদ অল্প পরেই এ ভিটাতে বাড়ী তুলিলেন এবং সেই সময় হইতেই ইন্দির ঠাকরুণের এ সংসারে প্রথম প্রবেশ। সে সকল আজিকার কথা নহে।

তাহার পর অনেকদিন হইয়া গিয়াছে। শাখারীপুকুরে নাল ফলের বংশের পর বংশ কত আসিয়াছে, চলিয়া গিয়াছে। চক্রবর্তীদের ফাঁকা মাঠে সীতানাথ মুখুজ্যে নতুন কলমের বাগান বসাইল এবং সে সব গাছ আবার বুড়া হইতেও চলিল। কত ভিটায় নতুন গৃহস্থ বসিল, কত জনশূন্য হইয়া গেল, কত গোলোক চক্রবর্তী, ব্রজ চক্রবর্তী মরিয়া হাজিয়া গেল, ইছামতীর চলোর্মি-চঞ্চল স্বচ্ছ জলধারা অনন্ত কাল-প্রবাহের সঙ্গে পাল্লা দিয়া কুটার মত, ঢেউয়ের ফেনার মত, গ্রামের নীলকুঠির কত জন্‌সন্ টম্‌সন্ সাহেব, কত মজুমদারকে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গেল!

শুধু ইন্দির ঠাকরুণ এখনও বাঁচিয়া আছে। ১২৪০ সালের সে ছিপ্‌-ছিপে চেহারার হাস্যমুখী তরুণী নহে, পঁচাত্তর বৎসরের বু

কুব্জা, গাল তোব্ড়াইয়া গিয়াছে, মাজা ঈষৎ ভাঙিয়া শরীরের সামনে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, দূরের জিনিস আগের মত চোখে ঠাহর হয় না, হাত তুলিয়া যেন রৌদ্রের ঝাঁজ হইতে বাঁচাইবার ভঙ্গিতে চোখ ঢাকিয়া বলে, কে আসে ? নবীন ? বেহারী ? না, ও, তুমি রাজু...

হরিহরের ছোট্ট মেয়েটাকে সে একদণ্ড চোখের আড়াল করিতে পারে না—তাহার নিজেরও এক মেয়ে ছিল, নাম ছিল তার বিশ্বেশ্বরী। অল্প বয়সেই বিবাহ হয় এবং বিবাহের অল্প পরেই মারা যায়। হরিহরের মেয়ের মধ্যে বিশ্বেশ্বরী মৃত্যুপারের দেশ হইতে চল্লিশ বছর পরে তাহার অনাথা মায়ের কোলে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। চল্লিশ বছরের নিভিয়া যাওয়া ঘুমন্ত মাতৃত্ব মেয়েটার মুখের বিপন্ন অপ্রতিভ ভঙ্গিতে, অবোধ চোখের হাসিতে—এক মুহূর্তে সচকিত আগ্রহে, শেষ-হইতে-চলা জীবনের ব্যাকুল ক্ষুধায় জাগিয়া উঠে।

সর্বজয়া ইন্দির ঠাকুরুণের ঘরে আসে ক্বচিৎ কালেভদ্রে কখনো। কিন্তু সন্ধ্যার সময় তার মেয়ে ঘরের দাওয়ায় ছেঁড়া-কাঁথা-পাতা বিছানায় বসিয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত একমনে পিসিমার মুখে রূপকথা শোনে। খানিকক্ষণ এ গল্প ও গল্প শুনিবার পর খুকী বলে—পিতি, সেই ডাকাতের গপ্পটা বল্ তো! গ্রামের একঘর গৃহস্থ-বাড়ীতে পঞ্চাশ বছর আগে ডাকাতি হইয়াছিল, সেই গল্প। ইতিপূর্বে বহুবার বলা হইয়া গেলেও কয়েকদিনের ব্যবধানে উহার পুনরাবৃত্তি করিতে হয়, খুকী ছাড়ে না। তাহার পর সে পিসিমার মুখে ছড়া শোনে। সেকালের অনেক ছড়া ইন্দির ঠাকুরুণের মুখস্থ ছিল। অল্প বয়সে ঘাটে পথে সমবয়সী সঙ্গিনীদের কাছে ছড়া মুখস্থ বলিয়া তখনকার দিনে ইন্দির ঠাকুরুণ কত প্রশংসা আদায় করিয়াছে। তাহার পর অনেকদিন সে এরকম ধৈর্যশীল শ্রোতা পায় নাই; পাছে মরিচা পড়িয়া যায়, এইজন্য তাহার জানা সব ছড়াগুলিই আজকাল প্রতি সন্ধ্যায় একবার ক্ষুদ্র ভাইঝিটির কাছে

আবৃত্তি করিয়া ধার শানাইয়া রাখে। টানিয়া টানিয়া আবৃত্তি করে—

ও ললিতে চাঁপকলিতে একটা কথা শুন্‌সে'
রাধার ঘরে চোর ঢুকেছে—

এই পর্যন্ত বলিয়া সে হাসি-হাসি মুখে প্রতীক্ষার দৃষ্টিতে ভাইঝির দিকে চাহিয়া থাকে। খুকী উৎসহের সঙ্গে বলে—চুলোবাঁধা এক—মিন্‌সে।—'মি' অক্ষরটার উপর অকারণ জোর দিয়া ছোট্ট মাথাটি সামনে তাল রাখিবার ভাবে ঝুঁকাইয়া পদটার উচ্চারণ শেষ করে। ভারি আমোদ লাগে খুকীর।

তাহার পিসি ভাইঝিকে ঠকাইবার চেষ্টায় এমন সব ছড়া আবৃত্তি করে ও পাদপূরণের জন্য ছাড়িয়া দেয়, যাহা হয়তো দশ পনেরো দিন বলা হয় নাই—কিন্তু খুকী ঠিক মনে রাখে, তাহাকে ঠকানো কঠিন।

খানিক রাত্রে তাহার মা খাইতে ডাকিলে সে উঠিয়া যায়।
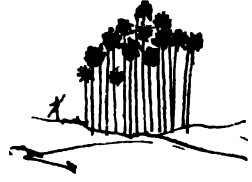
হরিহর রায়ের আদি বাসস্থান যশড়া-বিষ্ণুপুরের প্রাচীন ধনী-বংশ চৌধুরীরা নিষ্কর ভূমিদান করিয়া যে কয়েকঘর ব্রাহ্মণকে সেকালে গ্রামে বাস করাইয়াছিলেন, হরিহরের পূর্বপুরুষ বিষ্ণুরাম রায় তাহাদের মধ্যে একজন।

বৃটিশ শাসন তখনও দেশে বদ্ধমূল হয় নাই। যাতায়াতের পথ সকল ঘোর বিপদসঙ্কুল ও ঠগী, ঠ্যাঙাড়ে, জলদস্যু প্রভৃতিতে পূর্ণ থাকিত। এই ডাকাতের দল প্রায়ই গোয়ালা, বাগ্‌দী, বাউড়ী শ্রেণীর লোক। তাহারা অত্যন্ত বলবান,—লাঠি ও সড়কী চালানোতে সুনিপুণ ছিল। বহু গ্রামের নিভৃত প্রান্তে ইহাদের স্থাপিত ডাকাতে-কালীর মন্দিরের চিহ্ন এখনও বর্তমান আছে। দিনমানে ইহারা ভালমানুষ সাজিয়া বেড়াইত, রাত্রে কালীপূজা দিয়া দূর পল্লীতে গৃহস্থ-বাড়ী লুঠ করিতে বাহির হইত। তখনকার কালে অনেক সমৃদ্ধিশালী গৃহস্থও ডাকাতি করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিতেন। বাংলা দেশে বহু জমিদার ও অবস্থাপন্ন গৃহস্থের অর্থের মূলভিত্তি যে এই পূর্বপুরুষসঞ্চিত লুণ্ঠিত ধনরত্ন, যাঁহারাই প্রাচীন বাংলার কথা জানেন, তাঁহারা ইহাও জানেন।

বিষ্ণুরাম রায়ের পুত্র বীরু রায়ের এইরূপ অখ্যাতি ছিল। তাঁহার অধীন বেতনভোগী ঠ্যাঙাড়ে থাকিত। নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের উত্তরে যে কাঁচা সড়ক ওদিকে চুয়াডাঙা হইতে আসিয়া নবাবগঞ্জ হইয়া টাকী চলিয়া গিয়াছে, ওই সড়কের ধারে দিগন্তবিস্তৃত বিশাল সোনাডাঙার মাঠের মধ্যে, ঠাকুরঝি পুকুর নামক সেকালকার এক বড় পুকুরের ধারে ছিল ঠ্যাঙাড়েদের আড্ডা। পুকুরধারে

প্রকাণ্ড বটগাছের তলে তাহারা লুকাইয়া থাকিত এবং নিরীহ পথিককে মারিয়া তাহার যথাসর্বস্ব অপহরণ করিত। ঠ্যাঙাড়েদের কার্যপ্রণালী ছিল অদ্ভুত ধরনের। পথ-চলতি লোকের মাথায় লাঠির আঘাত করিয়া আগেই তাহাকে মারিয়া ফেলিয়া তবে তাহার কাছে অর্থান্বেষণ করিত—মারিয়া ফেলিবার পর এরূপ ঘটনাও বিচিত্র ছিল না যে, দেখা গেল নিহত ব্যক্তির কাছে সিকি পয়সাও নাই। পুকুরের মধ্যে লাস গুঁজিয়া রাখিয়া ঠ্যাঙ্গাড়েরা পরবর্তি শিকারের উপর দিয়া এ বৃথা শ্রমটুকু পোষাইয়া লইবার আশায় নিরীহমুখে পুকুরপাড়ের গাছতলায় ফিরিয়া যাইত। গ্রামের উত্তরে এই বিশাল মাঠের মধ্যে সেই বটগাছ আজও আছে, সড়কের ধারের একটা অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমিকে আজও ঠাকুরঝি পুকুর বলে। পুকুরের বিশেষ চিহ্ন নাই, চৌদ্দ আনা ভরাট হইয়া গিয়াছে—ধান আবাদ করিবার সময় চাষীদের লাঙলের ফালে সেই নাবাল জমিটুকু হইতে আজও মাঝে মাঝে নরমুণ্ড উঠিয়া থাকে।

শোনা যায় পূর্বদেশীয় এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বালক-পুত্রকে সঙ্গে করিয়া কালীগঞ্জ অঞ্চল হইতে টাকী শ্রীপুরের ওদিকে নিজের দেশে ফিরিতেছিলেন। সময়টা কার্তিক মাসের শেষ, কন্যার বিবাহের অর্থ সংগ্রহের জন্য ব্রাহ্মণ বিদেশে বাহির হইয়াছিলেন, সঙ্গে কিছু অর্থ ও জিনিসপত্র ছিল। হরিদাসপুরের বাজারে চটিতে রন্ধন-আহারাদি করিয়া তাঁহারা দুপুরের কিছু পরে পুনরায় বাহির হইয়া পড়িলেন, ইচ্ছা রহিল যে সম্মুখে পাঁচক্রোশ দূরের নবাবগঞ্জ বাজারের চটিতে রাত্রি যাপন করিবেন। পথের বিপদ তাঁদের অবিদিত ছিল না, কিন্তু আন্দাজ করিতে কিরূপ ভুল হইয়াছিল—কার্তিক মাসের ছোট দিন, নবাবগঞ্জের বাজারে পৌঁছিবার অনেক পূর্বে সোনাডাঙা মাঠের মধ্যে সূর্যকে ডুবুডুবু দেখিয়া তাঁহারা দ্রুতপদে হাঁটিতে আরম্ভ করিলেন' কিন্তু ঠাকুরঝি পুকুরের ধারে আসিতেই তাঁহারা ঠ্যাঙাড়ের হাতে ধরা পড়েন।

দস্যুরা প্রথম ব্রাহ্মণের মাথায় এক লাঠি বসাইয়া দিতেই তিনি প্রাণভয়ে চীৎকার করিতে করিতে পথ ছাড়িয়া মাঠের দিকে ছুটিলেন, ছেলেও বাবার পিছু পিছু ছুটিল। কিন্তু একজন বৃদ্ধ অপরে বালক,—ঠ্যাঙাড়েদের সঙ্গে কতক্ষণ দৌড়-পাল্লা দিবে? অল্পক্ষণেই তাহারা আসিয়া শিকারের নাগাল ধরিয়া ঘেরাও করিয়া ফেলিল। নিরূপায় ব্রাহ্মণ নাকি প্রস্তাব করেন যে, তাঁহাকে মারা হয় ক্ষতি নাই, কিন্তু তাঁহার পুত্রের জীবনদান—বংশের একমাত্র পুত্র—পিণ্ডলোপ ইত্যাদি। ঘটনাক্রমে বীরু রায়ও নাকি সেদিনের দলের মধ্যে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। ব্রাহ্মণ বলিয়া চিনিতে পারিয়া প্রাণভয়ার্ত বৃদ্ধ তাঁহার হাতে-পায়ে পড়িয়া অন্তত পুত্রটির প্রাণরক্ষার জন্য বহু কাকুতি মিনতি করেন—কিন্তু সরল ব্রাহ্মণ বুঝেন নাই, তাঁহার বংশের পিণ্ডলোপের আশঙ্কায় অপরের মাথাব্যথা হইবার কথা নহে, বরং তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিলে ঠাঙাড়ে দলের অনুরূপ আশঙ্কার কারণ আছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে হতভাগ্য পিতাপুত্রের মৃতদেহ একসঙ্গে ঠাণ্ডা হেমন্ত রাতে ঠাকুরঝি পুকুরের জলে টোকাপানা ও শ্যামাঘাসের দামের মধ্যে পুঁতিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করিয়া বীরু রায় বাটী চলিয়া আসিলেন।

এই ঘটনার বেশী দিন পরে নয়, ঠিক পর বৎসর পূজার সময়। বাঙ্গলা ১২৩৮ সাল বীরু রায় সপরিবারে নৌকাযোগে তাঁহার শ্বশুরবাড়ী হলুদবেড়ে হইতে ফিরিতেছিলেন। নকীপুরের নীচের বড় নোনা গাঙ পার হইয়া মধুমতীতে পড়িবার পর দুই দিনের জোয়ার খাইয়া তবে আসিয়া দক্ষিণ শ্রীপুরের কাছে ইছামতীতে পড়িতে হইত। সেখান হইতে আর দিন-চারেকের পথ আসিলেই স্বগ্রাম।

সারাদিন বাহিয়া আসিয়া অপরাহ্ণে টাকীর ঘাটে নৌকা লাগিল। বাড়ীতে পূজা হইত। টাকীর বাজার হইতে পূজার দ্রব্যাদি কিনিয়া রাত্রিতে সেখানে অবস্থান করিবার পর প্রত্যুষে নৌকা ছাড়িয়া সকলে দেশের দিকে রওনা হইলেন। দিন দুই

পরে সন্ধ্যার দিকে ধলচিতের বড় খাল ও ইছামতীর মোহনায় একটা নির্জন চরে জোয়ারের অপেক্ষায় নৌকা লাগাইয়া রন্ধনের জোগাড় হইতে লাগিল। বড় চর, মাঝে মাঝে কাশঝোপ ছাড়া অন্য গাছপালা নাই। একস্থানে মাঝিরা ও অন্যস্থানে বীরু রায়ের স্ত্রী রন্ধন চড়াইয়াছিলেন। সকলেরই মন প্রফুল্ল। দুইদিন পরেই দেশে পৌঁছানো যাইবে। বিশেষতঃ পূজা নিকটে, সে আনন্দ তো আছেই।

জ্যোৎস্না উঠিয়াছিল। নোনা গাঙের জল চকচক করিতেছিল। হু-হু হাওয়ায় চরের কাশফুলের রাশি আকাশ, জোৎস্না, মোহানার জল একাকার করিয়া উড়িতেছিল। হঠাৎ কিসের শব্দ শুনিয়া দু'একজন মাঝি রন্ধন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। কাশঝোপের আড়ালে যেন একটা শুট্‌পাট্‌ শব্দ একটা ভয়ার্ত কণ্ঠ একবার অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিয়াই তখনি থামিয়া যাইবার শব্দ। কৌতূহলী মাঝিরা ব্যাপার কি দেখিবার জন্য কাশঝোপের আড়ালটা পার হইতে না হইতে কি যেন একটা হুড়ুম করিয়া চর হইতে জলে গিয়া ডুব দিল। চরের সেদিকটা জনহীন—কিছু কাহারও চোখে পড়িল না।

কি ব্যাপার ঘটিয়াছে, কি হইল, বুঝিবার পূর্বেই বাকি দাঁড়ি-মাঝি সেখানে আসিয়া পৌঁছিল। গোলমাল শুনিয়া বীরু রায় আসিলেন, তাঁহার চাকর আসিল। বীরু রায়ের একমাত্র পুত্র নৌকাতে ছিল, সে কই? জানা গেল রন্ধনের বিলম্ব দেখিয়া সে খানিকক্ষণ আগে জ্যোৎস্নায় চরের মধ্যে বেড়াইতে বাহির হইয়াছে। দাঁড়ি-মাঝিদের মুখ শুকাইয়া গেল, এদেশের নোনা গাঙ সমূহের অভিজ্ঞতায় তাহারা বুঝিতে পারিল কাশবনের আড়ালের বালির চরে বৃহৎ কুমীর শুইয়া ওৎ পাতিয়া ছিল—ডাঙা হইতে বীরু রায়ের পুত্রকে লইয়া গিয়াছে।

তাহার পর অবশ্য যাহা হয় হইল। নৌকার লগি লইয়া এদিকে ওদিকে খোঁজাখুঁজি করা হইল, নৌকা ছাড়িয়া মাঝনদীতে

গভীর রাত্রি পর্যন্ত সকলে সন্ধান করিয়া বেড়াইল—তাহার পর কান্নাকাটি হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি। গত বৎসর দেশের ঠাকুরঝি পুকুরের মাঠে প্রায় এই সময়ে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, যেন এক অদৃশ্য বিচারক এ বৎসর ইছামতীর নির্জন চরে তাহার বিচার নিষ্পন্ন করিলেন। মুর্খ বীরু রায় ঠেকিয়া শিখিলেন যে, সে অদৃশ্য ধর্মাধিকরণের দণ্ডকে ঠাকুরঝি পুকুরের শ্যামাঘাসের দামে প্রতারিত করিতে পারে না, অন্ধকারেও তাহা আপন পথ চিনিয়া লয়।

বাড়ী আসিয়া বীরু রায় আর বেশী দিন বাঁচেন নাই। এইরূপে তাঁহার বংশে এক অদ্ভুত ব্যাপারের সূত্রপাত হইল। নিজের বংশ লোপ পাইলেও তাঁহার ভাইয়ের বংশাবলী ছিল। কিন্তু বংশের জ্যেষ্ঠ সন্তান কখনও বাঁচিত না, সাবালক হইবার পূর্বেই কোন-না-কোন রোগে মারা যাইত। সকলে বলিল, বংশে ব্রহ্মশাপ ঢুকিয়াছে। হরিহর রায়ের মাতা তারকেশ্বর দর্শনে গিয়া এক সন্ন্যাসীর কাছে কাঁদাকাটা করিয়া একটি মাদুলি পান। মাদুলির গুণেই হোক, বা ব্রহ্মশাপের তেজ দুই পুরুষ পরে কর্পূরের মত উবিয়া যাওয়ার ফলেই হোক, এত বয়সেও হরিহর আজও বাঁচিয়া আছে।

দিনকতক পরে।

খুকী সন্ধ্যার পর শুইয়া পড়িয়াছিল। বাড়ীতে তাহার পিসিমা নাই, অদ্য দুই মাসের উপর হইল একদিন তাহার মায়ের সঙ্গে কি ঝগড়া-ঝাঁটি হওয়ার পর রাগ করিয়া দূর গ্রামে কোন্ এক আত্মীয়বাড়ীতে গিয়া আছে। মায়েরও শরীর এতদিন বড় অপটু ছিল বলিয়া তাহাকে দেখিবারও কোন লোক নাই। সম্প্রতি মা কাল হইতে আঁতুড় ঘরে ঢোকা পর্যন্ত সে কখন খায় কখন শোয় তাহা কেহ বড় দেখে না।

খুকী শুইয়া শুইয়া যখন পর্যন্ত ঘুম না আসিল, ততক্ষণ পিসিমার জন্য কাঁদিল। রোজ রাত্রে সে কাঁদে। তাহার পর খানিক রাত্রে কাহাদের কথাবার্তা শুনিয়া জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, কুড়ুনীর মা দাই রান্নাঘরের ছেঁচতলায় দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছে, পাড়ার নেড়ার ঠাকুরমা, আরও কে কে উপস্থিত আছেন। সকলেই যেন ব্যস্ত উদ্বিগ্ন। খানিকটা জাগিয়া থাকিয়া আবার শুইয়া পড়িল।

বাঁশবনে হাওয়া লাগিয়া শির্‌শির্ শব্দ হইতেছে, আঁতুর ঘরে আলো জ্বলিতেছে ও কাহারা কথাবার্তা কহিতেছে। দাওয়ায় জ্যোৎস্না পড়িয়াছে, ঠাণ্ডা হাওয়ায় একটু পরে সে ঘুমাইয়া পড়িল। খানিক রাত্রে ঘুমের ঘোরে একটা অস্পষ্ট আওয়াজ ও গোলমাল শুনিয়া আবার তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। তাহার বাবা ঘর হইতে বাহির হইয়া আঁতুড় ঘরের দিকে দৌড়াইয়া ব্যস্তভাবে বলিতে বলিতে যাইতেছে—কেমন আছে খুড়ী? কি হয়েছে? আঁতুড়

ঘরের ভিতর হইতে কেমন ধরনের গলার আওয়াজ সে শুনিতে পাইল। গলার আওয়াজটা তাহার মায়ের। অন্ধকারের মধ্যে ঘুমের ঘোরে সে কিছু বুঝিতে না পারিয়া চুপ করিয়া খানিকক্ষণ বসিয়া রহিল। তাহার কেমন ভয় ভয় করিতেছিল। মা ও-রকম করিতেছে কেন? কি হইয়াছে মায়ের?

সে আরও খানিকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া কিছু বুঝিতে না পারিয়া শুইয়া পড়িল এবং একটু পরেই ঘুমাইয়া পড়িল। কতক্ষণ পরে সে জানে না—কোথায় যেন বিড়াল ছানার ডাকে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। চট করিয়া তাহার মনে পড়িল পিসিমার ঘরের দাওয়ায় ভাঙা উনুনের মধ্যে মেনী বিড়ালের ছানাগুলো সে বৈকালবেলা লুকাইয়া রাখিয়া আসিয়াছে—ছোট তুলতুলে ছানা কয়টি, এখনও চোখ ফুটে নাই; ভাবিল—ঐ যাঃ—ওদের হুলো বেড়ালটা এসে বাচ্চাগুলোকে সব খেয়ে ফেলল···ঠিক।

ঘুমচোখে উঠিয়া তাড়াতাড়ি সে অন্ধকারের মধ্যে পিসিমার দাওয়ায় গিয়া উনুনের মধ্যে হাত পুরিয়া দেখিল বাচ্চা কয়টি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতেছে। হুলো বেড়ালের কোন চিহ্ন নাই কোনও দিকে। পরে সে অবাক হইয়া আসিয়া শুইয়া পড়িল এবং একটু পরেই ঘুমাইয়া পড়িল।

ঘুমের ঘোরে আবার কিন্তু কোথায় বিড়ালছানা ডাকিতেছিল।

পরদিন উঠিয়া সে চোখ মুছিতেছে, কুড়ুনীর মা দাই বলিল, ও খুকী, কাল রাত্তিরে তোমার একটা ভাই হয়েছে দেখবা না? ···ওমা, কাল রাত্তিরে এত চেঁচামেচি, এত কাণ্ড হয়ে গেল—কোথায় ছিলে তুমি? যা কাণ্ড হয়েলো, কালপুরের পীরের দরগায় সিন্নি দেবানে—বড়ডো রক্ষে করেছেন রাত্তিরে।

খুকী এক দৌড়ে ছুটিয়া আঁতুড় ঘরের দুয়ারে গিয়া উঁকি মারিল। তাহার মা আঁতুড়ের খেজুর পাতার বেড়ার গা ঘেঁষিয়া শুইয়া ঘুমাইতেছে। একটি টুকটুকে অসম্ভব রকমের ছোট্ট, প্রায় একটা কাঠের বড় পুতুলের চেয়ে কিছু বড় জীব কাঁথার মধ্যে শুইয়া—

সেটিও ঘুমাইতেছে। গুলের আগুনের মন্দ মন্দ ধোঁয়ায় ভাল দেখা যায় না। সে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতেই জীবটা চোখ মেলিয়া মিট্‌মিট্‌ করিয়া চাহিয়া অসম্ভব রকমের ছোট হাতদুটি নাড়িয়া নিতান্ত দুর্বলভাবে ঈষৎ ক্ষীণ সুরে কাঁদিয়া উঠিল। এতক্ষণ পরে খুকী বুঝিল রাত্রিতে বিড়ালছানার ডাক বলিয়া যাহা মনে করিয়াছিল তাহা কি। অবিকল বিড়ালছানার ডাক—দূর হইতে শুনিলে কিছু বুঝিবার জো নাই। হঠাৎ অসহায়, অসম্ভব রকমের ছোট্ট নিতান্ত ক্ষুদে ভাইটির জন্য দুঃখে, মমতায়, সহানুভূতিতে খুকীর মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। নেড়ার ঠাকুরমা ও কুড়ুনীর মা দাই বারণ করাতে সে ইচ্ছাসত্ত্বেও আঁতুর ঘরে ঢুকিতে পারিল না।

মা আঁতুর হইতে বাহির হইলে খোকার ছোট্ট দোলাতে দোল দিতে দিতে খুকী কত কি ছড়া গান করে। সঙ্গে সঙ্গে কত সন্ধ্যাদিনের কথা, পিসিমার কথা মনে আসিয়া তাহার চোখ জলে ভিজিয়া যায়। এই রকম কত ছড়া যে পিসিমা বলিত! খোকা দেখিতে পাড়ার লোক ভাঙিয়া আসে। সকলে দেখিয়া বলে ঘর-আলো-করা খোকা হয়েছে, কি মাথার চুল, কি রং! বলাবলি করিতে করিতে যায়—কি হাসি দেখেচ ন-দি?

খুকী কেবল ভাবে, তাহার পিসিমা একবার যদি আসিয়া দেখিত! সবাই দেখিতেছে, আর তাদের পিসিমাই কোথায় গেল চলিয়া—আর কখনো ফিরিয়া আসিবে না? সে ছেলেমানুষ হইলেও একটু বুঝিয়াছে যে, এ বাড়ীতে বাবা কি মা কেহই পিসিমাকে ভালবাসে না, তাহাকে আনিবার জন্য কেহ গা করিবে না। দিনমানে পিসির ঘরের দিকে চাহিলে মন কেমন করে, ঘরের কবাটটা এক একদিন খোলাই পড়িয়া থাকে। দাওয়ায় চামচিকার নাদি জমিয়াছে। উঠানে সে-রকম আর ঝাঁট পড়ে না, এখানে শেওড়ার চারা, ওখানে কচু গাছ—পিসিমা বুঝি হইতে দিত। খুকীর বড় বড় চোখ জলে ভরিয়া যায়—সেই ছড়া, সেই সব গল্প খুকী কি করিয়া ভোলে?

সেদিন হরি পালিতের মেয়ে আসিয়া তাহার মাকে বলিল, তোমাদের বুড়ী ঘাটের পথে দেখি মাঠের দিক থেকে একটা ঘটি আর পুঁটুলি হাতে করে আসছে—এসে চক্কোত্তি মশায়দের বাড়ীতে ঢুকে বসে আছে, যাও দুগ্‌গাকে পাঠিয়ে দাও, হাত ধরে ডেকে আনুক, তাহলে রাগ পড়বে এখন—

হরি পালিতেরই বাড়ী বসিয়া বুড়ী তখন পাড়ার মেয়েদের মুখে হরিহরের ছেলে হওয়ার গল্প শুনিতেছিল।

ও পিতি!

বুড়ী চমকিয়া চাহিয়া দেখিল দুর্গা হাঁপাইতেছে, যেন অত্যন্ত ছুটিয়া আসিয়াছে। বুড়ী ব্যগ্রভাবে দুর্গাকে হাত বাড়াইয়া ধরিতে গেল—সঙ্গে সঙ্গে দুর্গা ঝাঁপাইয়া বুড়ীর কোলে পড়িল—তাহার মুখে হাসি অথচ চোখে জল—উঠানে ঝি-বউ যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন অনেকের চোখে জল আসিল। প্রবীণা হরি পালিতের স্ত্রী বলিলেন —নেও ঠাকুরঝি, ও তোমার আর-জন্মে মেয়ে ছিল, সেই মেয়েই তোমার আবার ফিরে এসেছে—

খোকা প্রায় দশ মাসের হইল। দেখিতে রোগা-রোগা গড়ন, অসম্ভব রকমের ছোট্ট মুখখানি। নীচের মাড়িতে মাত্র দু'খানি দাঁত উঠিয়াছে। কারণে অকারণে যখন-তখন সে সেই দু'খানি মাত্র দুধে-দাঁতওয়ালা মাড়ি বাহির করিয়া হাসে। লোকে বলে— বৌমা তোমার খোকার হাসিটি বায়না করা! খোকাকে একটুখানি ধরাইয়া দিলে আর রক্ষা নাই, আপনা হইতে পাগলের মত এত হাসি শুরু করিবে যে, তাহার মা বলে—আচ্ছা খোকন আজ থামো, বড্ড হেসেচো, আজ বড্ড হেসেচো—আবার কালকের জন্যে একটু রেখে দাও। মাত্র দুইটি কথা সে বলিতে শিখিয়াছে। মনে সুখ থাকিলে মুখে বলে জে—জে—জে—জে এবং দুধে দাঁত বাহির করিয়া হাসে। মনে দুঃখ হইলে বলে, না—না—না—না ও বিশ্রী রকমের চীৎকার করিয়া কাঁদিতে শুরু করে। যাহা সামনে পায় তাহারই উপর ঐ নতুন দাঁত দু'খানির জোর পরখ করিয়া দেখে

—মাটির ঢেলা, এক টুকরো কাঠ, মায়ের আঁচল; দুধ খাওয়াইতে বসিলে এক এক সময় সে হঠাৎ কাঁসার ঝিনুক খানাকে মহা-আনন্দে নতুন দাঁত দু'খানি দিয়ে জোরে কামড়াইয়া ধরে। তাহার মা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলে—ওকি, হাঁরে ও খোকা ঝিনুকখানাকে কামড়ে ধল্লি কেন?—ছাড় ছাড়—ওরে করিস কি—দু'খানা দাঁততো তোর মোটে সম্বল—ভেঙ্গে গেলে তখন হাস্‌বি কি করে শুনি? খোকা তবু ছাড়ে না। তাহার মা মুখের ভিতর আঙুল দিয়া অতি কষ্টে ঝিনুকখানাকে ছাড়াইয়া লয়।

খুকীর উপর সব সময় নির্ভর করিয়া থাকা যায় না বলিয়া রান্নাঘরের দাওয়া খানিকটা উঁচু করিয়া বাঁশের বাখারি দিয়া ঘিরিয়া তাহার মধ্যে খোকাকে বসাইয়া রাখিয়া তাহার মা নিজের কাজ করে। খোকা কাটরার মধ্যে শুনানি-হওয়া ফৌজদারী মামলার আসামীর মত আটক থাকিয়া কখনো আপন মনে হাসে, অদৃশ্য শ্রোতাগণের নিকট দুর্বোধ্য ভাষায় কি বকে, কখনো বাখারির বেড়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বাঁশবনের দিকে চাহিয়া থাকে। তাহার মা ঘাট হইতে স্নান করিয়া আসিলে—মায়ের ভিজে কাপড়ের শব্দ পাইতেই খোকা খেলা হইতে মুখ তুলিয়া এদিকে-ওদিকে চাহিতে থাকে ও মাকে দেখিতে পাইয়া এক মুখ হাসিয়া বাখারির বেড়া ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। তার মা বলে—একি, ওমা, এই কাজল পরিয়ে মুখ মুছিয়ে দিয়ে গেলাম, একেবারে হাঁড়ীচাঁচা পাখী সেজে বসে আছে? দেখি, এদিকে আয়! জোর করিয়া নাকমুখ রগড়াইয়া কাজল উঠাইতে গিয়া খোকার রাঙ্গা মুখ একেবারে সিঁদুর হইয়া যায়—মহা আপত্তি করিয়া রাগের সহিত বলে জে—জে—জে—জে, তাহার মা শোনে না।

ইহার পর মায়ের হাতে গামছা দেখিলেই খোকা খল্‌বল্ করিয়া হামাগুড়ি দিয়া একদিকে ছুটিয়া পালাইতে যায়। এক একদিন ঘাট হইতে আসিয়া সর্বজয়া বলে—খোকন বলে টু—উ—উ? দোলো তো খোকা? দোলে দোলে খোকন দোলে—। খোকা

অমনি বসিয়া পড়িয়া সামনে পিছনে বেজায় ছুলিতে থাকে ও মনের সুখে ছোট্ট হাত ছুটি নাড়িয়া গান ধরে—

(গীত)

জৈ—এ—এ—জে—জে—এ—এ—ই

জে—জে—জে—এ

জে—জে—জে—জে—জে—

তার মা বলে, আচ্ছা থামো, আর ছুলো না খোকা, হয়েচে, খুব হয়েচে। কখনো কখনো কাজ করিতে করিতে সর্বজয়া কান পাতিয়া শুনিত, খোকার বেড়ার ভিতর হইতে কোন শব্দ আসিতেছে না—যেন সে চুপ করিয়া গিয়াছে! তাহার বুক ধড়াস্ করিয়া উঠিত—শেয়ালে নিয়ে গেল না তো? সে ছুটিয়া আসিয়া দেখিত খোকা সাজি-উপুড় করা এক রাশ চাঁপা ফুলের মত মাটির উপর বে-কায়দায় ছোট্ট হাতখানি রাখিয়া কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, চারিদিক হইতে নাল্‌সে পিঁপড়ে, মাছি ও সুড়িসুড়ি পিঁপড়ের দল মহালোভে ছুটিয়া আসিতেছে, খোকার পাতলা পাতলা রাঙা ঠোঁট ছুটা ঘুমের ঘোরে যেন একটু একটু কাঁপিতেছে, ঘুমের ঘোরে সে যেন মাঝে মাঝে ঢোক গিলিয়া জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলিতেছে —যেন জাগিয়া উঠিল, আবার তখনই এমন ঘুমাইয়া পড়িতেছে যে নিঃশ্বাসের শব্দটিও পাওয়া যাইতেছে না।

সকাল হইতে সন্ধ্যা ও সন্ধ্যা হইতে অনেক রাত্রি পর্যন্ত তাহাদের বাঁশবাগানের ধারে নির্জন বাড়ীখানি দশ মাসের শিশুর অর্থহীন আনন্দ-গীতি ও অবোধ কলহাস্যে মুখরিত থাকে।

মা ছেলেকে স্নেহ দিয়া মানুষ করিয়া তোলে, যুগে যুগে মায়ের গৌরব-গাথা তাই সকল জনমনের বার্তায় ব্যক্ত। কিন্তু শিশু যা মাকে দেয়, তাই কি কম? সে নিঃস্ব আসে বটে, কিন্তু তার মন-কাড়িয়া-লওয়া-হাসি, শৈশবতারল্য, চাঁদ-ছানিয়া-গড়া মুখ, আধ-আধ আবোল-তাবোল বকুনির দাম কে দেয়? ওই তার ঐশ্বর্য, ওরই বদলে সে সেবা নেয়, রিক্ত হাতে ভিক্ষুকের মত নেয় না।

এক একদিন যখন হরিহর বাজারের হিসাব কি নিজের লেখা লইয়া ব্যস্ত আছে—সর্বজয়া ছেলেকে লইয়া গিয়া বলে, ওগো, ছেলেটাকে একটু ধরো না? মেয়েটা কোথায় বেরিয়েচে—ঠাকুরঝি গিয়েচে ঘাটে—ধর দিকি একটু!—আমি নাইবো না, ছেলে ঘাড়ে করে বসে থাকলেই হবে? হরিহর বলে—উঁহু, ওসব গোলমাল এখন এখানে নিয়ে এসো না, বড় ব্যস্ত। সর্বজয়া রাগিয়া ছেলেকে ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া যায়। হরিহর হিসাবপত্র লিখিতে লিখিতে হঠাৎ দেখে ছেলে তার চটিজুতার পাটিটা মুখে দিয়া চিবাইতেছে! হরিহর জুতাখানা কাড়িয়া লইয়া বলে—আঃ, দ্যাখো বাধিয়ে গেল কাণ্ড, আছি একটা কাজ নিয়ে।•

হঠাৎ একটা চড়ুই পাখী আসিয়া রোয়াকের ধারে বসে। খোকা বাবার মুখের দিকে চাহিয়া অবাক হইয়া সেদিকে দেখাইয়া হাত নাড়িয়া বলে—জে—জে—জে—জে—

হরিহরের বিরক্তি দূর হইয়া গিয়া ভারি মমতা হয়।

ও পাড়ার দাসীঠাকৃরুণ আসিয়া হাসিমুখে বলিল—পয়সা ছুটোর জন্যি এসেছিলাম বৌ, ইন্দির পিসি কাল আমার কাছ থেকে একটা নোনা নিয়ে এল, বল্লে কাল দাম গিয়ে চেয়ে নিয়ে এসো—

সর্বজয়া ঘরের কাজকর্ম করিতেছিল, অবাক হইয়া বলিল—নোনা কিনে এনেছে তোমার কাছ থেকে ?

দাসীঠাকৃরুণ ঘোর ব্যবসাদার মানুষ। সামান্য তেঁতুল আমড়া হইতে একগাছি শাক পর্য্যন্ত পয়সা না লইয়া কাহাকেও দেয় না। দাসীর অমায়িক ভাব অন্তর্হিত হইয়া গেল। বলিল—এনেচে কিনা জিজ্ঞেস্ করো না তোমার ননদকে ? সকালবেলা কি মিথ্যে বলতে এলাম ছুটো পয়সার জন্যি ? চার পয়সার কমে আমি দেবো না—বললে বুড়োমানুষ খাবার ইচ্ছে হয়েছে—তা যাক ছু পয়সাতেই—

রাগে সর্বজয়ার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। নোনার মত ফল, যাহা কিনা অপর্যাপ্ত বনে জঙ্গলে ফলে যে, গরু বাছুরের পর্যন্ত খাইয়া অরুচি ধরিয়া যায়, তাহা আবার পয়সা দিয়া কিনিয়া খাইবার লোক যে পাড়াগাঁয়ে আছে, তাহা সর্বজয়ার ধারণায় আসে না।

ঠিক এই সময় ইন্দির বুড়ী কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সর্বজয়া তাহার উপর যেন ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বলিল—বলি হ্যাঁগা, তিন কাল গিয়েচে এককালে তো ঠেকেচে, যার ব'সে খাই তার পয়সার তো একটু ছুঃখ-দরদ করে চলতে হয় ? নোনা গিয়েচ কিনতে ? কোথা থেকে তোমায় বসিয়ে আজ নোনা কাল দানা খাওয়াব ? শখের পয়সা নিজে থেকে নিয়ে দাওগে যাও, পরের ওপর দিয়ে শখ করতে লজ্জা হয় না ?

বুড়ীর মুখ শুকাইয়া গিয়েছিল, একটুখানি হাসি আনিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—তা দে বৌ—পাকা নোনাডা, তা ভাবলাম নিই খেয়ে, কডা দিনই বা বাঁচবো? তা দিয়ে দে দুটো পয়সা—.

সর্বজয়া চতুর্গুণ চীৎকার করিয়া বলিল—বড় পয়সা সস্তা দেখেচ কিনা? নিজের ঘটি-বাটি আছে বিক্রী করে দাও গিয়ে পয়সা—

পরে সে ঘড়া লইয়া খিড়কী দুয়ার দিয়া ঘাটের পথে বাহির হইয়া গেল। দাসী খানিকটা দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল—আমার নাকে খৎ, কানে খৎ, জিনিস বেচে এমন হয়রান তো কখনো হইনি! তোমায়ও বলি ইন্দির পিসি, নিজের পয়সাই যদি না ছিল তবে তোমার কাল নোনাটা আনা ভাল হয়নি বাপু, ও-রকম ধারে জিনিসপত্তর আর এনো না।. তা তোমাদের ঝগড়া তোমরা কর, আমি গরীব লোক, ও বেলা আসবো, আমার পয়সা দুটো বাপু ফেলে দিও—

দাসীর পিছু পিছু খুকী বাড়ীর বাহিরের উঠান পর্যন্ত আসিল। বলিতে বলিতে আসিল—পিসিমা বুড়ো মানুষ একটা নোনা এনেচে, তা বুঝি বকে? খেতে ইচ্ছে হয় না, হ্যাঁ দাসীপিসি? বেশ নোনা, আমায় আধখানা কাল দিয়েছে—তোমার বাড়ী বুঝি গাছ আছে পিসি?—পরে সে ডাকিয়া কহিল—শোনো না দাসী পিসি, আমি একটা পয়সা দেবো এখন, পুতুলের বাক্সে আছে, মা ঘরে চাবি দিয়ে ঘাটে গেল, এলে লুকিয়ে দেবো এখন, মাকে বলো না যেন পিসি?

দুপুরের কিছু পূর্বে ইন্দির বুড়ী বাড়ি হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে। বাঁ হাতে ছোট একটা ময়লা কাপড়ের পুটলি ডান-হাতে পিতলের চাদরের ঘটিটা ঝুলানো, বগলে একটা পুরানো মাদুর, মাদুরের পাড় ছিঁড়িয়া কাটিগুলি ঝুলিতেছে।

খুকী বলিল, ও পিসি, যাসনে—ও পিসি কোথায় যাবি? পরে সে ছুটিয়া আসিয়া মাদুরের পিছনটা টানিয়া ধরিল।...তুই চলে গেলে আমি কাঁদ্‌বো পিসি—ঠিক—

সর্বজয়া ঘরের দাওয়া হইতে বলিল, তা যাবে যাও, গেরস্তর অকল্যাণ করে যাওয়া কেন? ছেলেপিলে নিয়ে ঘর করি, এতকাল যার খেলে, তার একটা মঙ্গল তো দেখতে হয়, অনত্থ সময়ে না খেয়ে চলে গিয়ে তারপর গেরস্তর একটা অকল্যেণ বাধুক, এই তোমার ইচ্ছে তো?…ঐ রকম কুচক্কুরে মন না হ'লে কি আর এই দশা হয়?…

বুড়ী ফিরিল না। খুকী কাঁদিতে কাঁদিতে অনেক দূর পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে গেল।

বুড়ী গিয়া গ্রামের ও-পাড়ার নবীন ঘোষালের বাড়ী উঠিল।

বারো মাস লোকের বাড়ী আশ্রয় হয় না। পূব-পাড়ার চিন্তে গয়লানীর চালা ঘরখানি পড়িয়া ছিল—মাস দুই পরে সকলে মিলিয়া সেই ঘরখানি বুড়ীর জন্য ঠিক করিয়া দিল এবং ঠিক করিল পাড়া হইতে সকলে কিছু কিছু সাহায্য করিবে। ঘরখানা নিতান্ত ছোট, ছিটে বেড়ার দেয়াল, পাড়া হইতে দূরে একটা বাঁশবনের মধ্যে। লোকের মুখে শুনিত সর্বজয়া নাকি বলিয়াছে—তেজ দেখুক পাঁচজনে। এ বাড়ী আর না, আমার বাছাদের মুখের দিকে যে তাকায়নি—তাকে আর আমার দোরে মাথা গলাতে হবে না, ভাগাড়ে পড়ে মরুক গিয়ে। যাহাদের সাহায্য করিবার কথা ছিল, তাহারা প্রথম দিনকতক খুব উৎসাহের সঙ্গে যোগাইল, ক্রমে কিন্তু তাহাদের আগ্রহও কমিয়া গেল। বুড়ী ভাবে, কেন সেদিন অত রাগ করে চলে এলাম? বৌ বারণ কল্লে, খুকী কত কাঁদলে, হাতে ধরে টানাটানি কল্লে—। নিজের উপর অত্যন্ত দুঃখে চোখের জলে দুই তোবড়ানো গাল ভাসিযা যায়। বলে—শেষ কালডা এত দুঃখুও ছিল অদেষ্টে—আজ যদি মেয়েডাও থাকতো—

চৈত্র মাসের সংক্রান্তি। সারাদিন বড় রৌদ্রের তেজ ছিল, সন্ধ্যার সময় একটু একটু বাতাস বাহিতেছে, গোসাঁইপাড়ায় চড়কের ঢাক এখনও বাজিতেছে, মেলা এখনও শেষ হয় নাই।

রৌদ্রে এ-বাড়ী ও-বাড়ী ঘুরিয়া ও দুর্ভাবনায় বুড়ীর রোজ

সন্ধ্যার পর একটু একটু জ্বর হয়। সে মাদুর পাতিয়া দাওয়ার চুপ করিয়া শুইয়া আছে, মাথার কাছে মাটির ভাঁড়ে জল। পিতলের চাদরের ঘটিটা ইতিমধ্যে চার আনায় বাঁধা দিয়া চাল কেনা হইয়াছে। জ্বরের তৃষ্ণায় মাঝে মাঝে একটু একটু জল মাটির ভাঁড় হইতে খাইতেছে।

পিসিমা!···বুড়ী কাঁথা ফেলিয়া লাফাইয়া উঠিল, দাওয়ায় পৈঠায় খুকী উঠিতেছে, পিছনে তাহাদের পাড়ার বেহারী চক্কত্তির মেয়ে রাজী। খুকীর পরনে ফর্সা কাপড়, আঁচলের প্রান্তে কি সব পোঁটলা-পুঁটুলি বাঁধা। বুড়ীর মুখ দিয়া বেশী কথা বাহির হইল না। প্রবল আগ্রহে সে শীর্ণ হাত বাড়াইয়া তাহাকে জ্বরতপ্ত বুকে জড়াইয়া ধরিল।

—বলিস্‌নে কাউকে পিসি, কেউ যেন টের পায় না চড়ক দেখে সন্দে বেলা চুপিচুপি এলাম, রাজীও এল আমার সঙ্গে, চড়কের মেলা থেকে এই ছ্যাখ্, তোর জন্যে সব এনেচি—

খুকী পুঁটুলি খুলিল।

মুড়কি পিসিমা, তোর জন্যে দু'পয়সার মুড়কি আর দু'টো কদ্‌মা আর খোকার জন্যে একটা কাঠের পুতুল—। বুড়ী ভাল করিয়া উঠিয়া বসিল। জিনিসগুলো নাড়িতে নাড়িতে বলিল—দেখি দেখি ও আমার মানিক, কত জিনিস এনেচে ছ্যাখো! রাজরাণী হও, গরীব পিসির ওপর এত দয়া! দেখি খোকার কাঠের পুতুলডা। বাঃ দিব্বিঃ পুতুল – কডা পয়সা নিলে?···

এক ঝোঁক কথাবার্তার পরে খুকী বলিল—পিসি, তোর গা যে বড্ড গরম?

সমস্ত দিন টউরে বেড়িয়ে এই রকমডা হয়েছে, তাই বলি একটু শুয়ে থাকি—

ছেলেমানুষ হইলেও দুর্গা পিসিমার রৌদ্রে ঘুরিবার কারণ বুঝিল। দুঃখে ও অনাহারে শীর্ণ পিসিমার গায়ে সে সস্নেহে হাত বুলাইয়া বলিল, তুই অবিশ্যি করে বাড়ী যাস্, সন্দে বেলা গল্প শুনতে পাইনে কিছু না—কাল যাবি—কেমন তো?

বুড়ী আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, বলিল, বো বুঝি তোকে কিছু বলে দিয়েছে আজ ?

রাজী বলিল—খুড়ীমা তো কিছু বলে দেয়নি পিসিমা, ওকে তো এখানে খুড়ীমা আসতে দেয় না। আমরা বললে বকে, তবে তুমি যেও পিসিমা। তুমি একটুখানি বলো, তাহলে খুড়ীমা আর কিছু বলবে না।

খুকী বলিল—কাল তুই ঠিক যাস পিসি, মা কিছু বলবে না —তা'হলে এখন বাড়ী যাই পিসি, কাউকে যেন বলিসনে—কাল সকালে ঠিক যাস কিন্তু—

সকালে উঠিয়া বুড়ি দেখিল শরীরটা একটু হালকা। একটু বেলা হইলে ছোট্ট পুঁটুলিতে ছেঁড়া-খোঁড়া কাপড় দু'খানা ও ময়লা গামছাখানা বাঁধিয়া বুড়ী বাড়ীর দিকে চলিল। পথে গোপী বোষ্টমের বৌ বলিল, দিদি ঠাকুরুণ তা বাড়ী যাচ্ছ বুঝি ? বৌদিদির রাগ চলে গিয়েছে বুঝি।

বুড়ী একগাল হাসিল, বলিল, কাল দুর্গা যে সন্দে বেলা ডাকতে গিয়েছিল, কত কাঁদলে বললে মা বলেচে—চ' পিসি বাড়ী চ'—তা আমি বললাম—আজ তুই যা কাল সকালে বেলাডা হোক, আমি বাড়ী গিয়ে উঠবো—মেয়ের আমার কত কান্না, যেতে কি চায় ?—তাই সকালে যাচ্ছি—

বুড়ী বাড়ী ঢুকিয়া দেখিল কেহ বাড়ী নাই। কাল সারারাত জ্বর-ভোগের পর এতটা পথ রৌদ্রে দুর্বল শরীরে আসিয়া বোধ হয় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, পুঁটুলিটা নামাইয়া সে নিজের ঘরের দাওয়ায় পৈঠায় বসিয়া পড়িল।

এটু পরেই খিড়কী দোর ঠেলিয়া সর্বজয়া স্নান করিয়া নদী হইতে ফিরিল। এদিকে চোখ পড়িলে বুড়ীকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সে বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া একটুখানি দাঁড়াইল। বুড়ী হাসিয়া বলিল—ও বৌ ভাল আছিস ? এই অ্যালাম এ্যাদ্দিন পরে, তোদের ছেড়ে আর কোথায় যাবো এ বয়সে--তাই বলি—

সর্বজয়া আগাইয়া আসিয়া বলিল—তুমি এ বাড়ী কি মনে করে ?

তাহার ভাবভঙ্গী ও গলার স্বরে, বুড়ীর হাসিবার উৎসাহ আর বড় রহিল না। সর্বজয়া কথার উত্তর দিতে না দিয়াই বলিল—এ বাড়ী আর তোমার জায়গা কিছুতেই হবে না—সে তোমাকে আমি সেদিন বলে দিয়েচি—ফের কোন্ মুখে এয়েচ ?

— বুড়ী কাঠের মত হইয়া গেল, মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না! পরে সে হঠাৎ একেবারে কাঁদিয়া বলিল—ও বৌ, অমন করে বলিস্‌নে—একটুখানি ঠাঁই দে আমাকে—কোথায় যাব আর শেষকালডা বল দিকিনি—তবু এই ভিটেটাতে—

ন্যাও, আর ভিটের দোহাই দিতে হবে না, ভিটের কল্যাণ ভেবে তোমার তো ঘুম নেই যাও এক্ষুনি বিদেয় হও, নৈলে আমি অনথ বাধাবো—

ব্যাপার এরূপ দাঁড়াইবে বুড়ী বোধ হয় আদৌ প্রত্যাশা করে নাই। জলমগ্ন ব্যক্তি যেমন ডুবিয়া যাইবার সময় যাহা পায় তাহাই আঁকড়াইয়া ধরিতে চায়, বুড়ী সেইরূপ মুঠা আঁকড়াবার আশ্রয় খুঁজিতে লক্ষ্যহীন ভাবে এদিক ওদিক চাহিল—আজ তাহার কেমন মনে হইল যে, বহুদিনের আশ্রয় সত্য সত্যই তাহার পায়ের তলা হইতে সরিয়া যাইতেছে, আর তাহাকে ধরিয়া রাখিবার উপায় নাই।

সর্বজয়া বলিল—যাও আর বসে থেকে না ঠাকুরঝি, বেলা হয়ে যাচ্ছে, আমার কাজকর্ম আছে, এখানে তোমার জায়গা কোন রকমে দিতে পারবো না—

বুড়ি পুঁটুলি লইয়া অতিকষ্টে আবার উঠিল। বাহির দরজার কাছে যাইতে তাহার নজর পড়িল তাহার উঠান ঝাঁটের ঝাঁটাগাছটা পাঁচিলের কোণে ঠেস দেওয়ানো আছে, আজ তিন চার মাস তাহাতে কেহ হাত দেয় নাই। এই ভিটার ঘাসটুকু, ঐ কত যত্নে পোঁতা লেবু গাছটা, এই অত্যন্ত প্রিয় ঝাঁটাগাছটা, খুকী, খোকা

ব্রজ পিসের ভিটা···তার সত্তর বৎসরের জীবনে এ সব ছাড়া সে আর কিছু জানেও নাই, বুঝেও নাই। চিরকালের মত তাহারা আজ দূরে সরিয়া যাইতেছে!

সজনেতলা দিয়া পুঁটুলি বগলে যাইতে পিছন হইতে রায়বাড়ীর গিন্নী বলিল—ঠাক্‌'মা ফিরে যাচ্ছ কোথায়? বাড়ী যাবে না? উত্তর না পাইয়া বলিল—ঠাক্‌'মা আজকাল কানের মাথা একেবারে খেয়েছে!

বৈকালে ও-পাড়া হইয়া কে আসিয়া বলিল—ও মা ঠাক্‌রুণ, তোমাদের বুড়ী বোধ হয় মরে যাচ্ছে. পালিতদের গোলার কাছে দুপুর থেকে শুয়ে আছে, রোদ্দূরে ফিরে যাচ্ছিল, আর যেতে পারেনি—একবার গিয়ে দেখে এস—দাদাঠাকুর বাড়ী নেই? একবার পাঠিয়ে দেও না।

পালিতদের বড় মাচার তলায় গোলার গায়ে ইন্দির ঠাকরুণ মরিতেছিল একথা সত্য। হরিহরের বাড়ী হইতে ফিরিলে তাহার গা কেমন করে, রৌদ্রে আর আগাইতে না পারিয়া এখানেই শুইয়া পড়ে। পালিতেরা চণ্ডীমণ্ডপে তুলিয়া রাখিয়াছিল। বুকে পিঠে তেল মালিশ, পাখার বাতাস, সব করিবার পরে বেশী বেলায় অবস্থা খারাপ বুঝিয়া নামাইয়া রাখিয়াছে। পালিত-পাড়ার অনেকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কেহ বলিতেছে—তা রোদ্দুরে বেরুলেই বা কেন? সোজা রোদ্দুরটা পড়েচে আজ? কেহ বলিতেছে—এখুনি সাম্‌লে উঠবে এখন, ভির্‌মি লেগেছে বোধ হয়—

বিশু পালিত বলিল—ভির্‌মি নয়। বুড়ী আর বাঁচবে না; হরিজ্যেঠা বোধ হয় বাড়ী নেই, খবর তো দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এতদূরে আসে কে?

শুনিতে পাইয়া দিনু চক্রবর্তীর বড় ছেলে ফণী ব্যাপার কি দেখিতে আসিল। সকলে বলিল—দাও দাদাটাকুর, ভাগ্যিস এসে পড়েচ, একটুখানি গঙ্গাজল মুখে দাও দিকি। ছাখো তো কাণ্ড, বামুনপাড়া না কিছু না—কে একটু মুখে জল দেয়?

ফণী হাতের বৈঁচিকাঠের লাঠিটা বিশু পালিতের হাতে দিয়া বুড়ীর মুখের কাছে বসিল। কুশী করিয়া গঙ্গাজল লইয়া ডাক দিল—পিসিমা!

বুড়ী চোখ মেলিয়া ফ্যাল্ ফ্যাল করিয়া মুখের দিকে চাহিয়াই রহিল তাহার মুখে কোন উত্তর শুনা গেল না। ফণী আবার ডাকিল—কেমন আছেন পিসিমা? শরীর কি অসুখ মনে হচ্চে? পরে সে গঙ্গাজলটুকু মুখে ঢালিয়া দিল। জল কিন্তু মুখের মধ্যে গেল না, বিশু পালিত বলিল—আর একবার দাও দাদাঠাকুর—

আর খানিকক্ষণ পরে ফণী বুড়ীর চোখের পাতা বুজাইয়া দিতেই কোটরগত অনেকখানি জল শীর্ণ গাল-দুটা বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল।

ইন্দির ঠাকুরুণের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিন্দিপুর গ্রামে সেকালের অবসান হইয়া গেল।

আম আঁটির ভেঁপু

পাঁচ

ইন্দির ঠাক্‌রুণের মৃত্যুর পর চার পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। মাঘ মাসের শেষ, শীত বেশ আছে। দুই পাশে ঝোপে-ঝাপে-ঘেরা সরু মাটির পথ বাহিয়া নিশ্চিন্দিপুরের কয়েকজন লোক সরস্বতী পূজার বৈকালে গ্রামের বাহিরের মাঠে নীলকণ্ঠ পাখী দেখিতে যাইতেছিল।

পথের বাঁকের আড়াল হইতে একটি ছয় সাত বছরের ফুটফুটে সুন্দর, ছিপ্‌ছিপে চেহারার ছেলে ছুটিয়া আসিয়া দলের নাগাল ধরিল। হরিহর বলিল—আবার পিছিয়ে পড়লে এরি মধ্যে? নাও এগিয়ে চলো—

ছেলেটা বলিল—বনের মধ্যে কি গেল বাবা? বড় বড় কান?

হরিহর প্রশ্নের দিকে কোন মনোযোগ না দিয়া নবীন পালিতের সঙ্গে মৎস্য-শিকারের পরামর্শ আঁটিতে লাগিল।

হরিহরের ছেলে পুনরায় আগ্রহের সুরে বলিল—কি দৌড়ে গেল বাবা বনের মধ্যে? বড় বড় কান?—

হরিহর বলিল—কি জানি বাবা, তোমার কথার উত্তর দিতে আমি আর পারিনে। সেই বেরিয়ে অব্‌ধি সুরু করেচো এটা কি, ওটা কি—কি গেল বনের মধ্যে তা কি আমি দেখেচি? নাও এগিয়ে চলো দিকি?

বালক বাবার কথায় আগে চলিল।

নবীন পালিত বলিল, বরং এক কাজ করো হরি, মাছ যদি ধরতে হয়, তবে বঁয়শার বিলে একদিন চলে যাওয়া যাক্—পুব-পাড়ার নেপাল পাড়ুই বাচ্‌ দিচ্ছে, রোজ দেড়মণ দু'মণ এই রকম

পড়চে—পাঁচ-সেরের নীচে মাছ নেই। শুনলাম, একদিন শেষ-রাত্তিরে নাকি বিলের একেবারে মধ্যিখানে অথৈ জলে সাঁ সাঁ কমে ঠিক যেন বকনা বাছুরের ডাক—বুঝলে?

সকলে একসঙ্গে আগাইয়া আসিয়া নবীন পালিতের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

অনেক-কেলে পুরোনো বিল, গহিন জল, দেখেছো তো মধ্যিখানে জল যেন কালো শিউগোলা, পদ্মগাছের জঙ্গল, কেউ বলে রাঘব বোয়াল, কেউ বলে যক্ষি—যতক্ষণ ফর্সা না হোলো ততক্ষণ তো মশাই নৌকোর ওপরে সকলে বসে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগ্‌লো—

বেশ জমিয়া আসিয়াছে, হঠাৎ হরিহরের ছেলেটি মহা-উৎসাহে পাশের এক উলুখড়ের ঝোপের দিকে আঙুল তুলিয়া চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া গেল—ঐ যাচ্ছে বাবা, ঐ গেল বাবা, বড় বড় কান, ঐ—

তাহার বাবা পিছন হইতে ডাক দিয়া বলিল, উঁহু উঁহু উঁহু—কাঁটা কাঁটা কাঁটা—পরে তাড়াতাড়ি আসিয়া খপ করিয়া ছেলের হাতখনি ধরিয়া বলিল,—আঃ বড্ড বিরক্ত কল্লে দেখচি তুমি, একশ' বার বারণ কচ্ছি তা তুমি কিছুতেই শুনবে না, ঐ জন্যেই তো আনতে চাচ্ছিলাম না।

বালক উৎসাহে ও আগ্রহে উজ্জ্বল মুখ উঁচু করিয়া বাবার মুখের দিকে তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি বাবা?

হরিহর বলিল—কি তা আমি দেখেচি—শুওর-টুওর হবে। নাও চলো, ঠিক রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটো—

শূয়োর না বাবা, ছোট্ট যে! পরে সে নীচু হইয়া দৃষ্ট বস্তুর মাটি হইতে উচ্চতা দেখাতে গেল।

চল চল—হ্যাঁ! আমি বুঝতে পেরেছি, আর দেখাতে হবে না—চল—দিকি!...

নবীন পালিত বলিল—ও হোলো খরগোশ, খোকা, খরগোশ।

এখানে খড়ের ঝোপে খরগোশ থাকে, তাই। বালক বর্ণপরিচয়ে "খ'-এ খরগোশের ছবি দেখিয়াছে, কিন্তু তাহা যে জীবন্ত অবস্থায় এ রকম লাফাইয়া পালায় বা তাহা আবার সাধারণ চক্ষুতে দেখিতে পাওয়া যায়, একথা সে কখনো ভাবে নাই।

খরগোশ!—জীবন্ত! একেবারে তোমার সামনে লাফাইয়া পালায়—ছবি না, কাচের পুতুল না—একেবারে কানখাড়া সত্যি-কারের খরগোশ!—এই রকম ভাঁটগাছ বৈঁচিগাছের ঝোপে! জল-মাটির তৈরী নশ্বর পৃথিবীতে এ ঘটনা কি করিয়া সম্ভব হইল, বালক তাহা কোনমতে ভাবিয়া ঠাহর করিতে পারিতেছিল না।

সকলে বনে ঘেরা সরু পথ ছাড়াইয়া মাঠে পড়িল। নদীর ধারের বাবলা ও জীওল গাছের আড়ালে একটা বড় ইঁটের পাঁজার মত জিনিস নজরে পড়ে, ওটা পুরানো কালের নীলকুঠির জ্বালঘরের ভগ্নাবশেষ। সেকালে নীলকুঠির আমলে এই নিশ্চিন্দিপুর বেঙ্গল ইণ্ডিগো কন্‌সার্নের হেডকুঠি ছিল, এ অঞ্চলে চৌদ্দটা কুঠির উপর নিশ্চিন্দিপুর কুঠির ম্যানেজার জন্ লারমার দোর্দাণ্ডপ্রতাপে রাজত্ব করিত। এখন কুঠির ভাঙা চৌবাচ্চা ঘর, জ্বালাঘর সাহেবের কুঠি আপিস্, জঙ্গলাকীর্ণ ইটের স্তূপে পরিণত হইয়াছে। যে প্রবল-প্রতাপ সাহেবের নামে এক সময় এ অঞ্চলে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খাইত, আজকাল দু'একজন অতি বৃদ্ধ ছাড়া সে লোকের নাম পর্যন্ত কেহ জানে না।

হরিহরের ছেলে বলিল—নীলকণ্ঠ পাখী কৈ বাবা?

এই দেখো এখন, বাবলা গাছে এখুনি এসে বসবে—

বালক অবাক হইয়া চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল। তাহার ছয় বৎসরের জীবনে এই প্রথম সে বাড়ী হইতে এতদূর আসিয়াছে। এতদিন নেড়াদের বাড়ী, নিজেদের বাড়ীর সামনেটা বড়জোর রান্নুদিদিদের বাড়ী, ইহাই ছিল তাহার জগতের সীমা। কেবল এক এক দিন তাহাদের পাড়ায় ঘাটে মায়ের সঙ্গে স্নান করিতে আসিয়া সে স্নানের ঘাট হইতে আবছা দেখিতে পাওয়া

কুঠির ভাঙা জ্বালঘরটার দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে—আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিত, মা, ওদিকে সেই কুঠি? সে তাহার বাবার মুখে, দিদির মুখে, আরও পাড়ার কত লোকের মুখে কুঠির মাঠের কথা শুনিয়াছে, কিন্তু আজ তাহার প্রথম সেখানে আসা। ঐ মাঠের পরে ওদিকে বুঝি মায়ের মুখের সেই রূপকথার রাজ্য? শ্যাম-লঙ্কার দেশ, বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর গাছের নীচে, নির্বাসিত রাজপুত্র যেখানে তলোয়ার পাশে রাখিয়া একা শুইয়া রাত কাটায়? ও ধারে আর মানুষের বাস নাই, জগতের শেষ সীমাটাই এই। ইহার পর হইতেই অসম্ভবের দেশ, শুরু হইয়াছে।

বাড়ী ফিরিবার পথে সে পথের ধারের একটা নীচু ঝোপ হইতে একটা উজ্জ্বল রং-এর ফলের থোলো ছিঁড়িতে হাত বাড়াইল। তাহার বাবা বলিল, হাঁ, হাঁ, হাত দিও না, হাত দিও না—আলকুশী আল্‌কুশী। কি যে তুমি করো বাবা! বড্ড জ্বালালে দেখচি। আর কোনদিন কোথাও নিয়ে বেরুচ্চিনে বলে দিলাম—এক্ষুনি হাত চুলকে ফোস্কা হবে—পথের মাঝখান দিয়ে এত করে বলচি হাঁটতে—তা তুমি কিছুতেই শুনবে না—

হাত চুলকুবে কেন বাবা?

হাত চুলকুবে, বিষ বিষ—আল্‌কুশী কি হাত দেয় বাবা? শুঁয়ো ফুটে রি রি করবে জ্বলবে এক্ষুনি—তখন তুমি চীৎকার শুরু করবে।

গ্রামের মধ্যে গিয়া হরিহর ছেলেকে সঙ্গে করিয়া খিড়কীর দোর দিয়া বাড়ী ঢুকিল। সর্বজয়া খিড়কীর দোর খোলার শব্দে বাহিরে আসিয়া বলিল—এই এত রাত হোল! তা ওকে নিয়ে গিয়েচ, না একটা দোলাই গায়ে না কিছু!

হরিহর বলিল, আঃ নিয়ে গিয়ে যা বিরক্ত! এদিকে যায়, ওদিকে যায়, সামলে রাখতে পারিনে—আলকুশীর ফল ধরে টানতে যায়! পরে ছেলের দিকে চাহিয়া বলিল, কুঠির মাঠ দেখবো, কুঠির মাঠ দেখবো—কেমন হোল তো কুঠির মাঠ দেখা?

সকাল বেলা। আটটা কি নয়টা। হরিহরের পুত্র আপন মনে

রোয়াকে বসিয়া খেলা করিতেছে, তাহার একটা ছোট টিনের বাক্স আছে, সেটার ডালা ভাঙা। বাক্সের সমুদয় সম্পত্তি সে উপুড় করিয়া মেঝেতে ঢালিয়াছে,—একটা রং ওঠা কাঠের ঘোড়া, চার পয়সা দামের একটা টোল-খাওয়া টিনের ভেঁপু-বাঁশী, গোটাকতক কড়ি—এগুলি সে মায়ের অজ্ঞাতসারে লক্ষ্মীপূজার কড়ির চুপড়ী হইতে খুলিয়া লইয়াছিল ও পাছে কেহ টের পায় এই ভয়ে সর্বদা লুকাইয়া রাখে—একটা ছ'পয়সা দামের পিস্তল, কতকগুলো শুকনো নাটা ফল। দেখিতে ভাল বলিয়া তাহার দিদি কোথা হইতে অনেকগুলি কুড়াইয়া আনিয়াছিল, কিছু তাহাকে দিয়াছে, কিছু সে নিজের পুতুলের বাক্সে রাখিয়া দিয়াছে। খানকতক খাপরার কুচি। গঙ্গা-যমুনা খেলিতে এই খাপরাগুলির লক্ষ্য অব্যর্থ বলিয়া বিশ্বাস হওয়ায় সেগুলি সযত্নে বাক্সে রাখিয়া দিয়াছে, এগুলি তাহার মহা-মূল্যবান সম্পত্তি। এতগুলি জিনিসের মধ্যে সবে সে টিনের বাঁশীটি কয়েকবার বাজাইয়া সেটির সম্বন্ধে বিগতকৌতূহল হইয়া তাহাকে এক পাশে রাখিয়া দিয়াছে। কাঠের ঘোড়া নাড়াচাড়া করা হইয়া গিয়াছে। সেটিও এক পাশে পিঁজরাপোলের আসামীর ন্যায় পড়িয়া আছে। বর্তমানে সে গঙ্গা-যমুনা খেলিবার খাপরা-গুলিকে হাতে লইয়া মনে মনে দাওয়ার উপর গঙ্গা-যমুনার ঘর আঁকা কল্পনা করিয়া চোখ বুজিয়া খাপরা ছুঁড়িয়া দেখিতেছে তাক্ ঠিক হইতেছে কিনা!

এমন সময়ে তাহার দিদি দুর্গা উঠানের কাঁঠালতলা হইতে ডাকিল —অপু—ও অপু—। সে এতক্ষণ বাড়ী ছিল না, কোথা হইতে এইমাত্র আসিল। তাহার স্বর একটু সতর্কতামিশ্রিত। মানুষের গলার আওয়াজ পাইয়া অপু কলের পুতুলের মত লক্ষ্মীর চুপড়ীর কড়িগুলি তাড়াতাড়ি লুকাইয়া ফেলিল। পরে বলিল —কি রে দিদি?

দুর্গা হাত নাড়িয়া ডাকিল—আয় এদিকে —শোন্—

দুর্গার বয়স দশ-এগার বৎসর হইল। গড়ন পাত্‌লা, পাত্‌লা

রং অপুর মত অতটা ফর্সা নয়, একটু চাপা। হাতে কাচের চুড়ি, পরনে ময়লা কাপড়, মাথার চুল রুক্ষ—বাতাসে উড়িতেছে, মুখের গড়ন মন্দ নয়, অপুর মত চোখগুলি বেশ ডাগর ডাগর। অপু রোয়াক হইতে নামিয়া কাছে গেল, বলিল—কি রে ?

দুর্গার হাতে একটা নারিকেলের মালা। সেটা সে নীচু করিয়া দেখাইল, কতকগুলি কচি আম কাটা। সুর নীচু করিয়া বলিল —মা ঘাট থেকে আসে নি তো ?

অপু ঘাড় নাড়িয়া বলিল—উঁহু—

দুর্গা চুপি চুপি বলিল—একটু তেল আর একটু নুন নিয়ে আসতে পারিস ? আমের কুসী জারাবো—

অপু আহ্লাদের সহিত বলিয়া উঠিল—কোথায় পেলি রে দিদি ?

দুর্গা বলিল—পটলিদের বাগানে সিঁদুরকোটোর তলায় পড়ে ছিল—আন্ দিকি একটু নুন আর তেল ?

অপু দিদির দিকে চাহিয়া বলিল—তেলের ভাঁড় ছুঁলে মা মার্‌বে যে ? আমার কাপড় যে বাসি ?

তুই যা না শিগ্‌গির করে, মা'র আসতে এখন ঢের দেরী—ক্ষার কাচতে গিয়েচে—শিগ্‌গির যা –

অপু বলল—নারকোলের মালাটা আমায় দে। ওতে ঢেলে নিয়ে আস্‌বো—তুই খিড়কী দোরে গিয়ে ছাখ্ মা আস্‌চে কিনা। দুর্গা নিম্নস্বরে বলিল, তেল টেল যেন মেঝেতে ঢালিস্‌নে, সাবধানে নিবি নইলে মা টের পাবে—তুই তো একটা হাবা ছেলে—

অপু বাড়ীর মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিলে দুর্গা তাহার হাত হইতে মালা লইয়া আমগুলি বেশ করিয়া মাখিল,—বলিল, নে হাত পাত।

—তুই অতগুলো খাবি দিদি ?

—অতগুলো বুঝি হোল ? এই তো ভারি বেশী—যা—আচ্ছা নে আর দু'খানা—বাঃ, দেখতে বেশ হয়েচে রে, একটা লঙ্কা আনতে পারিস ? আর একখানা দেবো তা'হলে—

—ল্কা কি করে পাড়বো দিদি? মা যে তক্তার ওপর রেখে দেয়, আমি যে নাগাল পাইনে?

তবে থাক্‌গে যাক্—আবার ওবেলা আনবো এখন—পটলিদের ডোবার ধারের আমগাছটায় গুটি যা ধরেচে—দুপুরের রোদে তলায় ঝরে পড়ে—

দুর্গাদের বাড়ীর চারিদিকেই জঙ্গল। হরিহর রায়ের জ্ঞাতি-ভ্রাতা নীলমণি রায় সম্প্রতি গত বৎসর মারা গিয়াছেন, তাঁহার স্ত্রী পুত্রকন্যা লইয়া নিজ পিত্রালয়ে বাস করিতেছেন। কাজেই পাশের এ ভিটাও জঙ্গলাবৃত হইয়া পড়িয়া আছে। নিকটে আর কোনো লোকের বাড়ী নাই। পাঁচ মিনিটের পথ গেলে তবে ভুবন মুখুয্যের বাড়ী।

হরিহরের বাড়ীটাও অনেক দিন হইয়া গেল মেরামত হয় নাই, সামনের দিকের রোয়াক ভাঙা, ফাটলে বন-বিছুটি ও কালমেঘ গাছের বন গজাইয়াছে—ঘরের দোর-জানালার কপাট সব ভাঙা, নারিকেলের দড়ি দিয়া গরাদের সঙ্গে বাঁধা আছে।

খিড়কী দোর ঝনাৎ করিয়া খুলিবার শব্দ হইল এবং একটু পরেই সর্বজয়ার গলা শুনা গেল—দুগ্‌গা ও দুগ্‌গা—

দুর্গা বলিল—মা ডাকচে, যা দেখে আয়—ওখানা খেয়ে যা —মুখে যে নুনের গুঁড়ো লেগে আছে, মুছে ফ্যাল্—

মায়ের ডাক আর একবার কানে গেলেও দুর্গার এখন উত্তর দিবার সুযোগ নাই, মুখ ভর্তি। সে তাড়াতাড়ি জারানো আমের চাকলাগুলো খাইতে লাগিল। পরে এখনো অনেক অবশিষ্ট আছে দেখিয়া কাঁঠাল গাছটার কাছে সরিয়া গিয়া গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়াইয়া সেগুলি গোগ্রাসে গিলিতে লাগিল। অপু তাহার পাশে দাঁড়াইয়া নিজের অংশ প্রাণপণে গিলিতেছিল, কারণ চিবাইয়া খাওয়ার আর সময় নাই। খাইতে খাইতে দিদির দিকে চাহিয়া সে দোষ সম্বন্ধে সচেতনতা-সূচক হাসি হাসিল। দুর্গা খালি মাল্লাটা এক টান্ মারিয়া ভেরেণ্ডা-কচার বেড়া পার করিয়া নীলমণি

রায়ের ভিটার দিকে জঙ্গলের মধ্যে ছুঁড়িয়া দিল। ভাইয়ের দিকে চাহিয়া বলিল—মুখটা মুছে ফ্যাল্ না বাঁদর—নুন লেগে রয়েছে যে—

পরে দুর্গা নিরীহমুখে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া বলিল—কি মা?

—কোথায় বেরুনো হয়েছিল শুনি? একলা নিজে কতদিকে যাবো? সকাল থেকে ক্ষার কেচে গা-গতর ব্যাথা হয়ে গেল, একটুখানি যদি কোন দিক থেকে আসান আছে তোমাদের দিয়ে—অত বড় মেয়ে, সংসারের কুটোগাছটা ভেঙে দু'খানা করা নেই, কেবল পাড়ায় পাড়ায় টোটো টোক্‌লা সেধে বেড়াচ্ছেন—সে বাঁদর কোথায়?

অপু আসিয়া বলিল, মা, খিদে পেয়েচে।

রোসো রোসো, একটুখানি দাঁড়াও বাপু···একটুখানি হাঁপ জিরোতে দ্যাও। তোমাদের রাতদিন খিদে আর রাতদিন ফাই-ফরমাজ। ও দুগ্‌গা—দ্যাখ্‌তো বাছুরটা হাঁক পাড়চে কেন?

খানিকটা পরে সর্বজয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় বঁটি পাতিয়া শসা কাটিতে বসিল। অপু কাছে বসিয়া পড়িয়া বলিল—আর এট্টু আটা বের করো না মা, মুখে বড্ড লাগে।

দুর্গা নিজের ভাগ হাত পাতিয়া লইয়া সঙ্কুচিত সুরে বলিল—চাল ভাজা আর নেই মা?

অপু খাইতে খাইতে বলিল—উঃ, চিবোনো যায় না। আম খেয়ে দাঁত টকে—

দুর্গার ভ্রূকুটিমিশ্রিত চোখ-টেপায় বাধা পাইয়া তাহার কথা অর্ধপথে বন্ধ হইয়া গেল। তাহার মা জিজ্ঞাসা করিল—আম কোথায় পেলি?

সত্য কথা প্রকাশ করিতে সাহসী না হইয়া অপু দিদির দিকে জিজ্ঞাসাসূচক দৃষ্টিতে চাহিল। সর্বজয়া মেয়ের দিকে চাহিয়া বলিল—তুই কের এখন বেরিয়েছিলি বুঝি?

দুর্গা বিপন্নমুখে বলিল—ওকে জিগ্যেস করো না? আমি—এই তো এখন কাঁঠালতলায় দাঁড়িয়ে—তুমি যখন ডাকলে তখন তো

স্বর্ণ গোয়ালিনী গাই দুহিতে আসায় কথাটা চাপা পড়িয়া গেল। তাহার মা বলিল—যা বাছুরটা ধরগে যা—ডেকে ডেকে সারা হোল—কমলে বাছুর, ও সন্ন, এত বেলা ক'রে এলে কি বাঁচে? একটু সকাল্ করে না এলে এই তেতপ্পর পজ্জন্ত বাছুর বাঁধা—

দিদির পিছনে পিছনে অপুও দুধ দোয়া দেখিতে গেল। সে বাহির উঠানে পা দিতেই দুর্গা তার পিঠে দুম্ করিয়া নির্ঘাত এক কিল বসাইয়া দিয়া কহিল—লক্ষ্মীছাড়া বাঁদর! পরে মুখ ভ্যাঙাইয়া কহিল—আম খেয়ে দাঁত টকে গিয়েছে—আবার কোনো দিন আম দেবো খেও—ছাই দোবো—এই ওবেলাই পটলিদের কাঁকুড়তলির আম কুড়িয়ে এনে জারাবো, এত বড় বড় গুটি হয়েচে, মিষ্টি যেন গুড়—দেবো তোমায়? খেও এখন? হাবা একটা কোথাকার —যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকে?

অপুর বাড়ী হইতে কিছুদূরে একটা খুব বড় অশ্বত্থ গাছ ছিল। কেবল তাহার মাথাটা উহাদের দালানের জানালা কি রোয়াক হইতে দেখা যায়। অপু মাঝে মাঝে সেইদিকে চাহিয়া দেখিত। যতবার সে চাহিয়া দেখে, ততবার তাহার যেন অনেক—অনেক —অনেক দূরের কোন দেশের কথা মনে হয়—কোন্ দেশ, এ তাহার ঠিক ধারণা হইত না—কোথায় যেন কোথাকার দেশ—মার মুখে ঐ সব দেশের রাজপুত্তুরদের কথাই সে শোনে।

অনেক দূরের কথায় তাহার শিশুমনে একটা বিস্ময়মাখানো আনন্দের ভাবের সৃষ্টি করিত। নীল রং-এর আকাশটা অনেক দূর, ঘুড়িটা—কুঠির মাঠটা অনেক দূর—সে বুঝিতে পারিত না, —বলিতে পারিত না কাহাকেও, কিন্তু এসব কথায় তাহার মন যেন কোথায় উড়িয়া চলিয়া যাইত—এবং সর্বাপেক্ষা কৌতুকের বিষয় এই যে, অনেক দূরের এই কল্পনা তাহার মনকে অত্যন্ত চাপিয়া তাহাকে যেন কোথায় লইয়া ফেলিয়াছে—ঠিক সেই সময়েই মায়ের জন্য তাহার মন কেমন করিয়া উঠিত, যেখানে সে যাইতেছে সেখানে তাহার মা নাই, অমনি মায়ের কাছে যাইবার জন্য মন আকুল হইয়া পড়িত। কতবার যে এ রকম হইয়াছে। আকাশের গায়ে অনেক দূরে একটা চিল উড়িয়া যাইতেছে—ক্রমে ছোট্ট—ছোট্ট—ছোট্ট হইয়া নীলুদের তালগাছের উঁচু মাথাটা পিছনে ফেলিয়া দূর আকাশে ক্রমে মিলাইয়া যাইতেছে—চাহিয়া দেখিতে দেখিতে যেমন উড়ন্ত চিলটা দৃষ্টিপথের বাহির হইয়া যাইত, অমনি সে চোখ নামাইয়া লইয়া বাহির-বাটী হইতে এক দৌড়ে রান্নাঘরের

দাওয়ায় উঠিয়া গৃহকার্যরত মাকে জড়াইয়া ধরিত। মা বলিত—ছ্যাখো ছ্যাখো ছেলের কাণ্ড ছ্যাখো—ছাড়্—ছাড়্—দেখছিস্ সকড়ী হাত?···ছাড়ো মানিক আমার, সোনা আমার, তোমার জন্যে এই ছ্যাখো চিংড়িমাছ ভাজছি—তুমি যে চিংড়িমাছ ভালোবাসো! হ্যাঁ, দুষ্টুমি করে না—ছাড়ো—

আহারাদির পর দুপুরবেলা তাহার মা কখনো কখনো জানালার ধারে আঁচল পাতিয়া শুইয়া ছেঁড়া কাশীদাসী মহাভারতখানা সুর করিয়া পড়িত। বাড়ীর ধারে নারিকেল গাছটাতে শঙ্খচিল ডাকিত অপু নিকটে বসিয়া হাতের লেখা ক-খ লিখিতে লিখিতে একমনে মায়ের মুখের মহাভারত পড়া শুনিত। দুর্গাকে তাহার মা বলিত, একটা পান সেজে দে তো দুগ্‌গা। অপু বলিত মা, সেই ঘুঁটে-কুড়োনোর গল্পটা? তাহার মা বলে—ঘুঁটেকুড়োনোর কোন্ গল্প বল্ তো—ও সেই হরিহোড়ের? সে তো অন্নদা মঙ্গলে আছে, এতে তো নেই? পরে পান মুখে দিয়া সুর করিয়া পড়িতে থাকিত—

রাজা বলে শুন শুন মুনির নন্দন।
কহিব অপূর্ব কথা না যায় বর্ণন॥
সোমদত্ত নামে রাজা সিন্ধুদেশে ঘর।
দেবদ্বিজে হিংসা সদা অতি—

অপু অমনি মায়ের মুখের কাছে হাতখানি পাতিয়া বলিত, আমায় একটু পান? মা চিবানো পান নিজের মুখ হইতে ছেলের প্রসারিত হাতের উপর রাখিয়া বলিত—এঃ বড্ড তেতো—এই খয়েরগুলোর দোষ, রোজ হাটে বারণ করি ও-খয়ের যেন আনে না, তবুও—

জানালার বাহিরে বাঁশবনের, দুপুরের রৌদ্র-মাখানো শেওড়া ঘেঁটু বনের দিকে চাহিয়া চাহিয়া মহাভারতের—বিশেষত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কথা শুনিতে শুনিতে সে তন্ময় হইয়া যায়। মহাভারতের সমস্ত চরিত্রের মধ্যে কর্ণের চরিত্র বড় ভাল লাগে তাহার কাছে। ইহার কারণ কর্ণের উপর তাহার কেমন একটা মমতা হয়। রথের

চাকা মাটিতে পুঁতিয়া গিয়াছে—দুই হাতে প্রাণপণে সেই চাকা মাটি হইতে টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন—সেই নিরস্ত্র, অসহায় বিপন্ন কর্ণের অনুরোধ মিনতি উপেক্ষা করিয়া অর্জুন তীর ছুঁড়িয়া তাঁহাকে মারিয়া ফেলিলেন। মায়ের মুখে এই অংশ শুনিতে শুনিতে দুঃখে অপুর শিশুহৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিত, চোখের জল বাগ মানিত না—চোখ ছাপাইয়া তাহার নরম তুলতুলে গাল বাহিয়া গড়াইয়া পড়িত—সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দুঃখে চোখের জল পড়ার যে আনন্দ, তাহা তাহার মনোরাজ্যে নব অনুভূতির সজীবত্ব লইয়া পরিচিত হইতে লাগিল। জীবন-পথে যেদিক মানুষের চোখের জলে, দীনতায়, মৃত্যুতে, আশাহত ব্যর্থতায়, বেদনায় করুণ—পুরোনো বইখানার ছেঁড়া পাতার ভরপুর গন্ধে, মায়ের মুখের মিষ্টি সুরে, রৌদ্রভরা দুপুরের মায়া। অঙ্গুলি-নির্দেশে, তাহার শিশুদৃষ্টি অস্পষ্টভাবে সে পথের সন্ধান পাইত। বেলা পড়িলে মা গৃহকার্যে উঠিয়া গেলে, সে বাহিরে আসিয়া রোয়াকে দাঁড়াইয়া দূরের সেই অশ্বত্থ গাছটার দিকে এক এক দিন চাহিয়া দেখে—হয়তো কড়া চৈত্র-বৈশাখের রৌদ্রে গাছটার মাথা ধোঁয়া ধোঁয়া অস্পষ্ট, নয় তো বৈকালের রাঙা রোদ অলসভাবে গাছটার মাথায় জড়াইয়া আছে··· সকালের চেয়ে এই বৈকালের রাঙা-রোদ-মাখানো গাছটার দিকে চাহিয়াই তাহার মন কেমন করিত। কর্ণ যেন ঐ অশ্বত্থ গাছটার ওপারে আকাশের তলে, অনেক দূরে কোথায় এখনও মাটি হইতে রথের চাকা দুই হাতে প্রাণপণে টানিয়া তুলিতেছে···রোজই তোলে—রোজই তোলে—মহাবীর, কিন্তু চিরদিনের কৃপার পাত্র কর্ণ। ···বিজয়ী বীর অর্জুন নহে—যে রাজ্য পাইল, মান পাইল, রথের উপর হইতে বাণ ছুঁড়িয়া বিপন্ন শত্রুকে নাশ করিল; বিজয়ী কর্ণ—যে মানুষের চিরকালের চোখের জলে জাগিয়া রহিল, মানুষের বেদনার অনুভূতিতে সহচর হইয়া বিরাজ করিল—সে।

এক এক দিন মহাভারতের যুদ্ধের কাহিনী শুনিতে শুনিতে তাহার মনে হয় যুদ্ধ জিনিসটা মহাভারতে বড় কম লেখা আছে।

ইহার অভাব পূর্ণ করিবার জন্য এবং আশ মিটাইয়া যুদ্ধ জিনিসটা উপভোগ করিবার জন্য সে এক উপায় বাহির করিয়াছে। একটা বাখারি কিংবা হাল্‌কা কোন গাছের ডালকে অস্ত্রস্বরূপ হাতে লইয়া সে বাড়ীর পিছনে বাঁশবাগানের পথে অথবা বাহিরের উঠানে ঘুরিয়া বেড়ায় ও আপন মনে বলে—তারপর দ্রোণ তো একেবারে দশ বাণ ছুঁড়লেন, অর্জুন করলেন কি, একেবারে দুশোটা বাণ দিলে মেরে। তারপর—ও—সে কি যুদ্ধ! কি যুদ্ধ! বাণের চোটে চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল। এখানে সে মনে মনে যতগুলি বাণ হইলে তাহার আশা মিটে তাহার কল্পনা করে, যদিও তাহার কল্পনার ধারা মার মুখে কাশীদাসী মহাভারতে বর্ণিত যুদ্ধের প্রণালী সম্বন্ধে যাহা শুনা আছে তাহা অতিক্রম করে না) তারপর অর্জুন করলেন কি, ঢাল তরোয়াল নিয়ে রথ থেকে লাফিয়ে পড়লেন—পরে এই যুদ্ধ! দুর্যোধন এলেন—ভীম এলেন—বাণে বাণে আকাশ অন্ধকার ফেলেছে—আর কিছু দেখা গেল না।··· মহাভারতের রথিগণ মাত্র অষ্টাদশ দিবস যুদ্ধ করিয়া নাম কিনিয়া গিয়াছেন, কিন্তু রক্ত মাংসের দেহে জীবন্ত থাকিলে তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন, যশোলাভের পথ ক্রমশই কিরূপ দুর্গম হইয়া পড়িতেছে। বালকের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি করিতে তাঁহারা মাসের পর মাস সমানভাবে অস্ত্রচালনা করিতে পারিতেন কি?···

গ্রীষ্মকালের দিনটা, বৈশাখের মাঝামাঝি।

নীলমণি রায়ের ভিটার দিকে জঙ্গলের ধারে সেদিন দুপুরের কিছু পূর্বে দ্রোণগুরু বড় বিপদে পড়িয়াছেন—কপিধ্বজ রথ একেবারে তাঁহার ঘাড়ের উপরে, গাণ্ডীব-ধনু হইতে ব্রহ্মাস্ত্র মুক্ত হইবার বিলম্ব, চক্ষের পলক মাত্র, কুরুসৈন্যদলে হাহাকার উঠিয়াছে —এমন সময় শেওড়া বনের ওদিক হইতে হঠাৎ কে কৌতুকের কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, ও কিরে অপু! অপু চমকিয়া উঠিয়া আকর্ণ টানা জ্যা-কে হঠাৎ ছাড়িয়া দিয়া চাহিয়া দেখিল তাহার দিদি জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়াইয়া তাহার দিকে চাহিয়া খিল্‌ খিল্‌ করিয়া

হাসিতেছে। অপু চাহিতেই বলিল—হ্যাঁরে পাগলা, আপন মনে কি বকচিস বিড়্ বিড়্ করে, আর হাত পা নাড়ছিস? পরে সে ছুটিয়া আসিয়া সস্নেহে ভাই-এর কচি গালে চুমু খাইয়া বলিল—পাগল!···কোথাকার একটা পাগল, কি বকছিলি রে আপনু মনে?

অপু লজ্জিতমুখে বার বার বলিতে লাগিল—যাঃ···বকছিলাম বুঝি?···আচ্ছা, যাঃ—

অবশেষে দুর্গা হাসি থামাইয়া বলিল—আয় আমার সঙ্গে—পরে সে অপুর হাত ধরিয়া বনের মধ্যে লইয়া চলিল। খানিক দূর গিয়া হাসিমুখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—দেখেচিস? ···কত নোনা পেকেচে?···এখন কি করে পাড়া যায় বল দিকি?

অপু বলিল—উঃ অনেক রে দিদি!—একটা কঞ্চি দিয়ে পাড়া যায় না?

দুর্গা বলিল—তুই এক কাজ কর, ছুটে গিয়ে বাড়ীর মধ্যে থেকে আঁকুষিটা নিয়ে আয় দিকি। আঁকুষি দিয়ে টান দিলে পড়ে যাবে দেখিস এখন—

অপু বলিল—তুই এখানে দাঁড়া দিকি, আমি আন্‌চি—

অপু আঁকুষি আনিলে দুজনে মিলিয়া বহু চেষ্টা করিয়াও চার পাঁচটার বেশী ফল পাড়িতে পারিল না—খুব উঁচু গাছ, সর্বোচ্চ ডালে যে ফল আছে তাহা দুর্গা আঁকুষি দিয়াও নাগাল পাইল না। পরে সে বলিল—চল আজ এইগুলো নিয়ে যাই, নাইবার বেলায় মাকে সঙ্গে আনবো—মার হাতে ঠিক নাগাল আসবে। দে নোনাগুলো আমার কাছে, তুই আঁকুষিটা নে। নোলক পরবি?

একটা নীচু ঝোপের মাথায় ওড়্‌কলমীলতায় শাদা শাদা ফুলের কুঁড়ি, দুর্গা হাতের ফলগুলা নামাইয়া নিকটের ফুলের কুঁড়ি ছিঁড়িতে লাগিল। বলিল—এদিকে সরে আয়, নোলক পরিয়ে দি—

তাহার দিদি ওড়্‌কলমী ফুলের নোলক পরিতে ভালবাসে, বনজঙ্গল সন্ধান করিয়া সে প্রায়ই খুঁজিয়া আনিয়া নিজে পরে ও ইতিপূর্বে কয়েকবার অপুকেও পরাইয়াছে। অপু কিন্তু মনে মনে

নোলক-পরা পছন্দ করে না। তাহার ইচ্ছা, বলে, নোলকে তাহার দরকার নাই। তবে দিদির ভয়ে সে কিছু বলিল না। দিদিকে চটাইবার ইচ্ছা তাহার আদৌ নাই, কারণ দিদিই বনজঙ্গল ঘুরিয়া কুলটা, জামটা, নোনাটা, আমড়াটা সংগ্রহ করিয়া তাহাকে লুকাইয়া খাওয়ায়, এমন সব জিনিস জুটাইয়া আনে, যাহা হয়তো কুপথ্য হিসাবে উহাদের খাইতে নিষেধ আছে। কাজেই অন্যায় হইলেও দিদির কথা না শুনা তাহার সাহসে কুলায় না।

একটা কুঁড়ি ভাঙিয়া সাদা জলের মত যে আঠা বাহির হইল, তাহার সাহায্যে দুর্গা অপুর নাকে কুঁড়ি আঁটিয়া দিল, পরে নিজেও একটা পরিল—তারপর ভাইয়ের চিবুকে হাত দিয়া নিজের দিকে ভাল করিয়া ফিরাইয়া বলিল—দেখি কেমন দেখাচ্চে। বাঃ বেশ হয়েছে—চল মাকে দেখাইগে—

অপু লজ্জিত মুখে বলিল—না দিদি—

—চল না—খুলে ফেলিসনে যেন—বেশ হয়েচে—

বাড়ী আসিয়া দুর্গা নোনাফলগুলি রান্নাঘরের দাওয়ায় নামাইয়া রাখিল। সর্বজয়া রাঁধিতেছিল—দেখিয়া খুব খুশি হইয়া বলিল—কোথায় পেলি রে?

দুর্গা বলিল—ঐ লিচু-জঙ্গলে—অনেক আছে, কাল গিয়ে তুমি পাড়বে মা? এমন পাকা—একেবারে সিঁদুরের মত রাঙা—

সে আড়াল ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া বলিল—দ্যাখো মা—

অপু নোলক পরিয়া দিদির পিছনে দাঁড়াইয়া আছে। সর্বজয়া হাসিয়া বলিল—ও মা! ও আবার কে রে?—কে চিন্‌তে তো পারচি নে—

অপু লজ্জায় তাড়াতাড়ি নাকের ডগা হইতে ফুলের কুঁড়ি খুলিয়া ফেলিল।—বলিল—ঐ দিদি পরিয়ে দিয়েচে—

দুর্গা হঠাৎ বলিয়া উঠিল—চল্ রে অপু, ঐ কোথায় ডুগডুগী বাজচে, চল্ বাঁদর খেলাতে এসেছে ঠিক্ শীগগির আয়—

আগে আগে দুর্গা ও তাহার পিছনে পিছনে অপু বাটির বাহির

হইয়া গেল। সম্মুখের পথ বাহিয়া, বাঁদর নয়, ও-পাড়ার চিনিবাস ময়রা মাথায় করিয়া খাবার ফেরি করিতে বাহির হইয়াছে। ও-পাড়ায় তাহার দোকান, তা ছাড়া আবার গুড়ের ও ধানের ব্যবসাও করে। কিন্তু পুঁজি কম হওয়ায় কিছুতেই সুবিধা করিতে পারে না, অল্পদিনেই ফেল মারিয়া বসে। তখন হয়তো মাথায় করিয়া হাটে হাটে আলু পটল, কখনও পান বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। শেষে তাতেও যখন সুবিধা হয় না, তখন হয়ত সে ঝুলি ঘাড়ে করিয়া জাত-ব্যবসা আরম্ভ করে। পরে হঠাৎ একদিন দেখা যায় যে, আবার পাথুরে চুন মাথায় করিয়া বেড়াইতেছে। লোকে বলে একমাত্র মাছ ছাড়া এমন কোনো জিনিস নাই, যাহা তাহাকে বিক্রয় করিতে দেখা যায় নাই। কাল দশহরা, লোকে আজ হইতেই মুড়কী সন্দেশ কিনিয়া রাখিবে। চিনিবাস হরিহর রায়ের দুয়ার দিয়া গেলেও বাড়ী ঢুকিল না। কারণ সে জানে এ বাড়ীর লোক কখনও কিছু কেনে না। তবুও দুর্গা-অপুকে দরজায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—চাই নাকি?

অপু দিদির মুখের দিকে চাহিল। দুর্গা চিনিবাসের দিকে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—নাঃ—

চিনিবাস ভুবন মুখুয্যের বাড়ী গিয়া মাথার চাঙারী নামাইতেই বাড়ীর ছেলে-মেয়েরা কলরব করিতে করিতে তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল; ভুবন মুখুয্যে অবস্থাপন্ন লোক, বাড়ীতে পাঁচ ছয়টা গোলা আছে, এ গ্রামে অন্নদা রায়ের নীচেই জমিজমা ও সম্পত্তি বিষয়ে তাঁহার নাম করা যাইতে পারে।

ভুবন মুখুজ্যের স্ত্রী বহুদিন মারা গিয়াছেন। বর্তমানে তাঁহার সেই ভাইয়ের বিধবা স্ত্রী সংসারের কর্ত্রী।

সেজ-বউ-এর বয়স চল্লিশের উপর হইবে, অত্যন্ত কড়া মেজাজের মানুষ বলিয়া খ্যাতি আছে।

সেজ-বৌ একখানা মাজা পিতলের সরায় করিয়া চিনিবাসের নিকট হইতে মুড়কী, সন্দেশ, বাতাসা দশহরা পূজার জন্য লইলেন

ভুবন মুখুয্যের ছেলেমেয়ে ও তাঁহার নিজের ছেলে সুনীল সেই-খানেই দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাদের জন্যও খাবার কিনিলেন। পরে অপুকে সঙ্গে লইয়া দুর্গা চিনিবাসের পিছন পিছন ঢুকিয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া সেজ-বৌ নিজের ছেলে সুনীলের কাঁধে হাত দিয়া একটু ঠেলিয়া দিয়া বললেন—যাও না, রোয়াকে উঠে গিয়ে খাও না। এখানে ঠাকুরের জিনিস, মুখ থেকে ফেলে এঁটো করে বসবে।

চিনিবাস চাঙারী মাথায় তুলিয়া পুনরায় অন্য বাড়ী চলিল। দুর্গা বলিল—আয় অপু, চল দেখিগে টুনুদের বাড়ী—

ইহারা সদর দরজা পার হইতেই সেজ-বৌ মুখ ঘুরাইয়া বলিয়া উঠিলেন—দেখতে পারিনে বাপু, ছুঁড়িটার যে কী হ্যাংলা স্বভাব—নিজের বাড়ী আছে, গিয়ে বসে কিনে খেগে যা না? তা না, লোকের দোর দোর—যেমন মা তেমনি ছাঁ—

ইহাদের বাটীর বাহির হইয়া দুর্গা ভাইকে আশ্বাস দিবার সুরে বলিল—চিনিবাসের ভারি তো খাবার। বাবার কাছ থেকে দেখিস রথের সময় চারটে পয়সা নেবো—তুই দুটো, আমি দুটো। তুই আমি মুড়কী কিনে খাবো—

খানিকটা পরে ভাবিয়া অপু জিজ্ঞাসা করিল—রথের আর কতদিন আছে রে দিদি?

এদিনের ব্যাপারটা এইরূপে ঘটিল।

অপু বাবার আদেশে তালপাতাতে সাতখানা ক খ হাতের লেখা. শেষ করিয়া কি করা যায় ভাবিতে ভাবিতে বাড়ীর মধ্যে দিদিকে খুঁজিতে গেল। দুর্গা মায়ের ভয়ে সকালে নাহিয়া আসিয়া ভিতরের উঠানের পেঁপেতলায় পুণ্যিপুকুরের ব্রত করিতেছে। উঠানে ছোট্ট চৌকোণা গর্ত্ত কাটিয়া তাহার চারিধারে ছোলা, মটর ছড়াইয়া দিয়াছিল—ভিজে মাটিতে সেগুলির অঙ্কুর বাহির হইয়াছে—চারিদিকে কলার ছোট বোগ পুঁতিয়া ধারে পিটুলি গোলার আলাপন দিতেছে—পদ্মলতা,—পাখী, ধানের শীষ্, নতুন ওঠা সূর্য।

দুর্গা বলিল,—দাঁড়া, মন্তরটা বলে চল্ একজায়গায় যাব।

—কোথা রে, দিদি—

—বল্ না, নিয়ে যাবো এখন, দেখিস এখন—। পরে আনুষঙ্গিক বিধি অনুষ্ঠান সাঙ্গ করিয়া সে এক-নিঃশ্বাসে আবৃত্তি করিতে লাগিল—

পুণ্যিপুকুর পুষ্পমালা কে পূজে রে দুকুর বেলা ?
আমি সতী লীলাবতী ভায়ের বোন্ ভাগ্যবতী—

অপু দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল, বিদ্রূপের ভঙ্গিতে হাসিয়া বলিল —ইঃ!

দুর্গা ছড়া থামাইয়া ঈষৎ লজ্জা মিশানো হাসির সঙ্গে বলিল—তুই ও রকম কচ্চিস কেন ? যা এখান থেকে—তোর এখানে কি ?—যা।

অপু হাসিয়া চলিয়া গেল। যাইতে যাইতে আবৃত্তি করিতে লাগিল—আমি সতী লীলাবতী ভাই বোন ভাগ্যবতী, হি হি, ভাই বোন ভাগ্যবতী—হি হি—

দুর্গা বলিল, তোমার বড় ইয়ে হয়েছে, না? মাকে ব'লে তোমার ভ্যাঙচানো বার করবো এখন—

ব্রতানুষ্ঠান শেষ করিয়া দুর্গা বলিল, চল গড়ের পুকুরে অনেক পানফল হ'য়ে আছে—ভোঁদার মা বলছিল, চল্ নিয়ে আসি—

গ্রামের একেবারে উত্তরাংশে চারিধারে বাঁশবন ও আগাছা এবং প্রাচীন আমকাঁঠালের বাগানের ভিতর দিয়া পথ। লোকালয় হইতে অনেক দূরে গভীর বন যেখানে শেষ হইয়াছে, সেখানে মাঠের ধারে মজা পুকুরটা। কোনকালে গ্রামের আদি বাসিন্দা মজুমদারের বাড়ীর চতুর্দিকে যে গড়খাই ছিল তাহার অন্য অংশ এখন ভরাট হইয়া গিয়াছে—কেবল এই খাতটাতে বারোমাস জল থাকে, ইহারই নাম গড়ের পুকুর। মজুমদারদের বাড়ীর কোন চিহ্ন এখন নাই।

সেখানে পৌঁছিয়া তাহারা দেখিল পুকুরে পানফল অনেক আছে বটে, কিন্তু কিনারায় ধারে বিশেষ কিছু নাই, সবই জল হইতে দূরে। দুর্গা বলিল—অপু, একটা বাঁশের কঞ্চি ছাখ তো খুঁজে—তাই দিয়ে টেনে টেনে আনবো। পরে সে পুকুরধারের ঝোপের শেওড়া গাছ হইতে পাকা শেওড়ার ফল তুলিয়া খাইতে লাগিল। অপু বনের মধ্যে কঞ্চি খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিতে পাইয়া বলিল—ও দিদি, ও ফল খাস্‌নি!—দূর—আশশ্যাওড়ার ফল কি খায় রে? ও তো পাখাতে খায়—

দুর্গা পাকা ফল টিপিয়া বীজ বাহির করিতে করিতে বলিল—আয় দিকি—ছাখ দিকি খেয়ে—মিষ্টি যেন গুড়—কে বলেছে খায় না? আমি তো কত খেইচি।

অপু কঞ্চি-কুড়ানো রাখিয়া দিদির কাছে আসিয়া বলিল—খেলে যে বলে পাগল হয়? আমায় একটা দে দিকি দিদি—

পরে সে খাইয়া, মুখ একটু কাঁচুমাচু করিয়া বলিল এট্টু এট্টু তেতো যে দিদি—

—তা এট্টু তেতো থাকবে না? তা থাক্, কেমন মিষ্টি বল্

দিকি -- কথা শেষ করিয়া দুর্গা খুব খুশীর সহিত গোটাকতক পাকা ফল মুখের মধ্যে পুরিল।

জন্মিয়া পর্যন্ত ইহার কখনো কোনো ভাল জিনিস খাইতে পায় নাই। অথচ পৃথিবীতে ইহারা নতুন আসিয়াছে, জিহ্বা ইহাদের নতুন—তাহা পৃথিবীর নানা রস, বিশেষত মিষ্ট রস আস্বাদ করিবার জন্য লালায়িত। সন্দেশ মিঠাই কিনিয়া সে পরিতৃপ্তি লাভ করিবার সুযোগ ইহাদের ঘটে না—বিশ্বের অনন্ত-সম্পদের মধ্যে তুচ্ছ বনগাছ হইতে মিষ্টিরস আহরণরত এই সব লুব্ধ দরিদ্র ঘরের বালক-বালিকাদের জন্য তাই করুণাময়ী বনদেবীরা বনের তুচ্ছ ফুল ফল মিষ্টি মধুতে ভরাইয়া রাখেন।

খানিকটা পরে দুর্গা পুকুরের জলে একটু নামিয়া বলিল—কত নাল ফুল রয়েছে অপু। দাঁড়া, তুলচি! জলে আরও নামিয়া সে দুইটা ফুলের লতা ধরিয়া টানিল—ডাঙায় ছুঁড়িয়া বলিল—ধর্ অপু। অপু বলিল—পানফল তো খুব জলে—ওখানে কি ক'রে যাবি দিদি? দুর্গা একটা কঞ্চি দিয়া দূর জলের পানফলের গাছগুলা টানিবার চেষ্টা করিয়া পারিল না। বলিল—বড্ড গড়ানো পুকুর রে—গড়িয়ে যাচ্চি ডুব জলে—নাগাল পাই কি ক'রে? তুই এক কাজ কর্, পেছন থেকে আমার আঁচল ধ'রে টেনে রাখ দিকি, আমি কঞ্চি দিয়ে পানফলের ঝাঁকটা টেনে আনি।

বনের মধ্যে হলদে কি একটা পাখী ময়নাকাঁটা গাছের ডালের আগায় বসিয়া পাছা নাচাইয়া ভারি চমৎকার শিষ দিতেছিল। অপু চাহিয়া চাহিয়া দেখিয়া বলিল—কি পাখী রে দিদি?

—পাখী-টাখী এখন থাক্—ধর্ দিকি বেশ ক'রে আঁচলটা টেনে, গড়িয়ে যাবো—জোর ক'রে—

অপু পিছন হইতে আঁচল টানিয়া রহিল। দুর্গা পায়ে পায়ে নামিয়া যতদূর যায় কঞ্চি আগাইয়া দিল। কাপড়-চোপড় ভিজিয়া গেল তবু নাগাল আসে না—আরও একটুখানি নামিয়া আঙুলের আগায় মাত্র কঞ্চিখানাকে ধরিয়া টানিবার চেষ্টা করিল। অপু

টানিয়া ধরিয়া থাকিতে থাকিতে শক্তিতে আর কুলাইতেছে না দেখিয়া পিছন হইতে হাসিয়া উঠিল। হাসির সঙ্গে আঁচল ঢিলা হওয়াতে দুর্গা জলের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল কিন্তু তখনই সামলাইয়া হাসিয়া বলিল—দূর, তুই যদি কোন কাজের ছেলে—ধর্ ফের। অতিকষ্টে একটা পানফলের ঝাঁক কাছে আসিল—দুর্গা কৌতূহলের সহিত দেখিতে লাগিল কতগুলো পানফল ধরিয়াছে পরে ডাঙায় ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল—বড্ড কচি, এখনও দুধ হয়নি মধ্যে, আর একবার ধর তো। অপু আবার পিছন হইতে টানিয়া ধরিয়া রহিল। খানিকটা থাকিবার পর সে দিদির ঝুঁকিবার সঙ্গে সঙ্গে টানের চোটে আবার দু-এক পা জলের দিকে আগাইয়া আসিতে লাগিল —পরে কাপড় ভিজিয়া যায় দেখিয়া হাল ছাড়িয়া হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল।

দুর্গা হাসিয়া বলিল, দূর ?

ভাইবোনের কলহাস্যে খানিকক্ষণ ধরিয়া পুকুরপ্রান্তের নির্জন বাঁশবাগান মুখরিত হইতে লাগিল। দুর্গা বলিল, এতটুকু যদি জোর থাকে তোর গায়ে ? গাবের ঢেকী কোথাকার ?

খানিকটা পরে দুর্গা জলে নামিয়া আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতেছে, অপু ডাঙায় দাঁড়াইয়া আছে, এমন সময় অপু পাশের একটা শেওড়া গাছের দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিল—দিদি, দ্যাখ কি এখানে।...পরে সে ছুটিয়া গিয়া মাটি খুঁড়িয়া কি তুলিতে লাগিল!

দুর্গা জল হইতে জিজ্ঞাসা করিল—কি রে ? পরে সেও উঠিয়া ভাইয়ের কাছে আসিল।

অপু ততক্ষণ মাটি খুঁড়িয়া কি একটা বাহির করিয়া কোঁচার কাপড় দিয়া মাটি মুছিয়া সাফ করিতেছে। হাতে করিয়া আহ্লাদের সহিত দিদিকে দেখাইয়া বলিল—দ্যাখ দিদি, চক্‌চক্ কচ্ছে—কি জিনিস রে ?

দুর্গা হাতে লইয়া দেখিল—গোলমত একদিকে ছুঁচোলো পল-

কাটাকাটা চক্‌চকে কি একটা জিনিস সে খানিকক্ষণ আগ্রহের সহিত নানাভাবে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে লাগিল।

হঠাৎ কি ভাবিয়া তাহার রুক্ষচুলে-ঘেরা মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে ভয়ে ভয়ে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল কেহ দেখিতেছে কিনা। চুপি-চুপি বলিল—অপু, এটা বোধ হয় হীরে? চুপ কর্‌ চেঁচাসনি। পরে ভয়ে-ভয়ে আর একবার চাহিয়া দেখিল।

অপু দিদির দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। হীরক বস্তুটি তাহার অজ্ঞাত নয় বটে,—মায়ের মুখে, দিদির মুখে রূপকথার রাজপুত্র ও রাজকন্যার হীরামুক্তার অলঙ্কারের ঘটা সে অনেকবার শুনিয়াছে; কিন্তু হীরা জিনিসটা কি রকম দেখিতে, সে সম্বন্ধে তাহার মনে একটু ভুল ধারণা ছিল। তাহার মনে হইত হীরা দেখিতে মাছের ডিমের মত হলদে হলদে, তবে নরম নয়—শক্ত।...

সর্বজয়া বাড়ী ছিল না, পাড়া হইতে আসিয়া দেখিল—ছেলে-মেয়ে বাড়ীর ভিতর দিকে দরজার কাছে দাঁড়াইয়া আছে। কাছে যাইতে দুর্গা চুপি চুপি বলিল—মা, একটা জিনিস কুড়িয়ে পেয়েচি আমরা। গড়ের পুকুরে পানফল তুলতে গিয়াছিলাম মা। সেখানে জঙ্গলের মধ্যে এইটে পোঁতা ছিল।

অপু বলিল—আমি দেখে দিদিকে বল্লাম, মা।

দুর্গা আঁচল হইতে জিনিসটা খুলিয়া মায়ের হাতে দিয়া বলিল—খ্যাখো দিকি কি এটা মা?

সর্বজয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে লাগিল। দুর্গা চুপি চুপি বলিল—মা, এটা ঠিক হীরে—নয়?

সর্বজয়ারও হীরক সম্বন্ধে ধারণা তাহাদের অপেক্ষা বেশী স্পষ্ট নহে; সে সন্দিগ্ধস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—তুই কি ক'রে জানলি হীরে?

দুর্গা বলিল—মজুমদারেরা বড়লোক ছিলো তো মা? ওদের ভিটের জঙ্গলে কারা নাকি মোহর কুড়িয়ে পেয়েছিল—পিসি গল্প করতো। এটা একেবারে পুকুরের ধারে বনের মধ্যে পোঁতা ছিল, রোদ্দুর লেগে চক্‌চক্‌ করছিল,—এঠিক মা হীরে।

সর্বজয়া বলিল—আগে উনি আসুন, ওঁকে দেখাই।

দুর্গা বাহিরে উঠানে আসিয়া আহ্লাদের সহিত ভাইকে বলিল —হীরে যদি হয়, তবে দেখিস আমরা বড়মানুষ হয়ে যাবো।

অপু না বুঝিয়া বোকার মত হি হি করিয়া হাসিল।

ছেলেমেয়ে চলিয়া গেলে জিনিসটা বাহির করিয়া সর্বজয়া ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল। গোলমত, ধারকাটা ও পলতোলা, এক মুখ ছুঁচোলো—যেন সিন্দুর কৌটার ঢাক্‌নির উপরটা। বেশ চক্‌চকে। সবজয়ার মনে হইল যেন অনেক রকম রং সে ইহার মধ্যে দেখিতে পাইতেছে তবে কাচ যে নয়—ইহা ঠিক। এ রকম ধরনের কাচ সে কখনো দেখিয়াছে বলিয়া তো মনে হয়। হঠাৎ তাহার সমস্ত গা দিয়া যেন কিসের স্রোত বহিয়া গেল, তাহার মনের এক কোণে নানা সন্দেহের বাধা ঠেলিয়া একটা গাঢ় দুরাশা ভয়ে ভয়ে একটু উঁকি মারিল—সত্যিই যদি হীরে হয় তা হোলে।

হীরক সম্বন্ধে তাহার ধারণাটা পরশপাথর কিংবা সাপের মাথার মণি জাতীয় ছিল। কাহিনীর কথা মাত্র, বাস্তব জগতে বড় একটা দেখা যায় না; আর যদি বা দেখা যায়, তবে দুনিয়ার ঐশ্বর্য বোধ হয় এক টুক্‌রো হীরার বদলে পাওয়া যাইতে পারে।

খানিকটা পরে একটা পুঁটুলি হাতে হরিহর বাড়ী ঢুকিল।

সর্বজয়া বলিল—ওগো, শোনো, এদিকে এসো তো। দ্যাখো তো এটা কি!

হরিহর হাতে লইয়া বলিল—কোথায় পেলে?

—দুগ্‌গা গড়ের পুকুরে পানফল তুলতে গিয়েছিল, কুড়িয়ে পেয়েছে। কি বলো দিকি?

হরিহর খানিকটা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া বলিল—কাচ, না হয়, পাথর-টাথর হবে—এতটুকু জিনিস, ঠিক বুঝতে পারচি নে।

সর্বজয়ার মনে একটুখানি ক্ষীণ আশার রেখা দেখা দিল—কাচ হইলে তাহার স্বামী কি চিনিতে পারিত না। পরে সে চুপিচুপি যেন পাছে স্বামী বিরুদ্ধযুক্তি দেখায় এই ভয়ে বলিল—হীরে নয়

তো? দুগ্‌গা বলছিলো মজুমদার বাড়ীর গড়ে তো কত লোক কত কি কুড়িয়ে পেয়েছে! যদি হীরে হয়!

—হ্যাঁ, হীরে যদি পথেঘাটে পাওয়া যেতো তবে আর ভাবনা কি ছিল? তুমিও যেমন!···তাহার মনে মনে ধারণা হইল ইহা কাচ। পরক্ষণেই কিন্তু মনে হইল—হয় ত হইতেও পারে। বলা যায় কি! মজুমদারেরা বড় লোক ছিল। বিচিত্র কি যে হয়ত তাহাদেরই গহনায় কোনো কালে বসানো ছিল, কি করিয়া মাটির মধ্যে পুঁতিয়া গিয়াছে! কথায় বলে, কপালে না থাকলে গুপ্তধন হাতে পড়িলেও চেনা যায় না—শেষে কি দরিদ্র ব্রাহ্মণের গল্পের মত ঘটিবে?

সে বলিল—আচ্ছা দাঁড়াও, একবার বরং গাঙ্গুলী-বাড়ী দেখিয়ে আনি!

রাঁধিতে রাঁধিতে সর্বজয়া বার বার মনে মনে বলিতে লাগিল —দোহাই ঠাকুর, কত লোক তো কত কি কুড়িয়ে পায়। এই কষ্ট যাচ্ছে সংসারে—বাছাদের দিকে মুখ তুলে তাকিও—দোহাই ঠাকুর!

তাহার বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করিতেছিল।

খানিকটা পরে দুর্গা বাড়ী আসিয়া আগ্রহের সুরে বলিল—বাবা এখনও বাড়ী ফেরে নি, হ্যাঁ মা?

সঙ্গে সঙ্গে হরিহর বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া বলিল—হুঁঃ, তখনই আমি বল্লাম এ কিছুই নয়। গাঙ্গুলী মশায়ের জামাই সত্যবাবু কলকাতা থেকে এসেছেন—তিনি দেখে বল্লেন, এ একরকম বেলোয়ারী কাচ—ঝাড়-লণ্ঠনে ঝুলোনো থাকে। রাস্তাঘাটে যদি হীরে-জহরৎ পাওয়া যেত, তা হোলে···তুমিও যেমন!

নেবুর পাতায় করম্‌চা আট

বৈশাখমাসের দিন। প্রায় দুপুর বেলা।

সর্বজয়া বাটনা বাটিতে বাটিতে ডান হাতের কাছে রক্ষিত একটা ফুলের সাজিতে (অনেকদিন হইতে ফুলের সহিত ইহার কোনো সম্পর্ক নাই, মশলা রাখিবার পাত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়) মশলা খুঁজিতে গিয়া বলিল—আবার জিরে-মরিচের পুঁটুলিটা কোথায় নিয়ে পালালি? বড্ড জ্বালাতন কচ্চিস অপু—রাঁধতে দিবিনে! তারপর একটু পরেই বোলো এখন—মা ক্ষিদে পেয়েছে!

অপুর দেখা নাই।

—দিয়ে যা বাপ আমার, লক্ষ্মী আমার,—কেন জ্বালাতন কচ্চিস বল্ দিকি? দেখচিস বেলা হয়ে যাচ্ছে?

অপু রান্নাঘরের ভিতর হইতে দুয়ারের পাশ দিয়ে ঈষৎ উঁকি মারিল; মায়ের চোখ সে দিকে পড়িতেই তাহার দুষ্টুমির হাসিভরা টুকটুকে মুখখানা শামুকের খোলার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িবার মত তৎক্ষণাৎ আবার দুয়ারের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেল। সর্বজয়া বলিল—ছাখো দিকি কাণ্ড—কেন বাপু দিক করিস দুপুর বেলা? দিয়ে যা—

অপু পুনরায় হাসিমুখে উঁকি মারিল।

—ওই আমি দেখতে পেয়েছি—আর লুকুতে হবে না, দিয়ে যা—

অপু হাসিতে হাসিতে গুপ্তস্থান হইতে বাহির হইয়া মশলার পুঁটুলি মায়ের সামনে রাখিয়া দিল।

তাহার মা বলিল, যা একটু খেলা করগে যা বাইরে। দেখ্‌গে

যা দিকি তোর দিদি কোথায় আছে। গাবতলায় দাঁড়িয়ে একটু হাঁক দিয়ে ডাক দিকি। তার আজ নাইবার দিন—হতচ্ছাড়া মেয়ের নাগাল পাওয়ার জো আছে? যা তো, লক্ষ্মী ছেলে—

কিন্তু এখানে মাতৃ আদেশ পালন করিয়া সুপুত্র হইবার কোনো চেষ্টা তাহার দেখা গেল না। সে বাটনা-বাটা-রত মায়ের পিছনে গিয়া কি করিতে লাগিল।

হু-উ-উ-উ-উম্—

সর্বজয়া পিছন ফিরিয়া দেখিল অপু বড়ি দেওয়ার জন্য চালের বাতায় রক্ষিত একটা পুরানো চট্ আনিয়া মুড়ি দিয়া মেঝেতে হামাগুড়ি দিয়া বসিয়াছে।

দ্যাখো, দ্যাখো ছেলের কাণ্ড দ্যাখো একবার। ও লক্ষ্মীছাড়া, ওতে যে সাত-রাজ্যির ধূলো। ফ্যাল্ ফ্যাল্—সাপ মাকড় আছে না কি আছে ওর মধ্যে—আজ কদ্দিন থেকে তোলা রয়েছে।

—হু-উ-উ-উ-উম্—(পূর্বাপেক্ষা গম্ভীর সুরে)

নাঃ বল্লে যদি কথা শোনে—বাবা আমার সোনা আমার, ওখানা ফ্যাল—আমার বাটনার হাত—দুষ্টুমি কোরো না, ছিঃ!

থলে-মোড়া মূর্তিটা হামাগুড়ি দিয়া এবার দুই কদম আগাইয়া আসিল। সর্বজয়া বলিল, ছুঁবি—ছুঁবি—ছুঁও না মানিক আমার—ওঃ, ভয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গিইচি—ভারি ভয় হয়েছে আমার!

অপু হি-হি করিয়া হাসিয়া থলেখানা খুলিয়া একপাশে রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার মাথার চুল, মুখ, চোখের ভুরু, কান ধূলায় ভরিয়াছে। মুখ কাঁচু-মাচু করিয়া সামনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাঁত কিচ কিচ করিতেছে।

—ওমা আমার কি হবে! হ্যাঁরে হতভাগা, ধূলো মেখে যে একবারে ভূত সেজেচিস্? উঃ—ওই পুরোনো থলেটার ধূলো! একেবারে পাগল!

বৈকালের দিকটা হঠাৎ চারিদিক অন্ধকার করিয়া কালবৈশাখীর

ঝড় উঠিল। অনেকক্ষণ হইতে মেঘ-মেঘ করিতেছিল, তবুও ঝড়টা যেন খুব শীঘ্র আসিয়া পড়িল। অপুদের বাড়ীর সামনের বাঁশ-ঝাড়ের বাঁশগুলো পাঁচিলের উপর হইতে ঝড়ের বেগে হটিয়া ওধারে পড়াতে বাড়ীটা যেন ফাঁকা ফাঁকা দেখাইতে লাগিল—ধূলা, বাঁশপাতা, কাঁটালপাতা, খড়, চারিধার হইতে উড়িয়া তাহাদের উঠান ভরাইয়া ফেলিল। দুর্গা বাটীর বাহির হইয়া আম কুড়াইবার জন্য দৌড়াইল—অপুও দিদির পিছু পিছু ছুটিল। দুর্গা ছুটিতে ছুটিতে বলিল—শীগ্‌গীর ছোট্ তুই বরং সিঁদুরকৌটো-তলায় থাক্, আমি যাই সোনামুখীতলায়—দৌড়ে—দৌড়ে। ধূলায় চারিদিক ভরিয়া গিয়াছে—বড় বড় গাছের ডাল ঝড়ে বাঁকিয়া গাছ নেড়া নেড়া দেখাইতেছে। গাছে গাছে সোঁ সোঁ, বোঁ বোঁ শব্দে বাতাস বহিতেছে—বাগানের শুক্‌না ডাল, কুটা, বাঁশের খোলা উড়িয়া পড়িতেছে—শুক্‌না বাঁশপাতা ছুঁচালো আগাটা উঁচুদিকে তুলিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে আকাশে উঠিতেছে—কুক্‌শিমা গাছের শুঁয়ার মত পালকওয়ালা সাদা সাদা ফুল ঝড়ের মুখে কোথা হইতে অজস্র উড়িয়া আসিতেছে—বাতাসের শব্দে কান পাতা যায় না।

সোনামুখী-তলায় পৌঁছিয়াই অপু মহা-উৎসাহে চীৎকার করিতে করিতে লাফাইয়া এদিক ওদিক ছুটিতে লাগিল—এই যে দিদি, ওই একটা পড়লো রে দিদি—ঐ আর একটা রে দিদি। চীৎকার যতটা করিতে লাগিল তাহার অনুপাতে সে আম কুড়াইতে পারিল না। ঝড় ঘোর রবে বাড়িয়া চলিয়াছে। ঝড়ের শব্দে আম পড়ার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না, যদি বা শোনা যায় ঠিক কোন জায়গা বরাবর শব্দটা হইল—তাহা ধরিতে পারা যায় না। দুর্গা আট নয়টা আম কুড়াইয়া ফেলিল, অপু এতক্ষণের ছুটাছুটিতে মোটে পাইল দুইটা। তাহাই সে খুশির সহিত দেখাইয়া বলিতে লাগিল—এই ত্যাখ্ দিদি, কত বড় ত্যাখ,—ঐ একটা পড়লো—ওই ওদিকে—

এমন সময়ে হৈ-হাই শব্দে ভুবন মুখুয্যের বাড়ীর ছেলে-মেয়েরা

সব আম কুড়াইতে আসিতেছে শোনা গেল। সতু চেঁচাইয়া বলিল —ও ভাই, দুগ্‌গাদি আর অপু আম কুড়ুচ্ছে—

দল আসিয়া সোনামুখী-তলায় পৌঁছিল। সতু বলিল—আমাদের বাগানে কেন এয়েচ আম কুড়ুতে? সেদিন মা বারণ করে দিয়েচে না? দেখি কতগুলো আম কুড়িয়েচো?

পরে দলের দিকে চাহিয়া বলিল—সোনামুখীর কতগুলো আম কুড়িয়েচে দেখছিস টুনু? যাও আমাদের বাগান থেকে দুগ্‌গাদি, —মাকে গিয়ে নইলে বলে দেবো।

রাণু বলিল—কেন তাড়িয়ে দিচ্ছিস সতু? ওরাও কুড়ুক—আমরাও কুড়ুই।

—কুড়োবে বই কি। ও এখানে থাকলে সব আম ওই নেবে। আমাদের বাগানে কেন আসবে ও? না, যাও দুগ্‌গাদি—আমাদের তলায় থাকতে দেবো না।

অন্য সময় হইলে দুর্গা হয়তো সহজে পরাজয় স্বীকার করিত না —কিন্তু সেদিন ইহাদেরই কৃত অভিযোগে মায়ের নিকট মার খাইয়া তাহার পুনরায় বিবাদ বাধাইবার সাহস ছিল না। ভাই খুব সহজেই পরাজয় স্বীকার করিয়া লইয়া সে একটু মনমরা ভাবে বলিল —অপু, আয় রে, চল্। পরে হঠাৎ মুখে কৃত্রিম উল্লাসের ভাব আনিয়া বলিল—আমরা সেই জায়গায় যাই চল্ অপু, এখানে থাকতে না দিলে বয়ে গেল—বুঝলিতো?—এখানকার চেয়েও বড় বড় আম —তুই আমি মজা করে কুড়োবো এখন—চলে আয়—এবং এখানে এতক্ষণ ছিল বলিয়া একটা বৃহত্তর লাভ হইতে বঞ্চিত ছিল, চলিয়া যাওয়ায় প্রকৃতপক্ষে শাপে বর হইল, সকলের সম্মুখে এইরূপ ভাব দেখাইয়া যেন অধিকতর উৎসাহের সহিত অপুকে পিছনে লইয়া রাংচিতার বেড়ার ফাঁক গলিয়া বাগানের বাহির হইয়া গেল। রাণু বলিল—কেন ভাই ওদের তাড়িয়ে দিলে—তুমি ভারি হিংসুক কিন্তু সতু দা! রাণুর মনে দুর্গার চোখের চাহনি বড় ঘা দিল।

অপু অত শত বোঝে নাই, বেড়ার বাহিরের পথে আসিয়া বলিল

—কোন্ জায়গায় বড় বড় আম রে দিদি? পুঁটুদের সলতেপাখী-তলায়? কোন্ তলায় দুর্গা তাহা ঠিক করে নাই, একটু ভাবিয়া বলিল—চল্ গড়ের পুকুরের ধারের বাগানে যাবি—ওদিকে সব বড় বড় গাছ আছে—চল—। গড়ের পুকুর এখান হইতে প্রায় পনেরো মিনিট ধরিয়া সুঁড়ি পথে অনবরত বন-বাগান অতিক্রম করিয়া তবে পৌঁছানো যায়। অনেক কালের প্রাচীন আম ও কাঁঠালের গাছ – গাছতলায় বন-চালতা, ময়না-কাঁটা, ষাঁড়া গাছের দুর্ভেদ্য জঙ্গল। দূর বলিয়া এবং জনপ্রাণীর বাসশূন্য গভীর বনের মধ্যে বলিয়া এ সব স্থানে কেহ বড় একটা আম কুড়াইতে আসে না। কাছির মত মোটা মোটা অনেক কালের পুরানো গুলঞ্চলতা এগাছে ওগাছে দুলিতেছে, বড় বড় প্রাচীন গাছের তলাকার কাঁটাভরা ঘন জঙ্গল খুঁজিয়া তলায় পড়া আম বাহির করা সহজসাধ্য তো নহেই, তাহার উপর আবার ঘনায়মান নিবিড়-কৃষ্ণ ঝোড়ো মেঘে ও বাগানের মধ্যের জঙ্গলের গাছের আওতায় এরূপ অন্ধকারের সৃষ্টি করিয়াছে যে, কোথায় কি ভাল দেখা যায় না। তবুও খুঁজিতে খুঁজিতে নাছোড়বান্দা দুর্গা গোটা আট-দশ আম পাইল।

হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল—ওরে অপু—বৃষ্টি এল।

সঙ্গে সঙ্গে ঝড়টা যেন খানিকক্ষণ একটু নরম হইল—ভিজে মাটির সোঁদা সোঁদা গন্ধ পাওয়া গেল—একটু পরেই মোটা মোটা ফোঁটায় চড়বড় করিয়া গাছের পাতায় বৃষ্টি পড়িতে শুরু করিল।

—আয় আমরা এই গাছতলায় দাঁড়াই—এখানে বৃষ্টি পড়বে না—

দেখিতে দেখিতে চারিদিক ধোঁয়াকার করিয়া মুষলধারে বৃষ্টি নামিল—বৃষ্টির ফোঁটা পড়িবার জোরে গাছের পাতা ছিঁড়িয়া উড়িয়া পড়িতে লাগিল—ভরপুর টাটকা ভিজা মাটির গন্ধ আসিতে লাগিল। ঝড় একটু যেন নরম পড়িয়াছিল—তাহাও আবার বড় বাড়িল—দুর্গা যে গাছতলায় দাঁড়াইয়াছিল, এমনি হয়ত হঠাৎ তথায়

বৃষ্টি পড়িত না, কিন্তু পূবে হাওয়ার ঝাপ্‌টা গাছতলা ভাসাইয়া লইয়া চলিল। বাড়ী হইতে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছে—অপু ভয়ের স্বরে বলিল—ও দিদি—বড্ড যে বৃষ্টি এল!

তুই আমার কাছে আয়—দুর্গা তাহাকে কাছে আনিয়া আঁচল দিয়া ঢাকিয়া কহিল—এ বিষ্টি আর কতক্ষণ হবে—এই ধরে গেল বলে—বিষ্টি হোল ভালই হোল—আমরা আবার সোনামুখী-তলায় যাবো এখন, কেমন তো?

দুজনে চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল—

নেবুর পাতায় করম্‌চা,
হে বিষ্টি ধ'রে যা—

কড়্—কড়্—কড়াৎ···প্রকাণ্ড বন-বাগানের অন্ধকার মাথাটা যেন এদিক্‌ হইতে ওদিক্‌ পর্যন্ত চিরিয়া গেল—চোখের পলকের জন্য চারিধারে আলো হইয়া উঠিল—সামনের গাছের মগডালে থোলো থোলো বন-ধুঁধুল ফল ঝড়ে দুলিতেছে। অপু দুর্গাকে ভয়ে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—ও দিদি!

ভয়ে কি রে!···রাম রাম বল্—রাম রাম রাম—নেবুর পাতায় করম্‌চা হে বিষ্টি ধ'রে যা—নেবুর পাতায় করম্‌চা হে বিষ্টি ধ'রে যা—নেবুর পাতায় করম্‌চা—

বৃষ্টির ঝাপটায় তাহাদের কাপড় চুল ভিজিয়া টস্‌টস্‌ করিয়া জল ঝরিতে লাগিল—গুম্‌-গুম্‌-গুম্‌-ম-ম—চাপা, গম্ভীর ধ্বনি—একটা বিশাল লোহার রুল কে যেন আকাশের ধাতব মেঝেতে এদিক হইতে ওদিক টানিয়া লইয়া বেড়াইতেছে—অপু শঙ্কিত সুরে বলিল—ঐ দিদি, আবার—

—ভয় নেই, ভয় কি? আর একটু স'রে আয়—এঃ, তোর মাথাটা ভিজে যে একেবারে জুবড়ি হ'য়ে গিয়েছে—

চারিধারে শুধু মুষলধারে বৃষ্টিপতনের হুস্‌-স্‌-স্‌-স্‌ একটানা শব্দ, মাঝে মাঝে দমকা ঝড়ের সোঁ-ও-ও-ও, বোঁ-ও-ও-ও-ও, রব, ডাল-পালার ঝাপটের শব্দ—মেঘের ডাকে কানে তালা ধরিয়া যায়।

এক একবার দুর্গার মনে হইতেছিল সমস্ত বাগানখানা ঝড়ে মড়-মড় করিয়া ভাঙ্গিয়া উপুড় হইয়া তাহাদের চাপা দিল বুঝি।

অপু বলিল—দিদি, বৃষ্টি যদি আর না থামে ?

হঠাৎ ঝটিকাক্ষুব্ধ অন্ধকার আকাশের এ-প্রান্ত হইতে লক্‌লকে আলো জিহ্বা মেলিয়া বিদ্রূপের বিকট অট্টহাস্যের রোল তুলিয়া এক লহমায় ও প্রান্তের দিকে ছুটিয়া গেল।

কড়্ কড়্-কড়াৎ !

সঙ্গে সঙ্গে বাগানের মাথায় বৃষ্টির ধোঁয়ার রাশি চিরিয়া ফাড়িয়া উড়াইয়া, ভৈরবী প্রকৃতির উন্মত্ততার মাঝখানে ধরা পড়া দুই অসহায় বালকবালিকার চোখ ঝলসাইয়া তীক্ষ্ণ নীল বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল।

অপু ভয়ে চোখ বুজিল।

দুর্গা শুষ্ক গলায় উপরের দিকে চাহিয়া দেখিল—বাজ পড়িতেছে না কি !—গাছের মাথায় বন ধুঁধুলের ফল দুলিতেছে।

সেই বড় লোহার রুলটাকে আকাশের ওদিক হইতে কে যেন আবার এদিকে টানিয়া আনিতেছিল—

শীতে অপুর ঠক্ ঠক্ করিয়া দাঁতে দাঁত লাগিতেছিল—দুর্গা তাহাকে আরও কাছে টানিয়া আনিয়া শেষ আশ্রয়ের সাহসে বার বার দ্রুত আবৃত্তি করিতে লাগিল—নেবুর পাতায় করম্‌চা, হে বিষ্টি ধ'রে যা—নেবুর পাতায় করম্‌চা, হে বিষ্টি ধ'রে যা—নেবুর পাতায় করম্‌চা,···ভয়ে তাহার স্বর কাঁপিতেছিল।

সন্ধ্যা হইবার বেশী বিলম্ব নাই। ঝড়-বৃষ্টি খানিকক্ষণ থামিয়া গিয়াছে। সর্বজয়া বাহিরের দরজায় দাঁড়াইয়া আছে। পথে জমিয়া যাওয়া বৃষ্টির জলের উপর ছপ্ ছপ্ শব্দ করিতে করিতে রাজকৃষ্ণ পালিতের মেয়ে আশালতা পুকুরের ঘাটে যাইতেছিল। সর্বজয়া জিজ্ঞাসা করিল—হ্যাঁ মা, দুর্গা আর অপুকে দেখেছিস ও দিকে ?

আশালতা বলিল—না খুড়ীমা দেখিনি তো। কোথায় গিয়েচে ? তারপর হাসিয়া বলিল—কি ব্যাঙ-ডাকানি জল হয়ে গেল খুড়ীমা !

—সেই ঝড়ের আগে দু'জনে বেরিয়েচে আম কুড়োতে যাই ব'লে, আর তো ফেরেনি—এই ঝড়-বিষ্টি গেল, সন্দে হোল, ও মা কোথায় গেল তবে।

সর্বজয়া উদ্বিগ্ন মনে বাড়ীর মধ্যে ফিরিয়া আসিল। কি করিবে ভাবিতেছে এমন সময় খিড়কীর দরজা ঠেলিয়া আপাদমস্তক সিক্ত অবস্থায় দুর্গা আগে আগে একটা ঝুনা নারিকেল হাতে ও পিছনে পিছনে অপু একটা নারিকেলের বাগলো টানিয়া লইয়া বাড়ী ঢুকিল। সর্বজয়া তাড়াতাড়ি ছেলে-মেয়ের কাছে গিয়া বলিল —ওমা আমার কি হবে! ভিজে যে সব একেবারে পান্তাভাত হইচিস্! কোথায় ছিলি বিষ্টির সময়? ছেলেকে কাছে আনিয়া মাথায় হাত দিয়া বলিল—ওমা, মাথাটা যে ভিজে একেবারে জুবড়ি। পরে আহ্লাদের সহিত বলিল—নারকোল কোথা পেলি রে দুর্গা?

প্রসন্ন গুরুর পাঠশালা — নয়

গ্রামের প্রসন্ন গুরুমহাশয় বাড়ীতে একখানা মুদীর দোকান করিতেন। এবং দোকানেরই পাশে তাঁহার পাঠশালা ছিল। বেত ছাড়া পাঠশালায় শিক্ষাদানের বিশেষ উপকরণ-বাহুল্য ছিল না। তবে এই বেতের উপর অভিভাবকদের বিশ্বাস গুরুমহাশয় অপেক্ষা কিছু কম নয়। তাই তাঁহারা গুরুমহাশয়কে বলিয়া দিয়াছিলেন, ছেলেদের শুধু পা খোঁড়া এবং চোখ কানা না হয়, এইটুকু মাত্র নজর রাখিয়া তিনি যত ইচ্ছা বেত চালাইতে পারেন। গুরুমহাশয়ও তাঁহার শিক্ষাদানের উপযুক্ত ক্ষমতা ও উপকরণের অভাব একমাত্র বেতের সাহায্যে পূর্ণ করিবার চেষ্টায় এরূপ বে-পরোয়া ভাবে বেত চালাইয়া থাকেন, যে ছাত্রগণ পা খোঁড়া ও চক্ষু কানা হওয়ার দুর্ঘটনা হইতে কোনরূপে প্রাণে বাঁচিয়া যায় মাত্র।

পৌষ মাসের দিন। অপু সকালে লেপ মুড়ি দিয়া রৌদ্র উঠিবার অপেক্ষায় বিছানায় শুইয়াছিল, মা আসিয়া ডাকিল—অপু ওঠ শীগ্‌গীর্ ক'রে, আজ তুমি যে পাঠশালায় পড়তে যাবে! কেমন সব বই আনা হবে তোমার জন্যে, শেলেট্। হাঁ ওঠো, মুখ ধুয়ে নাও, উনি তোমায় সঙ্গে করে পাঠশালায় দিয়ে আসবেন।

পাঠশালার নাম শুনিয়া অপু সদ্য-নিদ্রোত্থিত চোখ দুটি তুলিয়া অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার ধারণা ছিল যে, যাহারা দুষ্টু ছেলে, মার কথা শোনে না, ভাইবোনের সঙ্গে মারামারি করে, তাহাদেরই শুধু পাঠশালায় পাঠানো হইয়া থাকে। কিন্তু সে কোনদিন ঐরূপ করে নাই, তবে সে কেন পাঠশালায় যাইবে?

খানিক পরে সর্বজয়া পুনরায় আসিয়া বলিল—ওঠ অপু, মুখ ধুয়ে নাও, তোমায় অনেক করে মুড়ি বেঁধে দেবো এখন, পাঠশালায় ব'সে ব'সে খেও এখন, ওঠো লক্ষ্মী মানিক! মায়ের কথার উত্তরে সে অবিশ্বাসের সুরে বলিল—ইঃ! পরে মায়ের দিকে চাহিয়া জিভ বাহির করিয়া চোখ বুজিয়া একপ্রকার মুখভঙ্গী করিয়া রহিল, উঠিবার কোন লক্ষণ দেখাইল না।

কিন্তু অবশেষে বাবা আসিয়া পড়াতে অপুর বেশী জারিজুরি খাটিল না, যাইতে হইল। মার প্রতি অভিমানে তাহার চোখে জল আসিতেছিল, খাবার বাঁধিয়া দিবার সময় বলিল—আমি কথ্খনো আর বাড়ী আসচিনে, দেখো!

—ষাট ষাট বাড়ী আসবিনে কি! ওকথা বলতে নেই, ছিঃ! পরে তাহার চিবুকে হাত দিয়া চুমু খাইয়া বলিল—খুব বিদ্বে হোক্, ভালো করে লেখাপড়া শিখো, তখন দেখবে তুমি কত বড় চাকরি করবে, কত টাকা হবে তোর, কোন ভয় নেই!—ওগো, তুমি গুরুমশায়কে ব'লে দিও যেন ওকে কিছু বলে না।

পাঠশালায় পৌঁছাইয়া দিয়া হরিহর বলিল—ছুটি হবার সময়ে আমি আবার এসে তোকে বাড়ী নিয়ে যাবো অপু, ব'সে ব'সে লেখো, গুরুমশায়ের কথা শুনো, দুষ্টুমি কোরো না যেন? খানিকটা পরে পিছন ফিরিয়া অপু চাহিয়া দেখিল বাবা ক্রমে পথের বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল। অকুল সমুদ্র! সে অনেকক্ষণ মুখ নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। পরে ভয়ে ভয়ে মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল গুরুমহাশয় দোকানের মাচায় বসিয়া দাঁড়িতে সৈন্ধব লবণ ওজন করিয়া কাহাকে দিতেছেন, কয়েকটি বড় বড় ছেলে আপন আপন চাটাই-এ বসিয়া নানারূপ কুস্বর করিয়া কি পড়িতেছে ও ভয়ানক দুলিতেছে। তাহার অপেক্ষা আর একটু ছোট একটি ছেলে খুঁটিতে ঠেস দিয়ে আপন মনে পাততাড়ির তালপাতা মুখে পুরিয়া চিবাইতেছে। আর একটি বড় ছেলে, তাহার গালে একটা আঁচিল, সে দোকানের মাচার নীচে চাহিয়া কি লক্ষ্য করিতেছে। তাহার সামনে দু'জন ছেলে বসিয়া

শ্লেটে একটা ঘর আঁকিয়া কি করিতেছিল, একজন চুপিচুপি বলিতেছিল, আমি এই ঢ্যারা দিলাম, অন্য ছেলেটি বলিতেছিল, এই আমার গোল্লা, সঙ্গে সঙ্গে তার শ্লেটে আঁক পড়িতেছিল ও মাঝে মাঝে আড়চোখে বিক্রয়রত গুরুমহাশয়ের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। অপু নিজের শ্লেটে বড় বড় করিয়া বানান লিখিতে লাগিল। কতক্ষণ পরে ঠিক জানা যায় না, গুরুমহাশয় হঠাৎ বলিলেন—ফ'নে শ্লেটে ওসব কি হচ্ছে রে? সম্মুখের সেই দুটি ছেলে অমনি শ্লেটখানা চাপা দিয়া ফেলিল, কিন্তু গুরুমহাশয়ের শ্যেনদৃষ্টি এড়ানো বড় শক্ত, তিনি বলিলেন, এই স'তে ফ'নের শ্লেটটা নিয়ে আয় তো। তাঁহার মুখের কথা শেষ হইতে না হইতে বড় আঁচিলওয়ালা ছেলেটা ছোঁ মারিয়া শ্লেটখানা উঠাইয়া লইয়া গিয়া দোকানের মাচার উপর হাজির করিল।

—হুঁ, এসব কি খেলা হচ্ছে শ্লেটে? স'তে ধরে নিয়ে আয় তো দু'জনকে, কান ধ'রে নিয়ে আয়।

যেভাবে বড় ছেলেটা ছোঁ মারিয়া শ্লেট লইয়া গেল, এবং যে ভাবে বিপন্নমুখে সামনের ছেলে দুটি পায়ে পায়ে গুরুমহাশয়ের কাছে যাইতেছিল, তাহাতে অপুর হঠাৎ বড় হাসি পাইল, সে ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। পরে খানিকটা হাসি চাপিয়া রাখিয়া আবার ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

গুরুমহাশয় বলিলেন, হাসে কে? হাসচো কেন খোকা, এটা কি নাট্যশালা? অ্যা? এটা কি নাট্যশালা নাকি?

নাট্যশালা কি, অপু তাহা বুঝিতে পারিল না, কিন্তু ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া গেল।

—স'তে একখানা থান ইট নিয়ে আয় তো তেঁতুলতলা থেকে, বেশ বড় দেখে?

অপু ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া উঠিল, তাহার গলা পর্যন্ত কাঠ হইয়া গেল, কিন্তু ইট আনীত হইলে সে দেখিল, ইটের ব্যবস্থা তাহার জন্য নহে, ঐ ছেলে দুটির জন্য। বয়স অল্প বলিয়াই হউক বা নতুন ভর্তি বলিয়াই হউক, গুরুমহাশয় সে-যাত্রা তাহাকে রেহাই দিলেন।

পাঠশালা বসিত বৈকালে। সবসুদ্ধ আট দশটি ছেলেমেয়ে পড়িতে আসে। সকলেই বাড়ী হইতে ছোট ছোট মাদুর আনিয়া পাতিয়া বসে, অপুর মাদুর নাই, সে বাড়ী হইতে একখানা জীর্ণ কার্পেটের আসন আনে। যে ঘরটায় পাঠশালা হয়, তার কোনো দিকে বেড়া বা দেওয়াল কিছু নাই; চারিধারে খোলা, ঘরের মধ্যে সারি দিয়া ছাত্রগণ বসে। পাঠশালা ঘরের চারিপাশে বন. পিছন দিকে গুরুমহাশয়ের পৈতৃক আমলের বাগান। অপরাহ্নের তাজা গরম রৌদ্র বাতাবীলেবু, গাব ও পেয়ারাতলী আমগাছটার ফাঁক দিয়া পাঠশালার ঘরের বাঁশের খুঁটির পায়ে আসিয়া পড়িয়াছে। নিকটে অন্য কোনোদিকে কোনো বাড়ী নাই. শুধু বন ও বাগান, একধারে একটা যাতায়াতের সরু পথ।

আট দশটি ছেলে-মেয়ের মধ্যে সকলেই বেজায় দুলিয়া ও নানারূপ সুর করিয়া পড়া মুখস্থ করে; মাঝে মাঝে গুরুমহাশয়ের গলা শোনা যায়,—এই ক্যাবলা, ওর শেলেটের দিকে চেয়ে কি দেখচিস? কান ম'লে ছিঁড়ে দেবো একেবারে! ফুটু, তোমার ক'বার নেতি ভিজুতে হবে? ফের যদি দেখি নেতি ভিজুতে উঠেচ—

গুরুমহাশয় একটা খুঁটি হেলান দিয়া একখানা তালপাতার চাটাই-এর উপর বসিয়া থাকেন। মাথার তেলে বাঁশের খুঁটির হেলান-দেওয়ার অংশটা পাকিয়া গিয়াছে। বিকাল বেলা প্রায়ই গ্রামের দীনু পালিত কি রাজু রায় তাঁহার সহিত গল্প করিতে আসেন। পড়াশুনার চেয়ে এই গল্প শোনা অপুর অনেক বেশী ভাল লাগিত। রাজু রায় মহাশয় প্রথম যৌবনে 'বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস' স্মরণ করিয়া কি ভাবে আষাঢ়ুর হাটে তামাকের দোকান খুলিয়াছিলেন সে গল্প করিতেন। অপু অবাক হইয়া শুনিত। বেশ কেমন নিজের ছোট্ট দোকানের ঝাঁপটা তুলিয়া বসিয়া বসিয়া দা দিয়া তামাক কাটা, তারপর রাত্রে নদীতে যাওয়া, ছোট্ট হাঁড়িতে মাছের-ঝোল ভাত রাঁধিয়া খাওয়া, হয়তো মাঝে মাঝে তাদের সেই মহাভারতখানা কি বাবার সেই দাশুরায়ের পাঁচালীখানা মাটির

প্রদীপের সামনে খুলিয়া বসিয়া পড়া। বাহিরে অন্ধকারে বর্ষারাতে টিপটিপ বৃষ্টি পড়িতেছে, কেহ কোথাও নাই, পিছনের ডোবায় ব্যাঙ ডাকিতেছে—কি সুন্দর! বড় হইলে সে তামাকের দোকান করিবে।

এই গল্পগুজব এক এক দিন আবার ভাব ও কল্পনার সর্বোচ্চ স্তরে উঠিত, গ্রামের ও পাড়ার রাজকৃষ্ণ সান্যাল মহাশয় যেদিন আসিতেন। যে কোন গল্প হউক, যত সামান্যই হউক না কেন, সেটি সাজাইয়া বলিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল অসাধারণ। সান্যাল মহাশয় দেশভ্রমণ-বাতিকগ্রস্থ ছিলেন। কোথায় দ্বারকা, কোথায় সাবিত্রী পাহাড়, কোথায় চন্দ্রনাথ, তাহা আবার একা দেখিয়া তাঁহার তৃপ্তি হইত না, প্রতিবারই স্ত্রী-পুত্র লইয়া যাইতেন এবং খরচপত্র করিয়া সর্বস্বান্ত হইয়া ফিরিতেন। দিব্য আরামে নিজের চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া থেলো হুঁকা টানিতেছেন, মনে হইতেছে, সান্যাল মহাশয়ের মতন নিতান্ত ঘরোয়া, সেকেলে, পাড়াগাঁয়ের প্রচুর অবসরপ্রাপ্ত গৃহস্থ বুঝি বেশী আর নাই, পৈতৃক চণ্ডীমণ্ডপে শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছেন। হঠাৎ একদিন দেখা গেল, দরজায় তালাবন্ধ, বাড়ীতে জনপ্রাণীর সাড়া নাই। ব্যাপার কি? সান্যাল মশায় সপরিবারে বিন্ধ্যাচল, না চন্দ্রনাথ ভ্রমনে গিয়াছেন। অনেকদিন আর দেখা নাই হঠাৎ একদিন দুপুর বেলা ঠুকঠুক শব্দে লোকে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, দুই গরুর গাড়ী বোঝাই হইয়া সন্যাল মশায় সপরিবারে বিদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন ও লোকজন ডাকাইয়া হাঁটু সমান উঁচু জলবিছুটি ও অর্জুন গাছের জঙ্গল কাটিতে কাটিতে বাড়ী ঢুকিতেছেন।

একটা মোটা লাঠি হাতে তিনি লম্বা পা ফেলিয়া পাঠশালায় আসিয়া উপস্থিত হইতেন—এই যে প্রসন্ন কি রকম আছো, বেশ জাল পেতে বসেচ যে! ক'টা মাছি পড়লো?

নামতা-মুখস্থ-রত অপুর মুখ অমনি অসীম আহ্লাদে উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। সান্যাল মশায় যেখানে তালপাতার চাটাই টানিয়া বসিয়াছেন, সেদিকে হাতখানেক জমি উৎসাহে আগাইয়া বসিত।

শ্লেট বই মুড়িয়া একপাশে রাখিয়া দিত, যেন আজ ছুটি হইয়া গিয়াছে, আর পড়শুনার দরকার নাই; সঙ্গে সঙ্গে তাহার ডাগর ও উৎসুক চোখদুটি গল্পের প্রত্যেক কথা যেন দুর্ভিক্ষের ক্ষুধার আগ্রহে গিলিত।

কুঠির মাঠের পথে যে জায়গাটাকে এখন নাল্‌তাকুঠির জোল বলে, ঐখানে আগে—অনেক কাল আগে—গ্রামের মতি হাজরার ভাই চন্দর্ হাজরা কি বনের গাছ কাটিতে গিয়াছিল। বর্ষাকাল—এখানে ওখানে বৃষ্টির জলের তোড়ে মাটি খসিয়া পড়িয়াছিল, হঠাৎ চন্দর হাজরা দেখিল এক জায়গায় যেন একটা পিতলের হাঁড়ির কানামত মাটির মধ্য হইতে বাহির হইয়া আছে। তখনই সে খুঁড়িয়া বাহির করিল। বাড়ী আসিয়া দেখে—এক হাঁড়ি সেকেলে আমলের টাকা। তাই পাইয়া চন্দর হাজরা দিনকতক খুব বাবুগিরি করিয়া বেড়াইল-এসব সান্যাল মহাশয়ের নিজের চোখে দেখা।

এক একদিন রেলভ্রমণের গল্প উঠিত। কোথায় সাবিত্রী পাহাড় আছে, তাহাতে উঠিতে তাঁহার স্ত্রীর কি রকম কষ্ট হইয়াছিল, নাভিগয়ায় পিণ্ড দিতে গিয়া পাণ্ডার সঙ্গে হাতাহাতি হইবার-উপক্রম। কোথাকার এক জায়গায় একটা খুব ভাল খাবার পাওয়া যায়, সান্যাল মশায় নাম বলিলেন প্যাঁড়া। নামটা শুনিয়া অপুর ভারি হাসি পাইয়াছিল—বড় হইলে সে 'প্যাঁড়া' কিনিয়া খাইবে।

আর একদিন সান্যাল মশায় একটা কোন্ জায়গার গল্প করিতেছিলেন। সে জায়গায় নাকি আগে অনেক লোকের বাস ছিল, সন্ধ্যার সময় তেঁতুলের জঙ্গলের মধ্য দিয়া তাঁহারা সেখানে যান—সান্যাল মশায় যে জিনিসটা বার বার দেখিতে যান তাহার নাম বলিতেছেন…"চিকামসজিদ"। কি জিনিস তাহা প্রথমে সে বুঝিতে পারে নাই, পরে তাহার কথাবার্তার ভাবে বুঝিয়াছিল একটা ভাঙা পুরানো বাড়ী। অন্ধকার প্রায় হইয়া আসিয়াছিল—তাঁহারা ঢুকিতেই এক ঝাঁক চামচিকা সাঁ করিয়া উড়িয়া বাহির হইয়া গেল। অপু বেশ কল্পনা করিতে পারে চারিধারে অন্ধকার তেঁতুল জঙ্গল,

কেউ কোথাও নাই, ভাঙা পুরানো দরজা, যেমন সে ঢুকিল অমনি সাঁ করিয়া চামচিকার দল পলাইয়া গেল—রাণুদের পশ্চিমদিকের চোরাকুঠুরীর মত অন্ধকারে ঘরটা।

কোন্ দেশে সান্যাল মহাশয় একজন ফকিরকে দেখিয়াছিলেন, সে এক অশথতলায় থাকিত। এক ছিলিম গাঁজা পাইলে সে খুসি হইয়া বলিত—আচ্ছা কোন্ ফল তোমরা খাইতে চাও বল। পরে ইপ্সিত ফলের নাম করিলে সে সম্মুখের যে কোন একটা গাছ দেখাইয়া বলিত—যাও, ওখানে গিয়া লইয়া আইস। লোকে গিয়া দেখিত হয়তো আমগাছে বেদানা ফলিয়া আছে, কিংবা পিয়ারা গাছে কলার কাঁদি ঝুলিয়া আছে।

রাজু রায় বলিতেন—ওসব মন্তর-তন্তরের খেলা আর কি। সে বার আমার এক মামা—

দীনু পালিত কথা চাপা দিয়া বলিতেন—মন্তরের কথা যখন ওঠালে, তখন একটা গল্প বলি শোনো। গল্প নয়, আমার স্বচক্ষে দেখা। বেলেডাঙার বুধো গাড়োয়ানকে তোমরা দেখেচ কেউ? রাজু না দেখে থাকো, রাজকৃষ্ট ভায়া তো খুব দেখচো! কাঠের দড়ি-বাঁধা এক ধরণের খড়ম পায়ে দিয়ে বুড়ো বরাবর নিতে-কামারের দোকানে লাগঙের ফাল পোড়'তে আসতো। একশ' বছর বয়সে মারা যায়, মারাও গিয়েচে আজ পঁচিশ বছরের ওপর। জোয়ান বয়সে আমরা তার সঙ্গে হাতের কব্জির জোরে পেরে উঠতাম না। একবার - অনেক কালের কথা—আমার তখন সবে হয়েচে উনিশ কুড়ি বয়েস, চাকদা' থেকে গঙ্গাচান ক'রে গরুর গাড়ী ক'রে ফিরছি। বুধো গাড়োয়ানের গাড়ী—গাড়ীতে আমি, আমার খুড়ীমা, আর অনন্ত মুখুয্যের ভাইপো রাম, যে আজকাল উঠে গিয়ে খুলনায় বাস কচ্ছে। কানসোনার মাঠের কাছে প্রায় বেলা গেল, তখন ওসব দিকে কি রকম ভয়ভীত ছিল, তা রাজকৃষ্ট ভায়া জানো নিশ্চয়। একে মাঠের রাস্তা, সঙ্গে মেয়েমানুষের দল, কিছু টাকাকড়িও আছে—বড্ড ভাবনা হোল। আজকাল যেখানে নতুন গাঁ-খানা বসেচে?—ওই বরাবর

এসে হোল কি জানো? জন-চারেক ষণ্ডামার্কোগোছের মিশ-কালো লোক এসে গাড়ীর পেছন দিকের বাঁশ দুদিক থেকে ধল্লে। এদিকে দুজন, ওদিকে দুজন। দেখে তো মশাই আমাদের মুখে আর রা-টা নেই, কোনো রকমে গাড়ীর মধ্যে ব'সে আছি, এদিকে তারাও গাড়ীর বাঁশ ধ'রে সঙ্গেই আসচে, সঙ্গেই আসচে, সঙ্গেই আসচে। বুধো গাড়োয়াল দেখি পিটু পিটু ক'রে পেছন দিকে চাইচে। ইশারা ক'রে আমাদের কথা বলতে বারণ ক'রে দিলে। বেশ, আছে! এদিকে গাড়ী একেবারে নবাবগঞ্জ থানার কাছাকাছি এসে পড়ল। বাজার দেখা যাচ্ছে, তখন সেই লোক ক'জন বল্লে—ওস্তাদ্‌জী, আমাদের ঘাট হয়েচে, আমরা বুঝতে পারিনি, ছেড়ে দাও। বুধো গাড়োয়ান বল্লে—সে হবে না ব্যাটারা। আজ সব থানায় নিয়ে গিয়ে বাঁধিয়ে দোব। অনেক কাকুতি মিনতির পর বুধো বল্লে—আচ্ছা যা, ছেড়ে দিলাম এবার, কিন্তু কক্ষনো আর এরকম করিসনি। তবে তারা বুধো গাড়োয়ানের পায়ের ধূলো নিয়ে চ'লে গেল। আমার স্বচক্ষে দেখা। মন্তরের চোটে ওই যে ওরা বাঁশ এসে ধরেচে ধ'রেই রয়েচে—আর ছাড়াবার সাধ্য নেই—চলেচে গাড়ীর সঙ্গে। একেবারে পেরেক-আঁটা-হ'য়ে গিয়েচে। তা বুঝলে বাপু? মন্তর-তন্তরের কথা—

গল্প বলিতে বলিতে বেলা যাইত। পাঠশালার চারিপাশের বনজঙ্গলে অপরাহ্নের রাঙা রৌদ্র বাঁকা ভাবে আসিয়া পড়িত। কাঁঠালগাছের, জগডুমুর-গাছের ডালে-ঝোলা গুলঞ্চলতার গায়ে টুনটুনি পাখী মুখ উঁচু করিয়া বসিত দোল খাইত। পাঠশালা ঘরে বনের গন্ধের সঙ্গে লতাপাতার চাটাই, ছেঁড়াখোঁড়া বই-দপ্তর, পাঠশালার মাটির মেঝে, ও কড়া দা-কাটা তামাকের ধোঁয়া, সবসুদ্ধ মিলিয়া এক জটিল গন্ধের সৃষ্টি করিত।

সে গ্রামের ছায়া-ভরা মাটির পথে একটি মুগ্ধ গ্রাম্য বালকের ছবি আছে। বইদপ্তর বগলে লইয়া সে তাহার দিদির পিছনে পিছনে সাজিমাটি দিয়া কাচা, সেলাই করা কাপড় পরিয়া পাঠশালা হইতে

ফিরিতেছে, তাহার ছোট্ট মাথাটির অমন রেশমের মত নরম, চিক্কণ সুখ-স্পর্শ চুলগুলি তাহার মা যত্ন করিয়া আঁচড়াইয়া দিয়াছে—তাহার ডাগর সুন্দর চোখ ছুটিতে কেমন যেন অবাক ধরণের চাহনি —যেন তাহারা এ কোন্ অদ্ভুত জগতে নতুন চোখ মেলিয়া চাহিয়া চাহিয়া দিশাহারা হইয়া উঠিয়াছে। গাছপালায় ঘেরা এইটুকুই কেবল তার পরিচিত দেশ—এখানেই মা রোজ হাতে করিয়া খাওয়ায়, চুল আঁচড়াইয়া দেয়, দিদি কাপড় পরাইয়া দেয়, এই গণ্ডীটুকু ছাড়াইলেই তাহার চারিধারে ঘিরিয়া অপরিচয়ের অকুল জলধি! তাহার শিশু মন থৈ পায় না।

ঐ যে বাগানের ওদিকে বাঁশবন—ওর পাশ কাটিয়া যে সরু পথটা ওধারে কোথায় চলিয়া গেল—তুমি বরাবর সোজা যদি ও পথটা বাহিয়া চলিয়া যাও, তবে শাঁখারীপুকুরের পাড়ের মধ্যে অজানা গুপ্তধনের দেশে পড়িবে—বড় গাছের তলায় সেখানে বৃষ্টির জলে মাটি খসিয়া পড়িয়াছে—কত মোহরভরা হাঁড়ি-কলসীর কানা বাহির হইয়া আছে, অন্ধকার বনঝোপের নীচে, কচু, ওল ও বন-কলমীর চক্‌চকে সবুজ পাতার আড়ালে চাপা— কেউ জানে না কোথায়।

একদিন পাঠশালায় এমন একটি ঘটনা হইয়াছিল, যাহা তাহার জীবনের একটি নতুন অভিজ্ঞতা!

সেদিন বৈকালে পাঠশালায় অন্য কেহ উপস্থিত না থাকায় কোন গল্পগুজব হইল না, পড়াশুনা হইতেছিল—সে গিয়া বসিয়া পড়িতেছিল শিশুবোধক—এমন সময় গুরুমহাশয় বলিলেন—শেলেট নেও, শ্রুতিলিখন লেখো—

মুখে মুখে বলিয়া গেলেও অপু বুঝিয়াছিল গুরুমহাশয় নিজের কথা বলিতেছিলেন না, মুখস্ত বলিতেছেন, সে যেমন দাশুরায়ের পাঁচালী ছড়া মুখস্থ বলে, তেমনি।

শুনিতে শুনিতে তাহার মনে হইল অনেকগুলি অমন সুন্দর কথা এক-সঙ্গে পর পর সে কখনো শোনে নাই। ও সকল কথার অর্থ সে বুঝিতে ছিল না, কিন্তু অজানা শব্দ ও ললিত পদের ধ্বনি, ঝঙ্কার-

জড়ানো এক অপরিচিত শব্দ-সঙ্গীত, অনভ্যস্ত শিশুকর্ণে অপূর্ব ঠেকিল এবং সব কথার অর্থ না বোঝার দরুণই কুহেলি-ঘেরা অস্পষ্ট শব্দ-সমষ্টির পিছন হইতে একটা অপূর্ব দেশের ছবি বার বার উঁকি মারিতেছিল।

বড় হইয়া স্কুলে পড়িবার সময় সে বাহির করিয়াছিল ছেলে-বেলাকার এই মুখস্থ শ্রুতিলিখন কোথায় আছে—

এই সেই জনস্থান মধ্যবর্তী প্রস্রবণ-গিরি। ইহার শিখরদেশ আকাশপথে সতত সমীর-সঞ্চরমান-জলধর-পটল-সংযোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত—অধিত্যকা-প্রদেশ ঘন-সন্নিবিষ্ট বন-পাদপসমূহে সমাচ্ছন্ন থাকাতে স্নিগ্ধ শীতল ও রমণীয়·····পাদদেশে প্রসন্ন-সলিলা গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া······।'

সে ঠিক বলিতে পারে না, বুঝাইতে পারে না, কিন্তু সে জানে তাহার মনে হয়, অনেক সময়ই মনে হয়—সেই যে বছর-দুই আগে কুটির মাঠে সরস্বতী পূজার দিন নীলকণ্ঠ পাখী দেখিতে গিয়াছিল সেদিন মাঠের ধার বাহিয়া একটা পথকে দূরে কোথায় যাইতে দেখিয়াছিল সে। পথটার দু'ধারে যে কত কি অচেনা পাখী, অচেনা গাছপালা, অচেনা বনঝোপ,—অনেকক্ষণ সেদিন সে পথটার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়াছিল। মাঠের ও-দিকে পথটা কোথায় যে চলিয়া গিয়াছে তাহা ভাবিয়া সে কূল পায় নাই।

তাহার বাবা বলিয়াছিল, ও সোনাডাঙা মাঠের রাস্তা, মাধবপুর দশঘরা হ'য়ে সেই ধলচিতের খেয়াঘাটে গিয়ে মিশেচে!

ধলচিতের খেয়াঘাটে নয়, সে জানিত ও পথটা আরও অনেক দূরে গিয়াছে, রামায়ণ, মহাভারতের দেশে।

সেই অশথ্‌গাছের সকলের চেয়ে উঁচু ডালটার দিকে চাহিয়া থাকিলে যাহার কথা মনে উঠে—সেই বহুদূরের দেশটা।

শ্রুতিলিখন শুনিতে শুনিতে সেই দুই-বছর আগে-দেখা পথটার কথাই তার মনে হইয়া গেল।

ঐ পথের ওধারে অনেক দূরে কোথায় সেই জনস্থান-মধ্যবর্তী

প্রস্রবণ পর্বত! বনঝোপের স্নিগ্ধ গন্ধে, না-জানার ছায়া নামিয়া আসা ঝিকিমিকি সন্ধ্যায়, সেই স্বপ্নলোকের ছবি তাহাকে অবাক করিয়া দিল। কতদূরে সে প্রস্রবণ-গিরির উন্নত শিখর, আকাশপথে সতত-সঞ্চরমাণ মেঘমালায় যাহার প্রশান্ত, নীল সৌন্দর্য সর্বদা আবৃত থাকে?

সে বড় হইলে যাইয়া দেখিবে।

কিন্তু সে বেতসীকণ্টকিত তট, বিচিত্রপুলিনা গোদাবরী, সে শ্যামল জনস্থান, নীল মেঘমালায় ঘেরা সে অপূর্ব শৈলপ্রস্থ, রামায়ণে বর্ণিত কোনো দেশে ছিল না। বাল্মীকি বা ভবভূতি তাহাদের সৃষ্টিকর্তা নহেন। কেবল অতীত দিনের কোনো পাখীডাকা গ্রাম্য সন্ধ্যায় এক মুগ্ধমতি গ্রাম্যবালকের অপরিণত শিশু-কল্পনার দেশে তাহারা ছিল বাস্তব একেবারে খাঁটি, অতি সুপরিচিত। পৃথিবী-পৃষ্ঠে যাহাদের ভৌগোলিক অস্তিত্ব কোনোকালে সম্ভব ছিল না, শুধু এক অনভিজ্ঞ শৈশব-মনেই সে কল্পজগতের প্রস্রবণ-পর্বত তাহার সতত-সঞ্চরমাণ মেঘজালে ঢাকা নীল শিখরমালার স্বপ্ন লইয়া অক্ষয় আসন পাতিয়া বসিল।

আতুরী ডাইনীর বাড়ী — দশ

কয়েক মাস কাটিয়া গিয়াছে। ভাদ্র মাস।

অপু বৈকাল বেলা বেড়াইতে যাইবার সঙ্কল্প করিতেছে, এমন সময় তাহার মা পিছনে ডাকিয়া বলিল—কোথায় বেরুচ্চিস রে অপু? চাল ভাজা আর ছোলা ভাজা ভাজচি—বেরিও না যেন। …এক্ষুনি খাবি—

অপু শুনিয়াও শুনিল না—যদিও সে চাল-ছোলা ভাজা খাইতে ভালবাসে বলিয়াই মা তাহার জন্য ভাজিতে বসিয়াছে, ইহা সে জানে—তবুও সে কি করিতে পারে? এতক্ষণ কি খেলাটাই চলিতেছে নীলুদের বাড়ীতে। সে যখন বাহির দরজায় পা দিয়াছে, মা'র ডাক আবার কানে গেল—বেরুলি বুঝি!—ও অপু, বা রে, ছাখো মজা ছেলের। গরম গরম খাবি—আমি তাড়াতাড়ি ঘাট থেকে এসে ভাজতে লাগলাম—ও অপু-উ-উ—

অপু এক ছুট দিয়া নীলুদের বাড়ী গিয়া পৌঁছিল। অনেক ছেলে জুটিয়াছিল, অপু আসিবার আগেই খেলা সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে। নীলু বলিল,—চল অপু দক্ষিণ মাঠে পাখীর ছানা দেখতে যাবি? অপু রাজি হইলে দুজনে দক্ষিণ মাঠে গেল। ধান ক্ষেতের ওপারেই নবাবগঞ্জের বাঁধা সড়কটি পূর্ব পশ্চিমে লম্বা হইয়া যেন মাঠের মাঝখান চিরিয়া চলিয়া গিয়াছে। গ্রাম হইতে এক মাইলের উপর হইবে। অপু এতদূর কখনো বেড়াইতে আসে নাই—তাহার মনে হইল যেন সমস্ত পরিচিত জিনিসের গণ্ডী ছাড়াইয়া কোথাও কত-দূরে নীলুদা তাহাকে টানিয়া আনিল। একটুখানি পরেই সে বলিল, বাড়ী চল নীলুদা, আমায় মা বকবে, সন্দে হ'য়ে যাবে, আমি একা গাবতলার পথ দিয়া যেতে পারবো না। তুমি বাড়ী চল—

ফিরিতে যাইয়া নীলু পথ হারাইয়া ফেলিল। ঘুরিয়া ফিরিয়া কাহাদের একটা বড় আমবাগানের ধার দিয়া একটা পথ মিলিল। সন্ধ্যা হইবার তখনও কিছু বিলম্ব আছে, আকাশে আবার মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছে—এমনসময় চলিতেচলিতে নীলু হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া অপুর কনুই-এ টান দিয়া সম্মুখ দিকে চাহিয়া ভয়ের সুরে বলিল—ও ভাই অপু।

অপু সঙ্গীর ভয়ের কারণ বুঝিতে না পারিয়া বলিল—কি রে নীলুদা। পরে চাহিয়া দেখিল, যে সুঁড়ি পথটা দিয়া তাহারা চলিতেছিল, তাহা কাহাদের উঠানে গিয়া শেষ হইয়াছে। একখানা ছোট চালাঘর ও একটা বিলাতী আমড়ার গাছ। তাহার কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বেই নীলু ভয়ের সুরে বলিয়া উঠিল—আতুরী ডাইনীর বাড়ী।

অপুর মুখ শুকাইয়া গেল....আতুরী ডাইনীর বাড়ী।......সন্ধ্যা-বেলা কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে তাহারা। কে না জানে যে ওই উঠানের গাছে চুরি করিয়া বিলাতী আমড়া পাড়িবার অপরাধে ডাইনীটা জেলেপাড়ার কোন এক ছেলের প্রাণ কাড়িয়া লইয়া কচুর পাতায় বাঁধিয়া জলে ডুবাইয়া রাখিয়াছিল, পরে মাছে তাহা খাইয়া ফেলিবার সঙ্গে সঙ্গে বেচারীর আমড়া খাইবার সাধ এ জন্মের মত মিটিয়া যায়? কে না জানে সে ইচ্ছা করিলে চোখেরচাহনিতে ছোট ছেলেদের রক্ত চুষিয়া খাইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারে, যাহার রক্ত খাওয়া হইল, সে কিছুই জানিতে পারিবে না, কিন্তু বাড়ী গিয়া খাইয়া দাইয়া সেই যে বিছানায় শুইবে আর পরদিন উঠিবে না। কতদিন শীতের রাত্রে লেপের তলায় শুইয়া দিদির মুখে আতুরী ডাইনীর গল্প শুনিতে শুনিতে সে বলিয়াছে—রাত্রিতে তুই ওসব গল্প বলিস্‌নে দিদি, আমার ভয় করে,—তুই সেই কুঁচবরণ রাজকন্যার গল্পটা বল্ দিকি?

ঝাপসা দৃষ্টিতে সে সম্মুখে চাহিয়া দেখিতে গেল বাড়ীতে কেহ আছে কিনা এবং চাহিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সমস্ত শরীর যেন

জমিয়া হিম হইয়া গেল ...বেড়ায় বাঁশের আগড়ের কাছে—অন্য কেহ নয়, একেবারে স্বয়ং আতুরী ডাইনীই—তাদের—এমন কি যেন তাহারই দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া।...

যাহার জন্য এত ভয়, তাহাকে একেবারে সম্মুখে এভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া অপুর সামনে পিছনে কোনো দিকেই পা উঠিতে চাহিল না।

আতুরী বুড়ী ভুরু কুঁচ্‌কাইয়া, তোব্‌ড়ানো গালটা আরও ঝুলাইয়া ভাল করিয়া লক্ষ্য করিবার ভঙ্গীতে মুখটা সামনের দিকে একটু বাড়াইয়া দিয়া পায়ে পায়ে তাহাদের দিকে আগাইয়া আসিতে লাগিল। অপু দেখিল সে ধরা পড়িয়াছে, কোনো দিকেই আর পালাইবার পথ নাই—যে কারণেই হউক ডাইনীর রাগটা তাহার উপরেই—এখনই তাহার প্রাণটি সংগ্রহ করিয়া কচুর পাতায় পুরিবে।

মুখের খাবার ফেলিয়া, মায়ের ডাকের উপর ডাক উপেক্ষা করিয়া সে যে আজ মায়ের মনে কষ্ট দিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে তাহার ফল এই ফলিতে চলিল! সে অসহায়ভাবে চারিদিকে চাহিয়া বলিল—আমি কিছু জানিনে—ও বুড়ী পিসি—আমি আর কিছু করবো না—আমায় ছেড়ে দাও, আমি এদিকে আর কখনো আসবো না—আজ ছেড়ে দাও ও বুড়ী পিসি—

নীলু তো ভয়ে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল। কিন্তু অপুর এত ভয় হইয়াছিল যে চোখে তাহার জল ছিল না।

বুড়ী বলিল -ভয় কি মোরে, ও বাবারা? মোরে ভয় কি? ...পরে খুব ঠাট্টা করা হইতেছে ভাবিয়া হাসিয়া হাসিয়া বলিল, মুই কি ধ'রে নেবো খোকারা? এস মোর বাড়িতে এস—আমচুর দেবানি এস—

আমচুর! ডাইনী বুড়ী ফাঁকি দিয়া ভুলাইয়া বাড়ীতে পুরিতে চাহিতেছে—গেলেই আর কি!...ডাইনীরা রাক্ষসীরা যে এ-রকম ভুলাইয়া ফাঁদে ফেলে এ-রকম কত গল্প তো সে মার মুখে শুনিয়াছে।

এখন সে কি করে। উপায়?

বুড়ী তাহার দিকে আরও খানিক আগাইয়া আসিতে আসিতে বলিল—ভয় কি, ও মোর বাবারা? মুই কিছু বলবো না, ভয় কি মোরে?

আর কি, সব শেষ। মায়ের কথা না শুনিবার ফল ফলিবার আর দেরী নাই, হাত বাড়াইয়া তাহার প্রাণটা সংগ্রহ করিয়া এখনি কচুর পাতায় পু—রি—ল। প্রতি মুহূর্তেই তাহার আশঙ্কা হইতেছিল যে এখনি বুড়ী হাসিমুখ বদলাইয়া ফেলিয়া বিকট মূর্তি ধরিয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিবে—রাক্ষসী রাণীর গল্পের মত। বনের অজগর সাপের দৃষ্টির কুহকে পড়িয়া হরিণশিশু নাকি অন্য দিকে চোখ ফিরাইতে পারে না, তাহারও চোখদুটির কুহক-মুগ্ধ দৃষ্টি সেরূপ বুড়ীর মুখের উপর দৃঢ়নিবদ্ধ ছিল—সে আড়ষ্ট কণ্ঠে দিশাহারা ভাবে বলিয়া উঠিল, ও বুড়ি পিসি, আমার মা কাঁদবে, আমায় আজ আর কিছু বোলো না—আমি তোমার কাছে কোনো দিন আমড়া নিতে আসি নি—আমার মা কাঁদবে—

আতঙ্কে সে নীলবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে···বাড়ী, ঘর-দোর, গাছপালা, নীলু, চারিধার যেন ধোঁয়া ধোঁয়া। কেহ কোনোদিকে নাই··· কেবল একমাত্র সে আর আতুরী ডাইনীর ক্রূর দৃষ্টি মাখানো একজোড়া চোখ···আর আর অনেকদূরে কোথায় যেন মা আর তাহার চাল ভাজা খাওয়ার ডাক।

পরক্ষণেই কিন্তু অত্যধিক ভয়ে তাহার একরূপ মরীয়া সাহস যোগাইল, একটা অস্পষ্ট আর্তরব করিয়া প্রাণভয়ে দিশাহারা অবস্থায় সে সম্মুখের ভাঁট, শেওড়া, রাংচিতার জঙ্গল ভাঙিয়া ডিঙাইয়া সন্ধ্যার আসন্ন অন্ধকারে যেদিকে দুই চোখ যায় ছুটিল—নীলুও ছুটিল তাহার পিছনে।

ইহাদের ভয়ের কারণ কি বুঝিতে না পারিয়া বুড়ী ভাবিল—মুই মাত্তিও যাইনি, ধত্তিও যাইনি—কাঁচা ছেলে, কি জানি মোরে দেখে কেন ভয় পালে সন্দেবেলা? খোকারা কাদের?

ঘরের বাহিরে এগার

এবার বাড়ী হইতে যাইবার সময় হরিহর ছেলেকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিল। বলিল—বাড়ী থেকে কিছু খেতে পায় না, তবুও' বাইরে বেরুলে দুধটা, ঘিটা—ওর শরীরটা সারবে এখন।

অপু জন্মিয়া অবধি কোথাও কখনো যায় নাই। এ গাঁয়েরই বকুলতলা, গোঁসাই বাগান, চাল্‌তেতলা নদীর ধার—বড়জোর নবাবগঞ্জ যাইবার পাকা সড়ক—এই পর্যন্ত তাহার দৌড়। মাঝে মাঝে বৈশাখ কি জ্যৈষ্ঠ মাসে খুব গরম পড়িলে তাহার মা বৈকালে নদীর ঘাটে দাঁড়াইয়া থাকিত, নদীর ওপারের খড়ের মাঠে বাবলা গাছে হলুদ রংএর ফুল ফুটিয়া থাকিত, গরু চরিত, মোটা গুলঞ্চলতা-দুলানো শিমূল গাছটাকে দেখিলে মনে হইত যেন কত কালের পুরাতন গাছটা। রাখালেরা নদীর ধারে গরুকে জল খাওয়াইতে আসিত, ছোট্ট একখানা জেলে-ডিঙ্গি বাহিয়া তাহাদের গাঁয়ের অক্রুর মাঝি মাছ ধরিবার দোয়াড়ি পাতিতে যাইত, মাঠের মাঝে ঝাড় ঝাড় সোঁদলি ফুল বৈকালের ঝিরঝিরে বাতাসে দুলিতে থাকিত —ঠিক সেই সময় হঠাৎ এক একদিন ওপারের সবুজ খড়ের জমির শেষে নীল আকাশটা যেখানে আসিয়া দূর গ্রামের সবুজ বনরেখার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, সেদিকে চাহিয়া দেখিতেই তাহার মনটা যেন কেমন হইয়া যাইত—সে সব প্রকাশ করিয়া বুঝাইয়া বলিতে জানিত না। শুধু তাহার দিদি ঘাট হইতে উঠিলে সে বলিত —দিদি দিদি, দ্যাখ্‌ দ্যাখ্‌ ঐ দিকে—পরে সে মাঠের শেষের দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিত—ঐ যে? ঐ গাছটার পিছনে? কেমন অনেক দূর, না?

দুর্গা হাসিয়া বলিত—অনেক দূর—তাই দেখাচ্ছিলি ? দূর, তুই একটা পাগল !

আজ সেই অপু সর্বপ্রথম গ্রামের বাহিরে পা দিল। কয়েকদিন পূর্ব হইতেই উৎসাহে তাহার রাত্রিতে ঘুম হওয়া দায় হইয়া পড়িয়াছিল, দিন গুণিতে গুণিতে অবশেষে যাইবার দিন আসিয়া গেল।

তাহাদের গ্রামের পথটি বাঁকিয়া নবাবগঞ্জের সড়ককে ডাইনে ফেলিয়া মাঠের বাহিরে আষাঢ়ু-দুর্গাপুরের কাঁচা রাস্তার সঙ্গে মিশিয়াছে। দুর্গাপুরের রাস্তায় উঠিয়াই সে বাবাকে বলিল—বাবা, যেখান দিয়ে রেল যায় সেই রেলের রাস্তা কোন্ দিকে ?

তাহার বাবা বলিল—সাম্‌নেই পড়বে এখন, চলো না। আমরা রেল লাইন পেরিয়ে যাব এখন—

সে-বার তাহাদের রাঙী গায়ের বাছুর হারাইয়াছিল। নানা জায়গা খুঁজিয়াও দুই তিন দিন ধরিয়া কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। সে তার দিদির সঙ্গে দক্ষিণ মাঠে বাছুর খুঁজিতে আসিয়াছিল। পৌষ মাস, ক্ষেতে ক্ষেতে কলাই গাছের ফলের দানা বাঁধিয়াছে, সে ও তাহার দিদি নীচু হইয়া ক্ষেত হইতে মাঝে মাঝে কলাইফল তুলিয়া খাইতেছিল—তাহাদের সামনে কিছুদূরে নবাবগঞ্জের পাকা রাস্তা, খেজুর গুড় বোঝাই গরুর গাড়ীর সারি পথ বাহিয়া ক্যাঁচ ক্যাঁচ করিতে করিতে আষাঢ়ুর হাটে যাইতেছিল।

তাহার দিদি পাকা রাস্তার ওপারে বহুদূর ঝাপ্‌সা মাঠের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া কি দেখিতেছিল, হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল,—এক কাজ কর্‌বি অপু, চল্ যাই আমরা রেলের রাস্তা দেখে আসি, যাবি ? অপু বিস্ময়ের সুরে দিদির মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—রেলের রাস্তা সে যে অনেকদূর ? সেখানে কি ক'রে যাবি ?

তাহার দিদি বলিল—বেশী দূর বুঝি ! কে বলেছে তোকে—ঐ পাকা রাস্তার ওপারে তো—না ?

অপু বলিল—নিকটে হ'লে তো দেখা যাবে ? পাকা রাস্তা থেকে দেখা যায়—চল্ দিকি দিদি, গিয়ে দেখি।

দুইজনে অনেকক্ষণ নবাবগঞ্জের সড়কে উঠিয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখিল। তাহার দিদি বলিল—বড্ড অনেক দূর না? যাওয়া যাবে না—

—কিছু তো দেখা যায় না—অত দূরে গেলে আবার আসব কি করে—তাহার সতৃষ্ণ দৃষ্টি কিন্তু দূরের দিকে আবদ্ধ ছিল, লোভও হইতেছিল, ভয়ও হইতেছিল। হঠাৎ তাহার দিদি মরিয়া ভাবে বলিয়া উঠিল—চল্ যাই দেখে আসি অপু—কতদূর আর হবে? দুপুরের আগে ফিরে আসবো এখন, হয়তো রেলের গাড়ী যাবে এখন —মাকে বল্‌বো বাছুর খুঁজতে দেরী হয়ে গেল—

প্রথমে তাহারা একটুখানি এ-দিক ও-দিক চাহিয়া দেখিল কেহ তাহাদিগকে লক্ষ্য করিতেছে কিনা। পরে পাকা রাস্তা হইতে নামিয়া পড়িয়া দুপুর রোদে ভাই-বোনে মাঠ বিল জলা ভাঙিয়া সোজা দক্ষিণ মুখে ছুটিল। দৌড়, দৌড়, দৌড়—নবাবগঞ্জের লাল রাস্তা ক্রমে অনেক দূর পিছাইয়া পড়িল—বোয়ার মাঠ, জলসত্র তলা, ঠাকুর-ঝি পুকুর বামধারে, ডানধারে দূরে দূরে পড়িয়া রহিল—সামনে একটা ছোট বিল নজরে আসিতে লাগিল। তাহার দিদি হাসিয়া তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—মা টের পেলে কিন্তু—পিঠের ছাল তুলবে। অপু একবার হাসিল—মরীয়ার হাসি। দৌড়, দৌড়, দৌড়—জীবনে এই প্রথম বাধাহীন গণ্ডিহীন, মুক্তির উল্লাসে তাহাদের তাজা তরুণ রক্ত তখন মাতিয়া উঠিয়াছিল পরে কি হইবে, তাহা ভাবিবার অবসর কোথায়?

পরে যাহা হইল, তাহা সুবিধাজনক নয়। খানিক দূরে গিয়া একটা বড় জলা পড়িল একেবারে সামনে—হোগলা আর শোলা গাছে ভরা, তাহার উপর তাহার দিদি পথ হারাইয়া ফেলিল—কোনো গ্রামও চোখে পড়ে না—সামনে কেবল ধান ক্ষেত, জলা, আর বেত-ঝোপ। ঘন বেতবনের ভিতর দিয়া যাওয়া যায় না, পাঁকে জলে পা পুঁতিয়া যায়, রৌদ্র এমন বাড়িয়া উঠিল যে, শীতকালেও তাহাদের গা দিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল—দিদির পরণের

কাপড় কাঁটায় নানা স্থানে ছিঁড়িয়া গেল, তাহার নিজের পায়ে দু'তিন বার কাঁটা টানিয়া টানিয়া বাহির করিতে হইল—শেষে রেলরাস্তা দূরের কথা, বাড়ী ফেরাই মুস্কিল হইয়া উঠিল। অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছে, পাকা রাস্তাও আর দেখা যায় না, জল ভাঙিয়া ধানক্ষেত পার হইয়া যখন তাহারা বহু কষ্টে আবার পাকা রাস্তায় আসিয়া উঠিল তখন দুপুর ঘুরিয়া গিয়াছে। বাড়ী আসিয়া তাহার দিদি ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা কথা বলিয়া তবে নিজের ও তাহার পিঠ বাঁচাইল।

সেই রেলের রাস্তা আজ এমনি সহজ ভাবেই সামনে পড়িবে—সেজন্য ছুটিতে হইবে না, পথ হারাইতে হইবে না—বকুনি খাইতে হইবে না।

কিছু দূর গিয়া সে বিস্ময়ের সহিত চাহিয়া দেখিল নবাবগঞ্জের পাকা সড়কের মত উঁচু রাস্তা মাঠের মাঝখান চিরিয়া ডাইনে বাঁয়ে বহুদূর গিয়াছে। রাঙা রাঙা খোয়ার রাশি উঁচু হইয়া ধারের দিকে সারি দেওয়া। সাদা সাদা লোহার খুঁটির উপর যেন একসঙ্গে অনেক দড়ির টানা বাঁধা—যতদূর দেখা যায় ঐ সাদা খুঁটি ও দড়ির-টানা-বাঁধা দেখা যাইতেছে।

তাহার বাবা বলিল—ঐ ছাখো খোকা, রেলের রাস্তা—

অপু একদৌড়ে ফটক পার হইয়া রাস্তার উপর আসিয়া উঠিল। পরে সে রেলপথের দুইদিকে বিস্ময়ের চোখে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। দুইটা লোহা বরাবর পাতা কেন? উহার উপর দিয়া রেলগাড়ী যায়? কেন? মাটির উপর দিয়া না গিয়া লোহার উপর দিয়া যায় কেন? পিছলাইয়া পড়িয়া যায় না? কেন? ওগুলাকে তার বলে! তাহার মধ্যে সোঁ সোঁ কিসের শব্দ? তারে খবর যাইতেছে? কাহারা খবর দিতেছে? কি করিয়া খবর দিতেছে? কি করিয়া খবর দেয়? ওদিকে কি ইষ্টিশান? এদিকে কি ইষ্টিশান?

সে বলিল—বাবা রেলগাড়ী কখন আসবে? আমি রেলগাড়ী দেখবো বাবা।

—রেলগাড়ী এখন কি ক'রে দেখবে?……সেই ত্বপুরের সময় রেলগাড়ী আসবে, এখনও ত্ব'ঘণ্টা দেরি।

—তা হোক্ বাবা, আমি দেখে যাবো, আমি কখ্খনো দেখিনি —হ্যাঁ বাবা—

—ও রকম কোরো না, ঐ জন্য তোমায় কোথাও আনতে চাইনে —এখন কি ক'রে দেখবে? সেই ত্বপুর একটা অবধি ব'সে থাকতে হবে তা হোলে এই ঠায় রোদ্দুরে, চল্ আস্‌বার দিন দেখাবো।

অপুকে অবশেষে জল ভরা চোখে বাবার পিছনে পিছনে অগ্রসর হইতে হইল।

তুমি চলিয়া যাইতেছ…তুমি কিছুই জানো না, পথের ধারে তোমার চোখে কি পড়তে পারে, তোমার ডাগর নবীন চোখ বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধায় চারিদিকে গিলিতে গিলিতে চলিয়াছে—নিজের আনন্দের এ হিসাবে তুমিও একজন দেশ-আবিষ্কারক। অচেনার আনন্দকে পাইতে হইলে পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে, তাহার মানে নাই। আমি যেখানে আর কখনো যাই নাই, আজ নতুন পা দিলাম, যে নদীর জলে নতুন স্নান করিলাম, যে গ্রামের হাওয়ায় শরীর জুড়াইলাম, আমার আগে সেখানে কেহ আসিয়াছিল কিনা, তাহাতে আমার কি আসে যায়? আমার অনুভূতিতে তাহা যে অনাবিষ্কৃত দেশ। আমি আজ সর্বপ্রথম মন, বুদ্ধি, হৃদয় দিয়া উহার নবীনতাকে আস্বাদ করিলাম যে।

আমডোব। ছোট্ট চাষাদের গাঁ-খানা—কেমন নামটি! মেয়েরা উঠানে বিচালি কাটিতেছে, ছাগল বাঁধিতেছে, মুরগীকে ভাত খাওয়াইতেছে, বড় লোকেরা পাট শুকাইতেছে, বাঁশ কাটিতেছে—দেখিতে দেখিতে গাঁ পিছনে ছাড়িয়া একেবারে বাহিরের মাঠ…বিলে জল থৈ থৈ করিতেছে…উড়ি ধানের ক্ষেত্রে বক বসিয়া আছে…নাল ফুলের পাতা ও ফুটন্ত ফুলে জল দেখা যায় না।

খল্‌সেমারির বিলের প্রান্তে ঘন সবুজ আউশ ধানের ক্ষেতের উপরকার বৃষ্টি-ধৌত, ভাদ্রের আকাশের সুনীল প্রসার। সারা

চক্রবাল জুড়িয়া সূর্যাস্তের অপরূপ বর্ণচ্ছটা, বিচিত্র রং-এর মেঘের পাহাড়, মেঘের দ্বীপ, মেঘের সমুদ্র, মেঘের স্বপ্নপুরী—খোলা আকাশের সহিত এ পরিচয় তাহার এতদিন হয় নাই, মাঠের পারের দূরের দেশটা এবার তাহার রহস্য-অবগুণ্ঠন খুলিয়া আট বছরের ছেলেটির কাছে।

যাইতে যাইতে বড় দেরী হইল। তাহার বাবা বলিল—বড্ড হাঁ-করা ছেলে, যা দেখে তাতেই হাঁ ক'রে থাকো কেন অমন? জোরে হাঁটো।

সন্ধ্যার পর তাহারা গন্তব্যস্থানে পৌঁছিল। শিষ্যের নাম লক্ষ্মণ মহাজন, বেশ বড় চাষী ও অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। বাহিরের বড় আটচালা ঘরে মহা আদরে তাহারা থাকিবার স্থান করিয়া দিল।

লক্ষ্মণ মহাজনের ছোট ভাইয়ের স্ত্রী সকালে স্নান করিবার জন্য পুকুরের ঘাটে আসিয়াছিল—জলে নামিতে গিয়া পুকুরের পাড়ে নজর পড়াতে সে দেখিল পুকুর পাড়ের কলাবাগানে একটি অচেনা ছোট ছেলে একখানি কঞ্চি হাতে কলাবাগানের একবার এদিক একবার ওদিক পায়চারি করিতেছে ও পাগলের মত আপন মনে বকিতেছে। সে ঘাড় নামাইয়া কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কাদের বাড়ী এসেছ, খোকা?

অপুর যত জারিজুরি তাহার মায়ের কাছে। বাহিরে সে বেজায় মুখচোরা।

প্রথমটা অপুর মাথায় আসিল যে টানিয়া এক দৌড় দেয়। পরে সঙ্কুচিত সুরে বলিল—ওই ওদের বাড়ী—

বধূটি বলিল—বট্‌ঠাকুরদের বাড়ী? বট্‌ঠাকুরের গুরুমশায়ের ছেলে? ও!

বধূ সঙ্গে করিয়া তাহাকে নিজের বাড়ীতে লইয়া গেল। তাহাদের বাড়ী পৃথক—লক্ষ্মণ মহাজনের বাড়ী হইতে সামান্য দূরে, কিন্তু মধ্যে পুকুরটা পড়ে।

বধূর ব্যবহারে অপুর লাজুকতা কাটিয়া গেল। সে ঘরের মধ্যে

ঢুকিয়া ঘরের জিনিসপত্র কৌতূহলের সহিত চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। ওঃ, কত জিনিস!...তাহাদের বাড়ীতে এ সব জিনিস নাই। এরা খুব বড়লোক তো! কড়ির আলনা, রং-বেরং এর ঝুলন্ত শিকা, পশমের পাখী, কাঁচের পুতুল, মাটির পুতুল, শোলার গাছ—আরও কত কি!—ছু একটা জিনিস সে ভয়ে ভয়ে হাতে তুলিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল।

বধূ এতক্ষণ ভাল করিয়া ছেলেটির মুখের দিকে চাহিয়া দেখে নাই—কাছের গোড়ায় দেখিয়া মনে হইল যে এখনও ভারি ছেলেমানুষ, মুখের ভাব যেন পাঁচ বছরের ছেলের মত কচি। এমন সুন্দর সুবোধ চোখের ভাব সে আর কোন ছেলের চোখে এ পর্যন্ত দেখে নাই—এমন রং, এমন গড়ন, এমন সুন্দর মুখ, এমন তুলি দিয়া আঁকা ডাগর নিষ্পাপ চোখ...অচেনা ছেলেটির উপর বধূর বড় মমতা হইল।

অপু বসিয়া নানা গল্প করিল—বিশেষ করিয়া কল্যকার রেলপথের কথাটি। খানিকটা পরে বধূ মোহনভোগ তৈয়ারী করিয়া খাইতে দিল। একটা বাটিতে অনেক খানি মোহনভোগ, এত ঘি দেওয়া যে আঙুলে ঘিয়ে মাখামাখি হইয়া যায়। অপু একটুখানি মুখে তুলিয়া খাইয়া অবাক্ হইয়া গেল—এমন অপূর্ব জিনিস আর সে কখনো খায় নাই তো!—মোহনভোগে কিস্‌মিস্ দেওয়া কেন? কৈ তাহার মায়ের তৈরী মোহনভোগে তো কিস্‌মিস্ থাকে না? বাড়ীতে সে মা'র কাছে আবদার ধরে—মা, আজ আমাকে মোহনভোগ ক'রে দিতে হবে? তাহার মা হাসিমুখে বলে—আচ্ছা ওবেলা তোকে ক'রে দেবো—পরে সে শুধু সুজি জলে সিদ্ধ করিয়া একটু গুড় মিশাইয়া পুলটিসের মত একটা দ্রব্য তৈয়ারী করিয়া কাঁসার সরপুরিয়া থালাতে আদর করিয়া ছেলেকে খাইতে দেয়। অপু তাহাই খুশির সহিত এতদিন খাইয়া আসিয়াছে, মোহনভোগ যে এরূপ হয় তাহা সে জানিত না। আজ কিন্তু তাহার মনে হইল এ মোহনভোগে আর মায়ের তৈয়ারী মোহনভোগে আকাশ-পাতাল

জন্যে !...সঙ্গে সঙ্গে মায়ের উপর করুণায় ও সহানুভূতিতে তাহার মন ভরিয়া উঠিল। হয়তো তাঁহার মাও জানে না যে, এ রকমের মোহনভোগ হয়!—সে যেন আবছায়া ভাবে বুঝিল, তাহার মা গরীব, তাহারা গরীব—তাই তাহাদের বাড়ী ভাল খাওয়া দাওয়া হয় না।

সন্ধ্যার পর বধূর ঘরে অপুর নিমন্ত্রণ ছিল। খাইতে বসিয়া খাবার জিনিসপত্র ও আয়োজনের ঘটা দেখিয়া সে অবাক্ হইয়া গেল। ছোট একখানা ফুলকাটা রেকাবীতে আলাদা করিয়া নুন ও নেবু কেন? নুন নেবু তো মা পাতেই দেয়। প্রত্যেক তরকারির জন্যে আবার আলাদা আলাদা বাটি!—তরকারিই বা কত! অত বড় গলদা চিংড়ির মাথাটা কি তাহার একার জন্য?

লুচি! লুচি! তাহার ও তাহার দিদির স্বপ্নকামনার পারে এক রূপকথার দেশের নীল-বেলা আবছায়া দেখা যায়...কত রাতে, দিনে, ওলের ডাঁটা-চচ্চড়ী ও লাউছেঁচকি দিয়া ভাত খাইতে খাইতে, কত জল-খাবার-খাওয়া-শূন্য সকালে বিকালে, অন্যমনস্ক মন হঠাৎ লুব্ধ, উদাস গতিতে ছুটিয়া চলে সেখানে—যেখানে গরম রোদে দুপুর বেলা তাহাদের পাড়ার পাকা রাঁধুনি বীরু রায় গামছা কাঁধে ঘুরিয়া বেড়ায়, সদ্য-তৈয়ারী বড় উনুনের বড় লোহার কড়াই-এ ঘি চাপানো থাকে, লুচি-ভাজার অপূর্ব সুধারুচি-ঘ্রাণ আসে, কত ছেলেমেয়ে ভাল জামা-কাপড় পরিয়া যাতায়াত করে, গাঙ্গুলি বাড়ীর বড় মাটমন্দির ও জলপাই-তলা বিছাইয়া গ্রীষ্মের দিনে সতরঞ্চ পাতা হয়, একদিন মাত্র বছরে সে দেশের ঠিকানা খুঁজিয়া মেলে—সেই চৈত্র বৈশাখ মাসের রামনবমী দোলের দিনটি—তাহাদের সেদিন নিমন্ত্রণ থাকে ওপাড়ার গাঙ্গুলি বাড়ী। কিন্তু আজ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে সে সুদিনের উদয় হইল কি করিয়া! খাইতে বসিয়া বার বার তাহার মনে হইতেছিল, আহা, তাহার দিদি এ রকম খাইতে পায় নাই কখনো!

বাড়ী আসিয়া অপু দিন পনরো ধরিয়া নিজের অদ্ভুত ভ্রমণ-কাহিনী বলিয়া বেড়াইতে লাগিল। কত আশ্চর্য জিনিস যে দেখিয়াছে

এই কয়দিনে! রেলের রাস্তা, যেখানে দিয়া সত্যিকারের রেলগাড়ী যায়। মাটির আতা, পেঁপে, শসা—অবিকল যেন সত্যিকার ফল! সেই পুতুলটা, যেটার পেট টিপিলে মৃগীরোগীর মত হাত-পা ছুঁড়িয়া হঠাৎ খঞ্জনী বাজাইতে শুরু করে। আমলাদি? কতদূরে যে সে গিয়াছিল, পদ্মফুলে ভরা বিল, কত অচেনা নতুন গাঁ পার হইয়া কত মাঠের উপরকার নির্জ্জন পথ বাহিয়া, সেই যে কোন্ গাঁয়ে পথের ধারের কামার-দোকানে বাবা তাহাকে জল খাওয়াইতে লইয়া গেলে, তাহারা তাহাকে বাড়ীর মধ্যে ডাকিয়া লইয়া গিয়া যত্ন করিয়া পিঁড়ি পাতিয়া বসাইয়া দুধ-চিড়া-বাতাসা খাইতে দিয়াছিল। কোন্‌টা ফেলিয়া সে কোন্‌টার গল্প করে।

রেলরাস্তার গল্প শুনিয়া তাহার দিদি মুগ্ধ হইয়া যায়, বার বার জিজ্ঞাসা করে—কত বড় নোয়াগুলো দেখ্‌লি অপু? তার টাঙানো বুঝি? খুব লম্বা? রেলগাড়ী দেখতে পেলি? গেল?

না—রেলগাড়ী অপু দেখে নাই। এটাই কেবল বাদ পড়িয়াছে—সে শুধু বাবার দোষে। মোটে ঘণ্টা-চার-পাঁচ রেলরাস্তার ধারে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলেই রেলগাড়ী দেখা যাইত—কিন্তু বাবাকে সে কিছুতেই বুঝাইয়া উঠিতে পারে নাই।

বেলা হইয়া যাওয়াতে ব্যস্ত অবস্থায় সর্বজয়া তাড়াতাড়ি অন্যমনস্কভাবে সদর দরজা দিয়া ঢুকিয়া উঠানে পা দিতেই কি যেন একটা সরু দড়ির মত বুকে আটকাইল ও সঙ্গে সঙ্গে কি যেন একটা পটাং করিয়া ছিঁড়িয়া যাইবার শব্দ হইল এবং দুদিক হইতে দুটা কি উঠানে ঢিলা হইয়া পড়িয়া গেল। সমস্ত কার্যটি চক্ষের নিমেষে হইয়া গেল, কিছু ভাল করিয়া দেখিবার কি বুঝিবার পূর্বেই।

অল্পখানিক পরে অপু বাড়ী আসিল। দরজা পার হইয়া উঠানে পা দিতেই সে থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া গেল—নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না—এ কি। বা রে আমার টেলিগিরাপের তার ছিঁড়লে কে?

ক্ষতির আকস্মিকতার ও বিপুলতায় প্রথমটা সে কিছু ঠাহর

করিতে পারিল না। পরে একটু সামলাইয়া লইয়া চাহিয়া দেখিল উঠানের মাটিতে ভিজা পায়ের দাগ এখনও মিলায় নাই। তাহার মনের ভিতর হইতে কে ডাকিয়া বলিল—মা ছাড়া আর কেউ নয়। কক্‌খনো আর কেউ নয়, ঠিক মা। বাড়ী ঢুকিয়া সে দেখিল মা বসিয়া বসিয়া বেশ নিশ্চিন্ত-মনে কাঁঠাল বীচি ধুইতেছে। সে হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িল এবং যাত্রা দলের অভিমন্যুর মত ভঙ্গিতে সামনের দিকে ঝুঁকিয়া বাঁশীর সপ্তমের মত রিন্‌রিনে তীব্র মিষ্টি সুরে কহিল—আচ্ছা মা, আমি কষ্ট করে ছোটাগুলো বুঝি বন-বাগান ঘেঁটে নিয়ে আসিনি?

সর্বজয়া পিছনে চাহিয়া বিস্মিতভাবে বলিল—কি নিয়ে এসেছিস? কি হয়েছে?

—আমার বুঝি কষ্ট হয় না? কাঁটায় আমার হাত পা ছ'ড়ে যায়নি বুঝি?

—কি বলে পাগলের মত? হয়েচে কি?

—কি হয়েচে! আমি এত কষ্ট ক'রে টেলিগিরাপের তার টাঙালাম আর ছিঁড়ে দেওয়া হয়েচে, না?

—তুমি যত উদ্‌ঘুটি কাণ্ড ছাড়া তো এক দণ্ড থাকো না বাপু। পথের মাঝখানে কি টাঙানো রয়েছে—কি জানি টেলিগিরাপ কি কি গিরাপ, আসচি তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে গেল—তখন কি করবো বলো—

পরে সে পুনরায় নিজ কাজে মন দিল।

উঃ। কি ভীষণ হৃদয়হীনতা! আগে আগে সে ভাবিত বটে যে, তাহার মা তাহাকে ভালবাসে—অবশ্যি যদিও তাহার সে ভ্রান্ত ধারণা অনেকদিন ঘুচিয়া গিয়াছে—তবুও মাকে এতটা নিষ্ঠুর পাষাণী-রূপে কখনো স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই। কাল সারাদিন কোথায় নীলমণি জ্যেঠার ভিটা, কোথায় পালিতদের বড় আমবাগান, কোথায় প্রসন্ন গুরুমহাশয়ের বাঁশবন—ভয়ানক ভয়ানক জঙ্গলে একা ঘুরিয়া বহু কষ্টে উঁচু ডাল হইতে দোলানো শুলঞ্চলতা কত কষ্টে জোগাড়

করিয়া সে আনিল, এক্ষুনি রেল-রেল খেলা হইবে সব ঠিকঠাক, আর কি না···

হঠাৎ সে মাকে একটা খুব কড়া, খুব রূঢ়, খুব একটা প্রাণ-বিঁধানো কথা বলিতে চাহিল—এবং খানিকটা দাঁড়াইয়া বোধ হয় অন্য কিছু ভাবিয়া না পাইয়া আগের চেয়েও তীব্র নিখাদে বলিল—আমি আজ ভাত খাবো না যাও—কক্‌খনো যাবো না—

তাহার মা বলিল—না খাবি না খাবি যা—ভাত খেয়ে একেবারে রাজা ক'রে দেবেন কিনা? এদিকে তো রান্না নামাতে তর সয় না—না খাবি যা, দেখবো খিদে পেলে কে খেতে ছ্যায়।

ব্যস্। চক্ষের পলকে—সব আছে, আমি আছি, তুমি আছ—সেই তাহার মা কাঁঠাল-বীচি ধুইতেছে—কিন্তু অপু কোথায়? সে যেন কর্পূরের মত উবিয়া গেল। কেবল ঠিক সেই সময়ে দুর্গা বাড়ী ঢুকিতে দরজার কাছে তাহাকে পাশ কাটাইয়া ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়া বিস্মিত সুরে ডাকিয়া বসিল—ও অপু, কোথায় যাচ্ছিস অমন ক'রে, কি হয়েচে, ও অপু শোন—

তাহার মা বলিল—জানিনে আমি, যত সব অনাচ্ছিষ্টি কাণ্ড বাপু তোমাদের, হাড় মাস কালি হয়ে গেল—কি এক পথের মাঝ-খানে টাঙিয়ে রেখেচে, আসছি ছিঁড়ে গেল—তা এখন কি হবে? আমি কি ইচ্ছে ক'রে ছিঁড়েছি? তাই ছেলের রাগ—আমি ভাত খাব না—না খাস যা, ভাত খেয়ে সব একেবারে স্বগ্‌গে ঘণ্টা দেবে কিনা তোমরা!

মাতাপুত্রের এরূপ অভিমানের পালায় দুর্গাকেই মধ্যস্থ হইতে হয়—সে অনেক ডাকাডাকির পরে বেলা দুইটার সময় ভাইকে খুঁজিয়া বাহির করিল। সে শুষ্কমুখে উদাস নয়নে ও পাড়ার পথে রায়েদের বাগানে পড়ন্ত আমগাছের গুঁড়ির উপর বসিয়াছিল।

খাওয়া-দাওয়ার পর দুপুর-বেলা অপু কোথাও বাহির না হইয়া ঘরেই থাকে। অনেক দিনের জীর্ণ পুরাতন কোঠা-বাড়ীর পুরাতন ঘর। জিনিসপত্র, কাঠের সেকালের সিন্দুক, কটা রং-এর সেকালের

বেতের প্যাঁটরা, কড়ির আল্‌না, জলচৌকিতে ঘর ভরানো। এমন সব বাক্স আছে যাহা অপু কখনো খুলিতে দেখে নাই, তাতে রক্ষিত এমন সব হাঁড়ি-কলসী আছে যাহার অভ্যন্তরস্থ দ্রব্য সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

সব-সুদ্ধ মিলিয়া ঘরটিতে পুরানো জিনিসের কেমন একটা পুরানো পুরানো গন্ধ বাহির হয়—সেটা কিসের গন্ধ সে জানে না, কিন্তু সেটা যেন বহু অতীত কথা মনে আনিয়া দেয়। সে অতীত দিনে অপু ছিল না, কিন্তু এই কড়ির আলনা ছিল, ঐ ঠাকুরদার বেতের ঝাঁপিটা ছিল, ঐ বড় কাঠের সিন্দুকটা ছিল, ওই যে সোঁদালি গাছের মাথা বনের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আছে, ওই পোড়ো জঙ্গলে-ভরা জায়গাটাতে কাহাদের চণ্ডীমণ্ডপ ছিল, আরও কত নামের কত ছেলেমেয়ে একদিন এই ভিটাতে খেলিয়া বেড়াইত, কোথায় তারা ছায়া হইয়া মিলাইয়া গিয়াছে, কতকাল আগে।

যখন একা ঘরে থাকে, মা ঘাটে যায়—তখন তাহার অত্যন্ত লোভ হয় ওই বাক্সটা, বেতের ঝাঁপিটা খুলিয়া দিনের আলোয় বাহির করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখে কি অদ্ভুত রহস্য উহাদের মধ্যে গুপ্ত আছে। ঘরের আড়ার সর্বোচ্চ তাকে কাঠের বড় বারকোসে যে তালপাতার পুঁথির স্তূপ ও খাতাপত্র আছে, বাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিয়াছিল সেগুলি তাহার ঠাকুরদাদা রামচাঁদ তর্কালঙ্কারের—তাহার বড় ইচ্ছা ওইগুলি যদি হাতের নাগালে ধরা দেয়, তবে সে একবার নীচে নামাইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে। এক একদিন বনের ধারে জানলাটায় বসিয়া দুপুর বেলা সে সেই ছেঁড়া কাশীদাসের মহাভারতখানা লইয়া পড়ে, সে নিজেই খুব ভাল পড়িতে শিখিয়াছে, আগেকার মত আর মুখে শুনিতে হয় না, নিজেই জলের মত পড়িয়া যায় ও বুঝিতে পারে। পড়াশুনায় তাহার বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ, তাহার বাবা মাঝে মাঝে তাহাকে গাঙ্গুলি বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপে বৃদ্ধদের মজলিসে লইয়া যায়, রামায়ণ কি পাঁচালী পড়িতে দিয়া বলে, পড়ো তো বাবা, এঁদের একবার শুনিয়ে দাও তো? বৃদ্ধেরা

খুব তারিফ করেন, দীনু চাটুয্যে বলেন—আর আমার নাতিটা, এই তোমার খোকারই বয়স হবে, দুখানা বর্ণপরিচয় ছিঁড়লে বাপু, শুনলে বিশ্বেস করবে না, এখনো ভাল ক'রে অক্ষর চিনলে না—বাপের ধারা পেয়ে বসে আছে—ঐ যে-কদিন আমি আছি রে বাপু, চক্ষু বুজলেই লাঙলের মুঠো ধর্‌তে হবে। পুত্রগর্বে হরিহরের বুক ভরিয়া যায়। মনে মনে ভাবে—ওকি তোমাদের মত হবে। বর্ল্লে তো চিরকাল সুদের কারবার!—হোলামই বা গরীব, হাজার হোক পণ্ডিতবংশ তো বটে, বাবা মিথ্যেই তালপাতা ভরিয়ে ফেলেমনি পুঁথি লিখে, বংশে একটা ধারা দিয়ে গিয়েছেন, সেটা যাবে কোথায়?

এই বনের মধ্যে কোথায় একটা মজা, পুরানো পুকুর আছে তারই পাড়ে যে ভাঙা মন্দিরটা আছে, আজকাল যেমন পঞ্চানন্দ ঠাকুর গ্রামের দেবতা, কোনো সময়ে ঐ মন্দিরের বিশালাক্ষী দেবী সেই-রকম ছিলেন। তিনি ছিলেন গ্রামের মজুমদার বংশের প্রতিষ্ঠিত দেবতা, এক সময়ে কি বিষয়ে সফল মনস্কাম হইয়া তাঁহারা দেবীর মন্দিরে নরবলি দেন, তাহাতে রুষ্টা হইয়া দেবী স্বপ্নে জানাইয়া যান যে, তিনি মন্দির পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, আর কখনো ফিরিবেন না। অনেক কালের কথা, বিশালক্ষীর পূজা হইতে দেখিয়াছে এরূপ কোনো লোক আর জীবিত নাই, মন্দির ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছে, মন্দিরের সম্মুখের পুকুর মজিয়া ডোবায় পরিণত হইয়াছে, চারিধার বনে ছাইয়া ফেলিয়াছে, মজুমদার বংশেও বাতি দিতে আর কেহ নাই।

কেবল—সেও অনেকদিন আগে—গ্রামের স্বরূপ চক্রবর্তী ভিন-গাঁ হইতে নিমন্ত্রণ খাইয়া ফিরিতেছিলেন—সন্ধ্যার সময় নদীর ঘাটে নামিয়া আসিতে পথের ধারে দেখিলেন একটি সুন্দরী ষোড়শী মেয়ে দাঁড়াইয়া। স্থানটি লোকালয় হইতে দূরে, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, পথে কেহ কোথাও নাই, এ সময় নিরালা বনের ধারে একটি অল্পবয়সী সুন্দরী মেয়েকে দেখিয়া স্বরূপ চক্রবর্তী দস্তুরমত

বিস্মিত হইলেন। কিন্তু তিনি কোনো কথা কহিবার পূর্বেই মেয়েটি ঈষৎ গর্বমিশ্রিত অথচ মিষ্টিসুরে বলিল—আমি এ গ্রামের বিশালাক্ষী দেবী। গ্রামে অল্পদিনে ওলাউঠার মড়ক আরম্ভ হবে—ব'লে দিও চতুর্দ্দশীর রাত্রে পঞ্চানন তলায় একশ' আটটা কুমড়ো বলি দিয়ে যেন কালীপূজা করে। কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই স্তম্ভিত স্বরূপ চক্রবর্তীর চোখের সামনে মেয়েটি চারিধারের শীত-সন্ধ্যার কুয়াশায় ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল। এই ঘটনার দিন কয়েক পরে সত্যই সেবার গ্রামে ভয়ানক মড়ক দেখা দিয়াছিল।

এ সব গল্প কতবার শুনিয়াছে। জানালার ধারে দাঁড়াইলেই বিশালাক্ষী ঠাকুরের কথা তাহার মনে ওঠে। দেবী বিশালাক্ষীকে একটিবার দেখিতে পাওয়া যায় না? হঠাৎ সে বনের পথে হয়ত গুলঞ্চের লতা পাড়িতেছে—সেই সময়—

খুব সুন্দর দেখিতে, রাঙা-পাড় শাড়ী পরনে, হাতে গলায় মা দুর্গার মত হার বালা।

—তুমি কে?

—আমি অপু।

তুমি বড় ভাল ছেলে, কি বর চাও?

সে বিছানায় গিয়া শোয়। এক একবার ঝিরঝিরে হাওয়ায় কত কি লতাপাতার তিক্তমধুর গন্ধ ভাসিয়া আসে, ঠিক দুপুর বেলা, অনেক দূরের কোনো গাছের মাথার উপর হইতে গাঙ-চিল টানিয়া টানিয়া ডাকে, যেন এই ছোট্ট গ্রামখানির অতীত ও বর্তমান সমস্ত ছোটো-খাটো সুখ-দুঃখ শান্তি-দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে, শরৎ-মধ্যাহ্নের রৌদ্র-ভরা, নীল-নির্জন আকাশপথে, এক উদাস, গৃহ-বিবাগী পথিক-দেবতার সুকণ্ঠের অবদান দূর হইতে দূরে মিলাইয়া চলিয়াছে।

কখন সে ঘুমাইয়া পড়ে বুঝিতে পারে না, ঘুমাইয়া উঠিয়া দেখে বেলা একেবারে নাই। জানালার বাহিরে সারা বনটায় ছায়া পড়িয়া আসিয়াছে, বাঁশঝাড়ের আগায় রাঙা রোদ।

অপুর শকুনের ডিম কেনা   বার

অপু কাউকে একথা এখনো বলে নাই—তাহার দিদিকেও না।

সেদিন চুপি চুপি দুপুরে সে যখন তাহার বাবার ঐ বই-বোঝাই কাঠের সিন্দুকটা লুকাইয়া খুলিয়াছিল, সিন্দুকটার মধ্যে একখানা বইএর মধ্যেই এই অদ্ভুত কথাটার সন্ধান পাইয়াছে।

উঠানের উপর বাঁশঝাড়ের ছায়া তখন পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ হয় নাই, ঠিক-দুপুরে সোনাডাঙার তেপান্তর মাঠের সেই প্রাচীন অশ্বত্থ গাছের ছায়ার মত এক জায়গায় একরাশ ছায়া জমাট বাঁধিয়া ছিল।

একদিন সে দুপুরবেলা বাপের অনুপস্থিতে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া চুপি চুপি বইয়ের বাক্সটা লুকাইয়া খুলিল। অধীর আগ্রহের সহিত সে এ-বই খুলিয়া খানিকটা করিয়া ছবি দেখিতে এবং খানিকটা করিয়া বই-এর মধ্যে ভাল গল্প লেখা আছে কিনা দেখিতে লাগিল। একখানা বইয়ের মলাট খুলিয়া দেখিল নাম লেখা আছে 'সর্ব-দর্শন-সংগ্রহ'। ইহার অর্থ কি, বইখানা কোন্ বিষয়ের তাহা সে বিন্দুবিসর্গও বুঝিল না। বইখানা খুলিতেই একদল কাগজ-কাটা পোকা নিঃশব্দে বিবর্ণ মার্বেল কাগজের নীচে হইতে বাহির হইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে যেদিকে দুই চোখ যায় দৌড় দিল। অপু বইখানা নাকের কাছে লইয়া গিয়া ঘ্রাণ লইল, কেমন পুরানো গন্ধ? মেটে রঙের পুরু পুরু পাতাগুলার এই গন্ধটা তাহার বড় ভাল লাগে—গন্ধটায় কেবলই বাবার কথা মনে করাইয়া দেয়। যখনই গন্ধ সে পায় তখনই কি জানি কেন তাহার বাবার কথা মনে পড়ে।

অত্যন্ত পুরানো মার্বেল কাগজের বাঁধাই করা মলাটের নানাস্থানে চটা উঠিয়া গিয়াছে। এই পুরানো বইএর উপরই তাহার প্রধান মোহ। সেইজন্য সে বইখানা বালিশের তলায় লুকাইয়া রাখিয়া অন্যান্য বই তুলিয়া বাক্স বন্ধ করিয়া দিল।

লুকাইয়া পড়িতে পড়িতে এই বইখানিতেই একদিন সে পড়িল বড় অদ্ভুত কথাটা। হঠাৎ শুনিলে মানুষ আশ্চর্য হইয়া যায় বটে —কিন্তু ছাপার অক্ষরে বইখানার মধ্যে এ কথা লেখা আছে, সে পড়িয়া দেখিল। পারদের গুণ বর্ণনা করিতে করিতে লেখক লিখিয়াছে—শকুনির ডিমের মধ্যে পারদ পুরিয়া কয়েকদিন রৌদ্রে রাখিতে হয়, পরে সেই ডিম মুখের ভিতর পুরিয়া মানুষ ইচ্ছা করিলে শূন্যমার্গে বিচরণ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। অপু নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না,—আবার পড়িল—আবার পড়িল।

পরে নিজের ডালাভাঙা বাক্সটার মধ্যে বইখানা লুকাইয়া রাখিয়া বাহিরে গিয়া কথাটা ভাবিতে ভাবিতে সে অবাক্ হইয়া গেল।

দিদিকে জিজ্ঞাসা করে—শকুনিরা বাসা বাঁধে কোথায় জানিস্ দিদি?

তাহার দিদি বলিতে পারে না! সে পাড়ার ছেলেদের—সতু, নীলু, কিনু, পটল, নেড়া—সকলকে জিজ্ঞাসা করে। কেউ বলে সে এখানে নয়; উত্তর মাঠে উঁচু গাছের মাথায়। তাহার মা বকে —এই দুপুরবেলা কোথায় ঘুরে বেড়াস! অপু ঘরে ঢুকিয়া শুইবার ভান করে, বইখানা খুলিয়া সেই জায়গাটা আবার পড়িয়া দেখে। আশ্চর্য! এত সহজে উড়িবার উপায়টা কেউ জানে না? হয়তো এই বইখানা আর কাহারো বাড়ী নাই শুধু তাহার বাবারই কাছে, হয়তো এই জায়গাটা আর কেহ পড়িয়া দেখে নাই, শুধু তাহারই চোখে পড়িয়াছে এতদিনে।

বইখানার মধ্যে মুখ গুঁজিয়া আবার সে আঘ্রাণ লয়—সেই পুরানো পুরানো গন্ধটা! এই বইয়ে যাহা লেখা আছে, তাহার সত্যতা সম্বন্ধে তাহার মনে আর কোন অবিশ্বাস থাকে না।

পারদের জন্য ভাবনা নাই—পারদ মানে পারা সে জানে। আয়নার পেছনে পারা মাখানো থাকে, একখানা ভাঙা আয়না বাড়ীতে আছে, উহা যোগাড় করিতে পারিবে এখন। কিন্তু শকুনির ডিম এখন সে কোথায় পায়?

অবশেষে সন্ধান মিলিল। হীরু নাপিতের কাঁঠালতলায় রাখালেরা গরু বাঁধিয়া গৃহস্থের বাড়ীতে তেল-তামাক আনিতে যায়। অপু গিয়া তাহাদের পাড়ার রাখালকে বলিল—তোরা কত মাঠে মাঠে বেড়াস, শকুনির বাসা দেখতে পাস? আমায় যদি একটা শকুনির ডিম এনে দিস আমি দুটো পয়সা দেবো।

দিন চারেক পরেই রাখাল তাহাদের বাড়ীর সামনে আসিয়া তাহাকে ডাকিয়া কোমরের থলি হইতে দুইটা কালো রংএর ছোট ছোট ডিম বাহির করিয়া বলিল—এই ছাখ ঠাকুর এনেচি। অপু তাড়াতাড়ি হাত বাড়াইয়া বলিল, দেখি। পরে আহ্লাদের সহিত উল্টাইয়া পাল্টাইয়া বলিল—শকুনির ডিম! ঠিক তো? রাখাল সে সম্বন্ধে ভূরি ভূরি প্রমাণ উত্থাপিত করিল। ইহা শকুনির ডিম কিনা এ সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণ নাই, সে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া কোথাকার কোন্ উঁচু গাছের মগ্‌ডাল হইতে ইহা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে—কিন্তু দুই আনার কমে দিবে না।

পারিশ্রমিক শুনিয়া অপু অন্ধকার দেখিল। বলিল, দুটো পয়সা দেবো আর আমার কড়িগুলো নিবি? সব দিয়ে দেবো, এক টিনের ঠোঙা কড়ি—সব। এই এত বড় বড় সোনাগেঁটে—দেখবি? দেখাবো?

রাখালকে সাংসারিক বিষয়ে অপুর অপেক্ষা অনেক হুঁশিয়ার বলিয়া মনে হইল। সে নগদ পয়সা ছাড়া কোনো রকমেই রাজি হয় না। অনেক দরদস্তুরের পর আসিয়া চার পয়সায় দাঁড়াইল। অপু দিদির কাছে চাহিয়া চিন্তিয়া দুটা পয়সা যোগাড় করিয়া তাহাকে চুকাইয়া দিয়া ডিম দুইটি লইল। তাহা ছাড়া রাখাল কিছু কড়িও লইল। এই কড়িগুলা অপুর প্রাণ, অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যার বিনিময়েও সে এই কড়ি কখনো হাতছাড়া করিত না অন্য সময়; কিন্তু আকাশে উড়িবার আমোদের কাছে কি আর বেগুন-বীচি খেলা!

সেই দিনই, কি তাহার পরদিন। সন্ধ্যার একটু আগে দুর্গা সলিতার জন্য ছেঁড়া নেকড়া খুঁজিতেছিল। তাকে হাঁড়ি-কলসীর পাশে গোঁজা সলিতা পাকাইবার ছেঁড়া-খোঁড়া কাপড়ের টুকরার

তাল হাতড়াইতে কি যেন ঠক করিয়া তাহার পিছন হইতে গড়াইয়া মেজের উপর পড়িয়া গেল। ঘরের ভিতর অন্ধকার, ভাল দেখা যায় না, দুর্গা মেজে হইতে উঠাইয়া লইয়া বাহিরে আসিয়া বলিল—ওমা কিসের দুটো বড় বড় ডিম এখানে! এঃ প'ড়ে একেবারে গুঁড়ো হয়ে গিয়েচে—দেখেচো কি পাখী ডিম পেড়েচে ঘরের মধ্যে মা!

তাহার পর কি ঘটিল, সে কথা না তোলাই ভালো। অপু সেদিন রাত্রে খাইল না…কান্না…হৈ হৈ কাণ্ড। তাহার মা ঘাটে গল্প করে—ছেলেটার যে কি কাণ্ড, ওমা এমন কথা তো কখনো শুনিনি—শুনেচো সেজ ঠাকুরঝি, শকুনির ডিম নিয়ে নাকি মানুষে উড়তে পারে—ওই ওদের বাড়ীর রাখাল ছোঁড়াটা বদ্‌মায়েসের ধাড়ি। তাকে বুঝি বলেচে, সে কোথেকে দুটো কাগের না কিসের ডিম এনে বলেচে—এই নেও শকুনের ডিম। তাই নাকি আবার চার পয়সা দিয়ে কিনেচে তার কাছে। ছেলেটা যে কি বোকা সে আর তোমার কাছে কি বল্‌বো সেজ ঠাকুরঝি—কি করি যে এ ছেলে নিয়ে আমি!

কিন্তু বেচারী সর্বজয়া কি করিয়া জানিবে? সকলেই তো কিছু 'সর্ব-দর্শন-সংগ্রহ' পড়ে নাই বা সকলেই কিছু পারদের গুণও জানে না।

আকাশে তাহা হইলে তো সকলেই উড়িত।
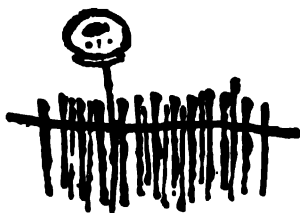
যাত্রার আসরে অপু　　　　　　　তের

গ্রামে বারোয়ারী চড়কপূজার সময় আসিল। গ্রামের বৈদ্যনাথ মজুমদার চাঁদার খাতা হাতে বাড়ী বাড়ী চাঁদা আদায় করিতে আসিলেন। হরিহর বলিল, না খুড়ো, এবার আমার এক টাকা চাঁদা ধরাটা অনেয্য হয়েছে—এক টাকা দেবার কি আমার অবস্থা?

বৈদ্যনাথ বলিলেন—না হে না, এবার নীলমণি হাজরার দল। এরকম দলটি এ অঞ্চলে কেউ চক্ষেও দেখেনি। এবার পালপাড়ার বাজারে মহেশ সেকরার বালক কেত্তনের দল গাইবে, তবে সঙ্গে পাল্লা দেওয়া চাই-ই—

বৈদ্যনাথ এমন ভাব দেখাইলেন যেন নিশ্চিন্দিপুরবাসিগণের জীবন মরণ এই প্রতিযোগিতার সাফল্যের উপর নির্ভর করিতেছে।

বারোয়ারী তলায় ঘাস চাঁচিয়া প্রকাণ্ড বাঁশের মেরাপ বাঁধিয়া সামিয়ানা টাঙানো হইয়াছে। যাত্রার দল আসে আসে—এখনও পৌঁছে নাই! সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেলে, লোকে বলে কাল সকালের গাড়ীতে আসিবে, সকাল চলিয়া গেলে, বৈকালের আশায় থাকে। অপুর স্নানাহার বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। রাত্রে অপুর ঘুম হয় না, বাঁধভাঙা বন্যার স্রোতের মত কৌতূহল ও খুশির যে কী প্রবল অদম্য উচ্ছ্বাস! বিছানায় ছট্‌পট্‌ করে। এপাশ-ওপাশ করে। যাত্রা হবে! যাত্রা হবে! যাত্রা হবে!

হঠাৎ শুনিতে পাওয়া যায় আজ বিকেলেই দল আসিবে। এক ঝলক রক্ত যেন বুক হইতে নাচিয়া চল্‌কাইয়া একেবারে মাথায় উঠিয়া পড়ে!...

কুমারপাড়ার মোড়ে দুপুরের পর হইতেই সকল ছেলের সঙ্গে

দাঁড়াইয়া থাকিবার পর দূরে একখানা গরুর গাড়ি তাহার চোখে পড়িল। সাজের বাক্স বোঝাই—এক, দুই, তিন, পাঁচ খানা! পটু একে একে আঙুল দিয়া গুণিয়া খুশির সুরে বলিল—অপুদা, আমরা এদের পেছনে পেছনে এদের বাসায় গিয়ে দেখে আসব, যাবি? সাজের গাড়িগুলোর পেছনে দলের লোকেরা যাইতেছে, সকলের মাথায় টেরিকাটা, অনেকের জুতা হাতে। পটু একজন দাড়িওয়ালা লোককে দেখাইয়া কহিল—এ বোধ হয় রাজা সাজে, না অপুদা?

আকাশ বাতাসের রং একেবারে বদলাইয়া গেল—অপু মহা উৎসাহে বাড়ী ফিরিয়া দেখে তাহার বাবা দাওয়ায় বসিয়া কি যেন লিখিতেছে ও গুন্‌গুন্ করিয়া গান করিতেছে। সে ভাবে যাত্রা আসিবার কথা তাহার বাবাও জানিতে পারিয়াছে, তাই এত স্ফুর্তি। উৎসাহে হাত নাড়িয়া বলে—সাজ একেবারে পাঁচ গাড়ী বাবা! এ রকম দল!—

হরিহর শিষ্যবাড়ী বিলি করার জন্য কাগজে কবচ লিখিতেছিল, মুখ তুলিয়া বিস্ময়ের সঙ্গে বলে—কিসের সাজ রে খোকা? অপু আশ্চর্য হইয়া যায়, এতবড় ঘটনা বাবার জানা নাই! বাবাকে নিতান্ত কৃপার পাত্র বিবেচনা করে।

সকালে উঠিয়া অপুকে পড়িতে বসিতে হয়। খানিক পরে সে কাঁদো কাঁদো ভাবে বলে—আমি বারোয়ারী তলায় যাবো বাবা, সকলে যাচ্চে আর আমি এখন বুঝি ব'সে ব'সে পড়বো! এখখুনি যদি যাত্রা আরম্ভ হয়?

তাহার বাবা বলে—পড়ো, পড়ো, এখন ব'সে পড়ো, যাত্রা আরম্ভ হ'লে ঢোল বাজবার শব্দ তো শুনিতে পাওয়া যাবে। তখন না হয় যেও এখন। প্রৌঢ় বয়সের ছেলে, নিজে সব সময়ে আজকাল বিদেশে থাকে; অল্পদিনের জন্য বাড়ী আসিয়া ছেলেকে চোখ-ছাড়া করিতে মন চায় না। অভিমানে রাগে অপুর চোখ দিয়া জল পড়িতে থাকে। সে কান্না-ভরা গলায় আবার শুভঙ্করী শুরু করে—মাস মাহিনা যার যত, দিন তার পড়ে কত?

কিন্তু সকালে যাত্রা বসে না, খবর আসে ওবেলা বসিবে। ওবেলা অপু মায়ের কাছে যাইয়া কাঁদো কাঁদো ভাবে বাবার অত্যাচারের কাহিনী আনুপূর্বিক বর্ণনা করে। সর্বজয়া আসিয়া বলে—দাও না গো ছেলেটাকে ছেড়ে? বছরকারের দিনটা—তোমার ন'মাস বাড়ীতে থাকা নেই বছরে, আর ও একদিনের পড়াতে একেবারে তক্কালঙ্কার হয়ে উঠবে কি না!

যাত্রা আরম্ভ হয়। জগৎ নাই,—কেহ নাই—শুধু অপু আছে, আর নীলমণি হাজ্‌রার যাত্রার দল আছে সাম্‌নে। সন্ধ্যার আগে বেহালায় ইমন আলাপ করে। ভাল বেহালাদার, পাড়াগাঁয়েব ছেলে কখনও সে ভাল জিনিস শোনে না—উদাস-করুণ সুরে হঠাৎ মন কেমন করিয়া উঠে···মনে হয় বাবা এখনও বসিয়া বাড়ীতে সেই কি লিখিতেছে—দিদি আসিতে চাহিয়াও আসিতে পারে নাই। প্রথম যখন জরির সাজ-পোশাক পরিয়া টাঙানো ঝাড় ও কড়ির ডুমের আলো-সজ্জিত আসরে রাজা মন্ত্রীর দল আসিতে আরম্ভ করে, অপু মনে মনে ভাবে এমন সব জিনিস তাহার বাবা দেখিল না! সবাই তো আসরে আসিয়াছে গ্রামের, তাহাদের পাড়ার কোনও লোক তো বাকী নাই! বাবা কেন এখনো···? পালা দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকে। সেবার সে বালককীর্তনের দলের যাত্রা শুনিয়াছিল—সে কি, আর এ কি? কি সব সাজ! কি সব চেহারা!···

হঠাৎ পিছন হইতে কে বলে—খোকা বেশ দেখ্‌তে পাচ্ছ তো? ···তাহার বাবা কখন আসিয়া আসরে বসিয়াছে অপু জানিতে পারে নাই। বাবার দিকে ফিরিয়া বলে—বাবা দিদি এসেচে?···চিকের মধ্যে বুঝি?

মন্ত্রীর গুপ্ত ষড়যন্ত্রে যখন রাজা রাজ্যচ্যুত হইয়া স্ত্রীপুত্র লইয়া বনে চলিতেছেন, তখন কাঁদুনে সুরে বেহালার সঙ্গত হয়। তারপর রাজা করুণ রস বহুক্ষণ জমাইয়া রাখিবার জন্য স্ত্রীপুত্রের হাত ধরিয়া এক এক পা করিয়া থামেন, আর এক এক পা অগ্রসর হইতে থাকেন,

সত্যিকার জগতে কোন বনবাসগমনোদ্যত রাজা নিতান্ত অপ্রকৃতিস্থ না হইলে একদল লোকের সম্মুখে সেরূপ করে না। বিশ্বস্ত-রাজ-সেনাপতি রাগে এমন কাঁপেন যে মৃগীরোগগ্রস্ত রোগীর পক্ষেও তাহা হিংসার বিষয় হইবার কথা। অপু অপলক চোখে চাহিয়া বসিয়া থাকে, মুগ্ধ বিস্মিত হইয়া যায়; এমন তো সে কখনো দেখে নাই!

তারপর কোথায় চলিয়া গিয়াছেন রাজা, কোথায় গিয়াছেন রাণী।···ঘন নিবিড় বনে শুধু রাজপুত্র অজয় ও রাজকুমারী ইন্দুলেখা ভাইবোনে ঘুরিয়া বেড়ায়। কেউ নাই যে তাদের মুখের দিকে চায়, কেউ নাই যে নির্জন বনে তাহাদের পথ দেখাইয়া লইয়া চলে। ছোট ভাইয়ের জন্য ফল আনিতে একটু দূরে চলিয়া যাইয়া ইন্দুলেখা আর ফেরে না। অজয় বনের মধ্যে বোনকে খুঁজিয়া বেড়ায়—তাহার পর নদীর ধারে হঠাৎ খুঁজিয়া পায় ইন্দুলেখার মৃতদেহ—ক্ষুধার তাড়নায় বিষফল খাইয়া সে মরিয়া গিয়াছে। অজয়ের করুণ গান—কোথা ছেড়ে গেলি এ বনকান্তারে প্রাণপ্রিয় প্রাণসাথী রে—শুনিয়া অপু এতক্ষণ মুগ্ধ চোখে চাহিয়াছিল—আর থাকিতে পারে না, ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদে।

কলিঙ্গরাজের সহিত বিচিত্রকেতুর যুদ্ধে তলোয়ার খেলা কী!··· যায় বুঝি ঝাড়গুলো গুঁড়ো হইয়া, নয় তো কোন হতভাগ্য দর্শকের চোখ দুটি বা যায়। রব উঠে—ঝাড় সাম্‌লে ঝাড় সাম্‌লে। কিন্তু অদ্ভুত যুদ্ধকৌশল—সব বাঁচাইয়া গেল—ধন্য বিচিত্রকেতু?

মধ্যে অনেকক্ষণ ধরিয়া জুড়ির দীর্ঘ গান ও বেহালার করসৎ-এর সময় অপুকে তাহার বাবা ডাকিয়া বলে—ঘুম পাচ্ছে···বাড়ী যাবে খোকা? ঘুম! সর্বনাশ? না সে বাড়ী যাইবে না। বাহিরে ডাকিয়া তাহার বাবা বলে—এই দুটো পয়সা রাখো বাবা, কিছু কিনে খেও, আমি বাড়ী গেলাম। অপুর ইচ্ছা সে এক পয়সার পান কিনিয়া খাইবে, পানের দোকানের কাছে অত্যন্ত কিসের ভিড় দেখিয়া অগ্রসর হইয়া দেখে, অবাক। সেনাপতি বিচিত্রকেতু হাতিয়ারবৃন্দ অবস্থায় বার্ডসাই কিনিয়া ধরাইতেছেন—তাঁহাকে

ঘিরিয়া রথযাত্রার ভিড়। আশ্চর্যের উপর আশ্চর্য। রাজকুমার অজয় কোথা হইতে আসিয়া বিচিত্রকেতুর কনুই-এ হাত দিয়া বলিল —এক পয়সার পান খাওয়াও না কিশোরীদা?···রাজপুত্রের প্রতি সেনাপতির বিশ্বস্ততার নিদর্শন দেখা গেল না—হাত ঝাড়া দিয়া বলিল—যাঃ অত পয়সা নেই—ওবেলা সাবানখানা যে দু'জনে মাখ্‌লে আমাকে বলেছিলে? রাজপুত্র পুনরায় বলিল--খাওয়াও না কিশোরীদা? আমি বুঝি কখনো কিছু দিইনি তোমাকে?

কয়দিন খুব বর্ষা চলিতেছে। অন্নদা রায়ের চণ্ডীমণ্ডপে সন্ধ্যাবেলায় মজলিস বসে। সেদিন সেখানে নীলকুঠির ভূতের গল্প হইতে শুরু হইয়া পুরীর কোন্ মন্দিরের মাথায় পাঁচ মণ ভারী চুম্বক পাথর বসানো আছে, যাহার আকর্ষণের বলে নিকটবর্তী সমুদ্রগামী জাহাজ প্রায়ই পথভ্রষ্ট হইয়া আসিয়া তীরবর্তী মগ্ন শৈলে লাগিয়া ভাঙিয়া যায় প্রভৃতি—আরব্য উপন্যাসের গল্পের মত নানা আজগুবি কাহিনীর বর্ণনা চলিতেছিল। সকলে সাগ্রহে শুনিতেছিলেন, কিন্তু রামময় হঠাৎ বাহিরের দিকে চাহিয়া বলিলেন—না ওঠা যাক্, এর পর আর যাওয়া যাবে না—দেখচো না কাণ্ডখানা? একটা ঝটকা টট্‌কা না হলে বাঁচি, গতিক বড় খারাপ, চলো সব—

বৃষ্টির বিরাম নাই। একটু থামে, আবার অমনি জোরে আসে, বৃষ্টির ছাটে চারিধার ধোঁয়া ধোঁয়া।

হরিহর মোটে পাঁচটা টাকা পাঠাইয়াছিল, তাহার পর আর পত্রও নাই, টাকাও নাই। সেই অনেকদিন হইয়া গেল—রোজ সকালে উঠিয়া সর্বজয়া ভাবে আজ ঠিক খরচ আসবে। ছেলেকে বলে, তুই খেলে খেলে বেড়াস ব'লে দেখতে পাস্‌নে, ডাকবাক্সটার কাছে ব'সে থাকবি—পিয়ন যেমন আস্‌বে আর অম্‌নি জিগ্যেস করবি—

অপু বলে—বা, আমি বুঝি ব'সে থাকি নে? কালও তো এলো, পুঁটিদের চিঠি, আমাদের খবরের কাগজ দিয়ে গেল—জিগ্যেস্ করে এস দিকি পুঁটিকে? কাল তবে আমাদের খবরের কাগজ কি ক'রে এল? আমি থাকিনে বৈ কি।

দুই একদিনে ঘনীভূত বর্ষা নামিল। হু-হু পূবে হাওয়া, খানাডোবা সব থৈ-থৈ করিতেছে—পথে ঘাটে এক হাঁটু জল, দিন রাত সোঁ সোঁ, বাঁশবনে ঝড় বাধে--বাঁশের মাথা লুটাইয়া পড়ে—আকাশের কোথাও ফাঁক নাই—মাঝে মাঝে আগেকার চেয়েও অন্ধকার করিয়া আসে—কালো কালো মেঘের রাশ হু-হু উড়িয়া পূর্ব হইতে পশ্চিমে চলিয়াছে—দূর আকাশের কোথায় যেন দেবাসুরের মহাসংগ্রাম বাধিয়াছে, কোন্ কৌশলী সেনানায়কের চালনায় জলস্থল আকাশ একেবারে ছাইয়া ফেলিয়া বিরাট দৈত্য-সৈন্য, বাহিনীর পর বাহিনী, অক্ষৌহিণীর পর অক্ষৌহিণী, অদৃশ্য রথী মহারথীরদের নায়কত্বে ঝড়ের বেগে অগ্রসর হইতেছে—প্রজ্জ্বলন্ত অত্যুগ্র দেববজ্র আগুন উড়াইয়া চক্ষের নিমেষে বিশাল কৃষ্ণচমুব এদিক-ওদিক পর্যন্ত ছিঁড়িয়া ফাঁড়িয়া এই ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিতেছে—এই আবার কোথা হইতে রক্তবীজের বংশ করাল কৃষ্ণছায়ায় পৃথিবী অন্তরীক্ষ অন্ধকার করিয়া ঘিরিয়া আসিতেছে।

মহাঝড়!

তখনও ভাল করিয়া ভোর হয় নাই, ঝড় থামিয়া গিয়াছে কিন্তু বৃষ্টি তখনও অল্প অল্প পড়িতেছে। পাড়ার নীলমণি মুখুয্যের স্ত্রী গোয়ালে গরুর অবস্থা দেখিতে আসিতেছেন, এমন সময় খিড়কীদোরে বার বার ধাক্কা শুনিয়া দোর খুলিয়া বিস্ময়ের সুরে বলিলেন—নতুন বৌ! সর্বজয়া ব্যস্তভাবে বলিল—ন' দি, একবার বট্‌ঠাকুরকে ডাকো দিকি? একবার শিগ্‌গির আমাদের বাড়ীতে আসতে বলো—দুগ্‌গা কেমন করচে!

নীলমণি মুখুয্যের স্ত্রী আশ্চর্য হইয়া বলিলেন—দুগ্‌গা। কেন কি হয়েচে দুগ্‌গার?

সর্বজয়া বলিল—ক'দিন থেকে তো জ্বর হচ্ছিস—হচ্চে আবার যাচ্চে—ম্যালেরিয়া জ্বর, কাল সন্দে থেকে জ্বর বড্ড বেশী—তার ওপর কাল রাত্রে কি রকম কাণ্ড তো জানই—একবার শীগগির বট্‌ঠাকুরকে—

তাহার বিস্রস্ত কেশ ও রাত-জাগা রাঙা রাঙা চোখের কেমন দিশাহারা চাহনি দেখিয়া নীলমনি মুখুয্যের স্ত্রী বলিলেন—ভয় কি বৌ—দাঁড়াও আমি এক্ষুনি ডেকে দিচ্চি—চল আমি যা'চ্চ—কাল আবার রাত্তিরে গোয়ালের চালাখানা পড়ে গেল, বাবা কাল রাত্তিরের মত কাণ্ড আমি তো কখনো দেখিনি—শেষরাত্রে সব উঠে গরুটরু সরিয়ে রেখে রাবার শুয়েচে কি না '···দাঁড়াও আমি ডাকি—

একটু পরে নীলমনি মুখুয্যে, তাহার বড় ছেলে ফণি, স্ত্রী ও দুই মেয়ে সকলে অপুদের বাড়ীতে আসিলেন।

দুর্গার বিছানার পাশে অপু বসিয়া আছে—নীলমনি মুখুয্যে ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন—কি হয়েছে বাবা অপু?—অপুর মুখে উদ্বেগের চিহ্ন। বলিল, দিদি কি সব বক্‌ছিল জ্যেঠা মশাই।

নীলমনি বিছানার পাশে বসিয়া বলিলেন—দেখি হাতখানা? ···জ্বরটা একটু বেশী, আচ্ছা কোনো ভয় নেই—ফণি, তুমি একবার চট ক'রে নবাবগঞ্জে চলে যাও দিকি শরৎ ডাক্তারের কাছে—একেবারে ডেকে নিয়ে আসবে। পরে তিনি ডাকিলেন—দুর্গা, ও দুর্গা? দুর্গার অঘোর আচ্ছন্ন ভাব, সাড়া শব্দ নাই। নীলমনি বলিলেন, এঃ ঘরদোরের অবস্থা তো বড্ড খারাপ? জল প'ড়ে কাল রাত্রে ভেসে গিয়েছে···তা বৌমার লজ্জার কারণই বা কি—আমাদের ওখানে না হয় উঠলেই হোত? হরিটারও কাণ্ডজ্ঞান আর হোল না এ জীবনে—এই অবস্থায় এই রকম ঘরদোর, সারানোর একটা ব্যবস্থা না ক'রে কি যে করচে, তাও জানিনে—চিরকালটা ওর সমান গেল—

তাঁহার স্ত্রী বলিলেন—ঘর সারাবে কি, খাবার নেই ঘরে, নৈলে কি এরকম আতান্তরে ফেলে কি কেউ বিদেশে যায়? আহা রোগা মেয়েটা কাল সারারাত ভিজেচে—একটু গরম জল করতে দাও—ওই জানালাটা খুলে দাও তো ফণি।

একটু বেলায় নবাবগঞ্জ হইতে শরৎ ডাক্তার আসিলেন—দেখিয়া

শুনিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। বলিয়া গেলেন যে, বিশেষ ভয়ের কোনো কারণ নাই। জ্বর বেশী হইয়াছে, মাথায় নিয়মিত ভাবে জলপটি দেওয়ার বন্দোবস্ত করিলেন। হরিহর কোথায় আছে জানা নাই—তবুও তাহার পূর্ব ঠিকানায় তাহাকে একখানি পত্র দেওয়া হইল।

পরদিন ঝড় থামিয়া গেল—আকাশের মেঘ কাটিতে শুরু করিল। নীলমণি মুখুয্যে দু'বেলা নিয়মিত দেখাশোনা করিতে লাগিলেন। ঝড়-বৃষ্টি থামিবার পরদিন হইতে দুর্গাব জ্বর আবার বড় বাড়িল। শরৎ ডাক্তার সুবিধা বুঝিলেন না। হরিহরকে আর একখানা পত্র দেওয়া হইল।

অপু তাহার দিদির মাথার কাছে বসিয়া জলপটি দিতেছিল। দিদিকে দু-একবার ডাকিল—ও দিদি শুন্‌ছিস, কেমন আছিস, ও দিদি? দুর্গার কেমন আচ্ছন্ন ভাব। ঠোঁট নাড়িতেছে—কি যেন আপন মনে বলিতেছে, ঘোর ঘোর। অপু মুখের কাছে কান লইয়া গিয়া দু-একবার চেষ্টা করিয়াও কিছু বুঝিতে পারিল না।

বৈকালের দিকে জ্বর ছাড়িয়া গেল। দুর্গা আবার চোখ মেলিয়া চাহিতে পারিল এতক্ষণ পরে। ভারি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে, চিঁ চিঁ করিয়া কথা বলিতেছে, ভাল করিয়া না শুনিলে বোঝা যায় না কি বলিতেছে।

মা গৃহকার্যে উঠিয়া গেলে অপু দিদির কাছে বসিয়া রহিল। দুর্গা চোখ তুলিয়া চাহিয়া বলিল—বেলা কত রে?

অপু বলিল—বেলা এখনও অনেক আছে—রোদ্দুর উঠেচে আজ দেখচিস্ দিদি? এখনও আমাদের নারকেল গাছের মাথায় রোদ্দুর রয়েচে।

খানিকক্ষণ দু'জনেই কোনো কথা বলিল না। অনেক দিন পরে রৌদ্র ওঠাতে অপুর ভারি আহ্লাদ হইয়াছে। সে জানালার বাহিরে রৌদ্রালোকিত গাছটার মাথায় চাহিয়া রহিল।

খানিকটা পরে দুর্গা বলিল—শোন অপু—একটা কথা শোন্—

—কি রে দিদি? পরে সে দিদির মুখের আরও কাছে মুখ লইয়া গেল।

—আমায় একদিন তুই রেলগাড়ী দেখাবি?

—দেখাবো এখন—তুই সেরে উঠলে বাবাকে ব'লে আমরা সব একদিন গঙ্গা নাইতে যাবো রেলগাড়ী ক'রে—

সারা দিন-রাত্রি কাটিয়া গেল। ঝড় বৃষ্টি কোনও কালে হইয়াছিল মনে হয় না। চারিধাবে দারুণ শরতের রৌদ্র।

সকাল দশটার সময় নীলমণি মুখুয্যে অনেক দিন পরে নদীতে স্নান করিতে যাইবেন বলিয়া তেল মাখিতে বসিয়াছেন, তাঁহার স্ত্রীর উত্তেজিত স্বর তাঁর কানে গেল—ওগো, এসো তো একবার এদিকে শীগ্‌গিব—অপুদের বাড়ীর দিক থেকে যেন একটা কান্নার গলা পাওয়া যাচ্চে—

ব্যাপার কি দেখিতে সকলে ছুটিয়া গেলেন।

সর্বজয়া মেয়েব উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিতেছে—ও দুগ্‌গা চা দিকি—ওমা ভাল ক'বে চা দিকি—ও দুগ্‌গা—

নীলমণি মুখুয্যে ঘবে ঢুকিয়া বলিলেন—কি হয়েচে—সরো সরো সব দিকি—আহা কি সব বাতাসটা বন্ধ ক'বে দাঁড়াও?

সর্বজয়া ভাসুব সম্পর্কের প্রবীন প্রতিবেশীর ঘরের মধ্যে উপস্থিতি ভুলিয়া গিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—ওগো, কি হোল, মেয়ে অমন করচে কেন?

দুর্গা আর চাহিল না।

আকাশের নীল আস্তরণ ভেদ করিয়া মাঝে মাঝে অনন্তের হাতছানি আসে—পৃথিবীর বুক থেকে ছেলেমেয়েবা চঞ্চল হইয়া ছুটিয়া গিয়া অনন্ত নীলিমার মধ্যে ডুবিয়া নিজেদের হারাইয়া ফেলে—পবিচিত ও গতানুগতিক পথের বহুদূব পারে কোন পথহীন পথে—দুর্গার অশান্ত, চঞ্চল প্রাণের বেলায় জীবনের সেই সর্বাপেক্ষা বড় অজানার ডাক আসিয়া পৌছিয়াছে।

তখন আবার শরৎ ডাক্তারকে ডাকা হইল। তিনি বলিলেন—

ম্যালেরিয়ার শেষ স্টেজটা আর কি—খুব জ্বরের পর যেমন বিরাম হয়েচে আর অমনি হার্টফেল ক'রে—ঠিক এরকম একটা case হ'য়ে গেল সেদিন দশঘরায়—

আধঘণ্টার মধ্যে পাড়ার লোকে উঠান ভাঙিয়া পড়িল।

হরিহর বাড়ীর চিঠি পায় নাই। জীবিকার সন্ধানে নানা স্থানে ঘুরিতে ঘুরিতে গোয়াড়ী কৃষ্ণনগরে সামান্য কিছু সুরাহা হইল। অনেকদিন পরে বাড়ী ফিরিতেছে, অপুর জন্য পদ্মপুরাণ, দুর্গার জন্য শাড়ি-আলতা ও সংসারের কিছু টুকিটাকি কিনিয়া লইল।

অন্যান্য বার বাড়ি ফিরিলে সর্বজয়া খুশি হয়, ছেলেমেয়েরা দৌড়াইয়া আসে। আজ তাহা হইল না। সর্বজয়া যেন অতিরিক্ত শান্ত, ছেলেমেয়েদের দেখা নাই। হরিহর ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিল—কৈ, অপু, দুগ্‌গা এরা বুঝি সব বেরিয়েছে?

সর্বজয়া আর কোনমতেই চাপিতে পারিল না। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল—ওগো দুগ্‌গা কি আর আছে গো? মা যে আমাদের ফাঁকি দিয়ে চলে গিয়েছে—এতদিন কোথায় ছিলে?

দেখিতে দেখিতে দিন কাটিয়া গেল। শীতকাল শেষ হইতে চলিয়াছে।

দোলের সময় নীলমনি রায়ের বড় ছেলে সুরেশ কলিকাতা হইতে আসিয়া প্রায় দিন দশেক বাড়ী রহিল। সুরেশ অপুরই বয়সী, ইংরাজী স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে। দেখিতে খুব ফর্সা নয়, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। নিয়মিত ব্যায়াম করে বলিয়া শরীর বেশ বলিষ্ঠ, স্বাস্থ্যবান। অপুর অপেক্ষা এক বৎসর মাত্র বয়স বেশী হইলেও আকৃতি ও গঠনে পনেরো ষোল বৎসরের ছেলের মত দেখায়।

অপু এখনো পর্যন্ত কোনো স্কুলে যায় নাই, সুরেশ তাহাকে লেখাপড়ার কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিয়াছে, আমি বাড়ীতে বাবার কাছে পড়ি। দোলের দিন গাঙ্গুলিদের পুকুরে বাঁধাঘাটে জলপাই-তলায় বসিয়া সুরেশ গ্রামের ছেলেদিগকে দিগ্বিজয়ী নৈয়ায়িক পণ্ডিতের ভঙ্গীতে এ প্রশ্ন ও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছিল। অপুকে বলিল—বলতো ইণ্ডিয়ার বাউণ্ডারী কি? জিওগ্রাফী জানো?

অপু বলিতে পারে নাই। সুরেশ আবার জিজ্ঞাসা করিল, অঙ্ক কি কষেচ? ডেসিমল ফ্র্যাক্‌শান কষতে পার?

অপু অতশত জানে না। না জানুক, তাহার সেই টিনের বাক্সটিতে বুঝি কম বই আছে?—একখানা নিত্যকর্মপদ্ধতি, একখানা পুরানো প্রাকৃতিক ভূগোল, একখানা শুভঙ্করী, পাতা-ছেঁড়া বীরাঙ্গনা কাব্য একখানা, মায়ের সেই মহাভারত—এই সব। সে ঐ সব বই পড়িয়াছে,—অনেকবার পড়া হইয়া গেলেও আবার পড়ে। তাহার বাবা প্রায়ই এখান ওখান হইতে চাহিয়া চিন্তিয়া বই আনিয়া দেয়,—ছেলে খুব লেখাপড়া শিখিবে, পণ্ডিত হইবে, তাহাকে মানুষ

করিয়া তুলিতে হইবে, এ বিষয়ে বিকারের রোগীর মত তাহার একটা অদম্য, অপ্রশমনীয় পিপাসা। সে বহুদিন হইতে 'বঙ্গবাসীর' গ্রাহক, অনেক দিনের পুরানো 'বঙ্গবাসী' তাহাদের ঘরে জমা আছে, ছেলে বড় হইলে পড়িবে এজন্য হরিহর সেগুলিকে সযত্নে বাণ্ডিল বাঁধিয়া তুলিয়া রাখিয়া দিয়াছিল, এখন সেগুলি কাজে লাগিতেছে। মূল্য দিতে না পারায় নূতন কাগজ আর তাহাদের আসে না, কাগজওয়ালারা কাগজ দেওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে। ছেলে যে এই 'বঙ্গবাসী' কাগজখানার জন্য কিরূপ পাগল, শনিবার দিনটা সকালবেলা খেলাধুলা ফেলিয়া কেমন করিয়া সে যে ভুবন মুখুয্যের চণ্ডীমণ্ডপে ডাকবাক্সটার কাছে পিওনের প্রত্যাশায় হাঁ করিয়া বসিয়া থাকে—হরিহর তাহা খুব জানে বলিয়াই ছেলের এত আদরের জিনিসটা যোগাইতে না পারিয়া তাহার বুকের ভিতর বেদনায় টন্‌টন্ করে।

সেদিন দুপুরে তাহার বাবা একটা কাগজের মোড়ক দেখাইয়া হাসিমুখে বলিল—দ্যাখো তো খোকা, কি বলো দিকি ?

অপু তাড়াতাড়ি বিছানার উপর উঠিয়া বসিল, উৎসাহের সুরে জিজ্ঞাসা করিল—খবরের কাগজ ? না বাবা ?

সেদিন রামকবচ লিখিয়া দিয়া বেহারী ঘোষের শাশুড়ীর নিকট যে তিনটি টাকা পাইয়াছে, স্ত্রীকে গোপন করিয়া হরিহর তারই মধ্যে দু'টাকা খবরের কাগজের দাম পাঠাইয়া দিয়াছিল; স্ত্রী জানিতে পারিলে অন্য পাঁচটা অভাবের গ্রাস হইতে টাকা দুইটাকে কোন মতেই বাঁচানো যাইত না।

অপু বাবার হাত হইতে তাড়াতাড়ি কাগজের মোড়কটা লইয়া খুলিয়া ফেলে। হ্যাঁ—খবরের কাগজ বটে। সেই বড় বড় অক্ষরে, 'বঙ্গবাসী' কথাটা লেখা, সেই নতুন কাগজের গন্ধটা, সেই ছাপা, সেই সব—যাহার জন্য বৎসর খানেক পূর্বে সে তীর্থের কাকের মত অধীর আগ্রহে ভুবন মুখুয্যেদের চণ্ডীমণ্ডপের ডাকবাক্সটার কাছে পিওনের অপেক্ষায় প্রতি শনিবারে হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিত।

খবরের কাগজ! খবরের কাগজ! কি সব নতুন খবর না জানি দিয়াছে? কি অজানা কথা সব লেখা আছে ইহার বড় বড় পাতায়?

একদিন রাণী বলিল—তোর খাতায় তুই কি লিখছিস্ রে?

অপু বিস্ময়ের সুরে বলিল—কোন্ খাতায়? তুমি কিঁ করে—

—আমি তোমাদের বাড়ী সেদিন দুপুরে যাইনি বুঝি? তুই ছিলিনে, খুড়িমার সঙ্গে কতক্ষণ ব'সে কথা বললাম। কেন, খুড়িমা তোকে বলে নি? তাই দেখলাম তোব বইএব দপ্তরে তোর সেই রাঙা খাতাখানায় কি সব লিখছিস্…আমার নাম রয়েচে, আর দেবী সিং না কি একটা—

অপু লজ্জায় লাল হইয়া বলিল—ও একটা গল্প।

—কি গল্প রে? আমায় কিন্তু পড়ে শোনাতে হবে।

পরদিন রাণী একখানা ছোট বাঁধানো খাতা অপুর হাতে দিয়া বলিল—এতে তুই আমাকে একটা গল্প লিখে দিস—একটা বেশ ভাল দেখে। দিবি তো? অতসী বল্‌ছিল তুই ভাল লিখতে পারিস নাকি! লিখে দে, আমি অতসীকে দেখাবো।

অপু রাত্রে বসিয়া বসিয়া খাতা লেখে। মাকে বলে—আর একটা পলা তেল দাও না মা। এইটুকুই লিখে রাখি আজ। তাহার মা বলে—আজ রাত্তিরে আর পড়ো না—মোটে দু পলা তেল আছে, কাল আবার রাঁধবো কি দিয়ে? এইখানে রাঁধছি, এই আলোতে ব'সে পড়। অপু ঝগড়া করে। মা বলে—এঃ, ছেলের রাত্তির হলে যত লেখা পড়ার চাড়্—সারাদিন চুলের টিকিটি দেখবার যো নেই। সকালে করিস কি? যা তেল দেব না।

অবশেষে অপু উনুনের পাশে কাঠের আগুনের আলোয় খাতাখানা আনিয়া বসে। সর্বজয়া ভাবে—অপু আর একটু বড় হলে আমি ওকে ভাল দেখে বিয়ে দেবো। এ ভিটেতে নতুন পাকা বাড়ী উঠবে। আসচে বছর পৈতেটা দিয়ে নি, তারপর গাঙ্গুলি বাড়ীর পুজোটা যদি বাঁধা হয়ে যায়—

···চার-পাঁচদিন পরে সে রাণীর হাতে খাতা ফিরাইয়া দিল। রাণী আগ্রহের সহিত খাতা খুলিতে খুলিতে বলিল—লিখেচিস্?

অপু হাসি হাসি মুখে বলিল—ত্যাখো না খুলে?

রাণী দেখিয়া খুশির সুরে বলিল—ওঃ অনেক লিখেচিস্ যে রে। দাঁড়া অতসীকে ডেকে দেখাই। অতসী দেখিয়া বলিল—অপু লিখেচে না আরো কিছু—ইস্। এ সব বই দেখে লেখা।

অপু প্রতিবাদের সুরে বলিল—ইঃ, বই দেখে বই কি? আমি তো গল্প বানাই···পটুকে জিজ্ঞেস ক'রো অতসী দি? ওকে বিকেলে গাঙের ধারে ব'সে ব'সে কত বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলিনে বুঝি?

রাণী বলিল—না ভাই, ও লিখেছে আমি জানি। ও ওই রকম লেখে। যাত্রার পালা লিখেছিল খাতাতে, আমায় পড়ে শোনালে। পরে অপুকে বলিল—নাম লিখে দিস্‌নি তোর? নাম লিখে দে।

অপু এবার একটু অপ্রতিভতার সুরে বলিল যে, গল্পটা তাহার শেষ হয় নাই, হইলেই নাম লিখিয়া দিবে এখন। 'সচিত্র যৌবনে-যোগিনী' নাটকের ধরনে গল্প আরম্ভ করিলেও শেষটা কিরূপ হইবে সে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারে নাই; দীর্ঘ দিন তাহার কাছে খাতা থাকিলেও রাণুদি—বিশেষ করিয়া অতসীদি তাহার কবিপ্রতিভা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া পড়ে, এই ভয়ে অসমাপ্ত অবস্থাতে ফেরৎ দিয়াছে।

মাস খানেক পরে একদিন। মাছ ধরিতে গিয়া একটা বড় সরপুঁটি মাছ কি করিয়া তাহার ছিপে উঠিয়া গেল।

লোভ পাইয়া সে জায়গাটা আর অপু ছাড়ে না—গাছের ডালপালা ভাঙিয়া আনিয়া বিছাইয়া বসে।

ক্রমে বেলা যায়, নদীর ধারের মাঠে আবার সেই অপূর্ব নীরবতা, ওপারের দেয়াড়ির মাঠের পারে সুদূরপ্রসারী সবুজ উলুবনে, কাশ-ঝোপে, কদম-শিমূল গাছের মাথায় আবার তাহার শৈশব পুলকের শুভমুহূর্তের অতি পরিচিত, পুরাতন সাথী—বৈকালের মিলাইয়া যাওয়া শেষ রোদ।

পিছন হইতে কে তাহার চোখ টিপিয়া ধরিল। সে জোর করিয়া

হাত দিয়া চোখ ছাড়াইয়া লইতেই পটু খিল্ খিল্ করিয়া সামনে আসিয়া বলিল—তোকে খুঁজে খুঁজে কোথাও পাইনি অপুদা; তারপর ভাবলাম তুই ঠিক মাছ ধর্তে এইছিস, তাই এলাম। মাছ হয় নি? ··একটাও না? চল্ বরং একখানা নৌকা খুলে নিয়ে বেড়িয়ে আসি—যাবে?

কদমতলায় সায়েরের ঘাটে অনেক দূরদেশ হইতে নৌকা আসে, দু'জনে তেঁতুলতলার ঘাট হইতে একখানা ছোট্ট-ডিঙি খুলিয়া লইয়া, তাহাকে এক ঠেলা দিয়া ডিঙির উপর চড়িয়া বসিল। নদীজলের ঠাণ্ডা আর্দ্রগন্ধ উঠিতেছে, কলমী-শাকের দামে জলটিপি বসিয়া আছে, চরের ধারে-ধারে চাষীরা পটোল ক্ষেত নিড়াইতেছে, কেহ ঘাস কাটিয়া আঁটি বাঁধিতেছে, চালতে-পোতার বাঁকে তীরবর্তী ঘন ঝোপে গাঙ্শালিকের দল কলরব করিতেছে, পড়ন্ত বেলায় পুব আকাশের গায়ে নানারঙের মেঘস্তূপ।

পটু বলিল—অপু-দা একটা গান কর না? সেই গানটা সেদিনের! অপু বলিল—সেটা নয়! বাবার কাছে সুর শিখে নিয়েছি খুব ভাল গানের। সেইটে গাইবো, আর-এট্টু ওদিকে গিয়ে কিন্তু ভাই, এখানে ডাঙায় ওই সব লোক রয়েচে—এখানে না।

—তুই ভারি লাজুক অপু-দা। কোথায় লোক রয়েচে কতদূরে, আর তোর গান গাইতে—দূর, ধর্ সেইটে!

খানিকটা গিয়া অপু গান শুরু করে। হঠাৎ পটু ঈশানকোণের দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিল—ও অপু-দা, কি রকম মেঘ উঠেছে দেখেচিস্? এখুনি ঝড় এলো ব'লে—নৌকা ফেরাবি?

অপু বলিল—হোক্‌গে ঝড়, ঝড়েই তো নৌকা বাইতে গান গাইতে লাগে ভালো, চল্ আরও যাই।

দেখিতে দেখিতে গাছপালা মাথা লুটাইয়া, দোলাইয়া, ভাঙিয়া ভীষণ কালবৈশাখীর ঝড় উঠিল।

পটু বলিল—বড্ড মুখোড় বাতাস অপুদা। আর নৌকা যাবে না। কিন্তু যদি উল্টে যায়? ভাগ্যিস সুনীলকে সঙ্গে করে আনি নি।
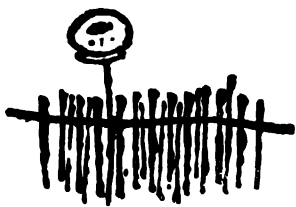
অপুর বিদেশ গমন পনের

আসলে অপু কিন্তু ঘুমায় নাই, সে জাগিয়াছিল। চোখ বুজিয়া শুইয়া মায়ের সঙ্গে বাবার যেসব কথাবার্তা হইতেছিল, সে সব শুনিয়াছে তাহারা এদেশের বাস উঠাইয়া কাশী যাইতেছে। এদেশ অপেক্ষা কাশীতে থাকিবার নানা সুবিধার কথা বাবা গল্প করিতেছিল মায়ের কাছে। বাবা অল্প বয়সে সেখানে অনেকদিন ছিল, সে দেশের সকলের সঙ্গে বাবার আলাপ ও বন্ধুত্ব, সকলে চেনে বা মানে। জিনিসপত্রও সস্তা। তাহার মা আগ্রহ প্রকাশ করিল, সে সব সোনার দেশে কখনও কাহারও অভাব নাই,—দুঃখ এদেশে বারোমাস লাগিয়াই আছে, সাহস করিয়া সেখানে যাইতে পারিলেই সব দুঃখ ঘুচিবে। মা আজ যাইতে পারিলেই আজই যায়, একদিনও আর থাকিবার ইচ্ছা নাই। শেষে স্থির হইল বৈশাখ মাসের দিকে তাহাদের যাওয়া হইবে।...

গঙ্গানন্দপুরের সিদ্ধেশ্বরী ঠাকুর-বাড়ীতে সর্বজয়ার পূজা মানত ছিল। ক্রোশ তিনেক দূরে কে পূজা দিতে যায়—এইজন্য এ পর্যন্ত মানত শোধ হয় নাই। এবার এদেশ হইতে যাইবার পূর্বে পূজা দিয়া যাওয়া দরকার, কিন্তু খুঁজিয়া লোক মিলিল না। অপু বলিল—সে পূজা দিয়া আসিবে, ও ঐ গ্রামে তাহার পিসিমা থাকেন, তাঁহার সহিত কখনও দেখাশোনা হয় নাই, অমনি দেখা করিয়া আসিবে। তাহার মা বলিল—যাঃ, বকিস নে তুই, একলা যাবি বৈ কি? এখান থেকে প্রায় চার ক্রোশ পথ।

অপু মায়ের সঙ্গে তর্ক শুরু করিল—আমি বুঝি সবদিন এই রকম

বাড়ীতে বসে থাকবো ? যেতে পারবো না কোথাও বুঝি ? আমার বুঝি চোখ নেই, কান নেই, পা নেই ?

অবশেষে কিন্তু অপুর নির্বন্ধাতিশয্যে তাহাকেই পাঠাইতে হইল।

সোনাডাঙা মাঠের বুক চিরিয়া উঁচু মাটির পথ। পথের দু'ধারে মাঠের মধ্যে শুধুই আকন্দফুলের বন, দীর্ঘ, শ্বেতাভ ডাঁটাগুলি ফুলের ভারে নত হইয়া দূর্বাঘাসের উপর লুটাইয়া পড়িয়াছে। পথে কোনো লোক নাই, দুপুরের অল্পই দেরী আছে, গাছপালার ছায়া ছোট হইয়া আসিতেছে।

হরিশপুরের মধ্যে ঢুকিয়া পথের ধারে একটা ছোট্ট চালাঘরে পাঠশালা বসিয়াছে, ছেলেরা সুর করিয়া নাম্‌তা পড়িতেছে, সে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল। গুরুমশায়ের বয়স বেশী নয়; তাহাদের গাঁয়ের প্রসন্ন গুরুমহাশয়ের চেয়ে অনেক কম।

বৈকালের দিকে গঙ্গানন্দপুরে গিয়া পৌঁছিল। পাড়ার মধ্যে পৌঁছিতেই কোথা হইতে রাজ্যের লজ্জা তাহাকে এমন পাইয়া বসিল যে, সে কোনো দিকে চাহিতেই পারিল না। কায়ক্লেশে সম্মুখের পথে দৃষ্টি রাখিয়া কোন রকমে পথ চলিতে লাগিল। তাহার মনে হইল সকলেই তাহার দিকে চাহিতেছে। সে যে আজ আসিবে তাহা যেন সকলেই জানে; হয়তো ইহারা এতক্ষণ মনে মনে বলিতেছে—এই সেই যাচ্ছে, দ্যাখ্‌ দ্যাখ্‌ চেয়ে। সেই যে পুঁটিলির ভিতর বাঁধিয়া নারিকেল-নাড়ু লইয়া যাইতেছে, তাহাও যেন সকলে জানে। তাহার পিসেমশাই কুঞ্জ চক্রবর্তীর বাড়ীটা কোন্‌দিকে একথাটা পর্যন্ত সে কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না।

অবশেষে এক বুড়ীকে নির্জনে পাইয়া তাহাকেই জিজ্ঞাসা করাতে সে বাড়ী দেখাইয়া দিল। বাড়ীটার সামনে পাঁচিল-ঘেরা। উঠানে ঢুকিয়া সে কাহারও সাক্ষাৎ পাইল না। দু' একবার কাশিল, মুখ দিয়া কথা বাহির হয় সাধ্য কি ? কতক্ষণ সে চৈত্রমাসের খররৌদ্রে বাহিরের ওঠানে দাঁড়াইয়া থাকিত ঠিকানা নাই, কিন্তু খানিকটা পরে একজন আঠারো উনিশ বছরের শ্যামবর্ণ মেয়ে কি কাজে বাহিরে

আসিয়া রোয়াকে পা দিতেই দেখিল—দরজার কাছে কাহাদের একটি অপরিচিত, প্রিয়দর্শন বালক পুঁটুলী হাতে লজ্জাকুণ্ঠিত-ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। মেয়েটি বলিল—তুমি কে খোকা? কোত্থেকে আসচো?—অপু অনাড়ির মত আগাইয়া আসিয়া অতিকষ্টে উচ্চারণ করিল—এঁই আমার বাড়ী—নিশ্চিন্দিপুরে, আমার—নাম অ-পু।

তাহার মনে হইতেছিল—না আসিলেই ভাল হইত। হয়তো তাহার পিসিমা তাহার এরূপ অপ্রত্যাশিত আগমনে বিরক্ত হইবে, হয়তো ভাবিবে কোথা হইতে আবার এক আপদ আসিয়া জুটিল।...তাহা ছাড়া,—কে জানিত আগে যে অপরিচিত স্থানে আসিয়া কথাবার্তা কওয়া এত কঠিন কাজ? তাহার কপাল ঘামিয়া উঠিল।

কিন্তু মেয়েটি তখনই ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া মহা-আদরে রোয়াকে উঠাইয়া লইয়া গেল। পিসি বলিতে সে যাহা ভাবিয়াছিল তাহা নয়, অল্প বয়স—রাজীর দিদির চেয়ে একটু বড়।

তাহার পিসিও তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল। জ্ঞাতি সম্পর্কে ভাইপোটি যে দেখিতে এত সুন্দর বা তাহার বয়স এত কম তাহার পিসি বোধ হয় ইতিপূর্বে জানিত না।

পরদিন সকালে উঠিয়া অপু পাড়ার পথে এদিক-ওদিক একটু ঘুরিয়া আসিল। চারিদিক জঙ্গলে ভরা, ফাঁকা জমি—দুর্বাঘাস প্রায় নাই, এমন জঙ্গল। এই একটা বাড়ী, আবার বনে-ঘেরা সুঁড়ি পথ বাহিয়া গিয়া আবার দূরে একটা বাড়ী। অনেক সময় লোকের বাড়ীর উঠানের উপর দিয়া পথ। তাহার বয়সী দু'চার জনকে খেলা করিতে দেখিল বটে, কিন্তু সকলেই তাহার দিকে এমন হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল যে, তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিবার চেষ্টা করা তো দূরের কথা, সে তাহাদের মুখের দিকে চাহিতে পারিল না।

পায়ে পায়ে সে অবশেষে বাড়ীতেই ফিরিয়া আসিল।

এক ছয় সাত বছরের মেয়ে একটা কাঁসার বাটি হাতে বাড়ী ঢুকিয়া উঠান হইতে ডাকিয়া কহিল—নাঁউ রেঁধেচো জেঠিমা, মোরে একটু দেবে?...অপুর পিসিমা ঘরের ভিতর হইতে বলিল—কে রে,

গুল্‌কী? না ওবেলা র'াধবো, এসে নিয়ে যাস্‌। গুল্‌কী বাটি নামাইয়া রোয়াকের ধারে দাঁড়াইয়া রহিল। মাথার চুলগুলো ঝাঁকড়া, ঝাঁকড়া, ছেলেদেব চুলের মতো খাটো। ময়লা কাপড় পরণে, মাথায় তেল নাই, রং শ্যামবর্ণ। অপুব দিকে চাহিয়া, কি বুঝিয়া একবার ফিক করিয়া হাসিয়া সে বাটি উঠাইয়া চলিয়া গেল।

অপু জিজ্ঞাসা কবিল—মেয়েটা কাদের পিসিমা?

তাহার পিসি বলিল—কে, গুল্‌কী? ওদের বাড়ী এখানে না —ওর মা-বাপ কেউ কোথাও নেই। নিবারণ মুখুয্যের বউ—এই যে পাশের বাড়ী, ওর দূব সম্পর্কের জেঠি—সেখানেই থাকে।

পুকুরে স্নান সারিয়া আসিয়া সে বসিয়া আছে, এমন সময় দেখিতে পাইল খিড়কী-দরজার আড়াল হইতে গুল্‌কী একবার একটু করিয়া উঁকি মারিতেছে আর একবার মুখ লুকাইতেছে। তাহার সহিত চোখাচোখি হওয়াতে গুল্‌কী ফিক্‌ করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

অপু ভাবিল—এর সঙ্গে কেউ খেলা করে না, একে নিয়ে একটু খেলি। আহা, মা-বাপ-হারা দুঃখী মেয়ে, আপন মনে বেড়ায়।— সে বলিল—খেলা করবি খুকী? চল ঐ পুকুরের পাড়ে। না, এক কাজ কর খুকী, আমি তোকে ধরবো—আর তুই ছুটে যাবি; ঐ কাঁঠালগাছটা বুড়ী। আয়—

গুল্‌কী আর না দাঁড়াইয়া আবার নীচু হইয়া দৌড় দিল। অপু চেঁচাইয়া বলিল—আচ্ছা যা, যা দেখি কদ্দুর যাবি—ঠিক তোকে ধরবো দেখিস্‌। আচ্ছা, ঐ গেলি তো এই ছাখ্‌—বলিয়া নিশ্বাস বন্ধ করিয়া সে এক দৌড় দিল—চু-উ-উ-উ- উ। গুল্‌কী পিছন দিকে চাহিয়া অপুকে দৌড়িতে দেখিয়া প্রাণপণে যতটুকু তাহার ক্ষুদ্র শক্তিতে কুলায় দৌড়িবার চেষ্টা করিল—কিন্তু অপু একটুখানি ছুটিয়া গিয়াই তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। ভারি ছুট্‌তে শিখিচিস খুকী, না? তা-কি তুই আমার সঙ্গে পারিস্‌। চল্‌ চোর চৌকিদার খেলা করবি—তুই হবি চোর—এই কাঁটাল পাতা চুরি করে পালাবি, বুঝলি?…আর আমি হবো চৌকিদাব, তোকে ধরবো।

গুল্‌কীর মুখে হাসি আর ধরিতেছিল না—হয়তো সে এতক্ষণ মনে মনে চাহিতেছিল এই সুন্দর ছেলেটির সঙ্গে ভাব করিতে।

শনিবারে সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরে অপু পূজা দিয়া আসিল। ঠাকুরের খুব লম্বা সাদা দাড়ি বুকের ওপর পড়িয়াছে, বেশ চেহারা।

পরদিন সন্ধ্যার কিছু আগে আহারাদি সারিয়া অপু গোয়ালা পাড়ার দিকে চলিল। আগের দিন তাহার পিসেমশায় ঠিক করিয়া দিয়াছে এ গ্রাম হইতে নবাবগঞ্জে তামাক বোঝাই গাড়ী যাইবে, সেই গাড়ীতে উঠিয়া সন্ধ্যার সময় রওনা হইলে সকালের দিকে নিশ্চিন্দিপুরের পথে তাহাকে উহারা নামাইয়া দিবে।

অল্পদূর গিয়া বামুনপাড়ার পথের মোড়ে গুল্‌কীর সঙ্গে দেখা। সে সন্ধ্যায় খেলা করিয়া বাড়ী ফিরিতেছে। অপু বলিল—বাড়ী চলে যাচ্ছি রে খুকী আজ—সারাদিন ছিলি কোথায়? খেলতে এলিনে, কিছু না—! পরে গুল্‌কীর অবিশ্বাসের হাসি দেখিয়া বলিল—সত্যিরে, সত্যি বল্‌চি, এই ছাখ্‌ পুঁটলী, কার্তিক গোয়ালার বাড়ী গিয়ে গাড়ী উঠবো—আয়-না আমার সঙ্গে এগিয়ে দিবি?

গুল্‌কী পিছনে পিছনে অনেক দূর চলিল। বামুন পাড়া ছাড়িয়া খানিকটা ফাঁকা মাঠ। তাহার পরেই গোয়ালপাড়া। গুল্‌কী মাঠের ধার পর্যন্ত আসিল। অপুর রাঙা সাটিনের জামাটার দিকে আঙুল দেখাইয়া কহিল—তোমার এই রাঙা জামাটা ক'পয়সা?

অপু হাসিমুখে বলিল—দু'টাকা—তুই নিবি? গুল্‌কী ফিক করিয়া হাসিল। অর্থাৎ—তুমি যদি দাও, এখখনি।

সেদিন পূর্ণিমা কি চতুর্দশী এমনি একটা তিথি। সে এদিকে আর কখনও আসে নাই, কিন্তু বাল্যের এই একা প্রথম বিদেশ-গমন-সম্পর্কিত একটা ছবি অনেক দিন পর্যন্ত তাহার মনে ছিল—সোজা মাঠের পথের দূর-প্রান্তে গাছপালার-ফাঁকে পূর্ণচন্দ্র উঠিতেছে, (বা চতুর্দশী চন্দ্র, তাহার ঠিক মনে ছিল না) পিছনে পিছনে অল্পদিনের পরিচিতা, অনাথা, অবোধ, ঝাঁকড়াচুল ছোট একটি মেয়ে তাহাকে আগাইয়া দিতে আসিয়াছে।

বৈশাখ মাসের প্রথমে হরিহর নিশ্চিন্দিপুর হইতে বাস উঠাইবার সব ঠিক করিয়া ফেলিল। যে জিনিসপত্র সঙ্গে করিয়া লইয়া যাওয়া চলিবে না, সেগুলি বিক্রয় করিয়া ফেলিয়া নানা খুচরা দেনা শোধ দিয়া দিল। সেকালের কাঁঠালকাঠের বড় তক্তপোষ, সিন্দুক, পিঁড়ি ঘরে অনেকগুলি ছিল, খবর পাইয়া ওপাড়া হইতে পর্যন্ত খরিদ্দার আসিয়া সস্তা দরে কিনিয়া লইয়া গেল।

রাণী কথাটা শুনিয়া অপুদের বাড়ী আসিল। অপুকে বলিল,—হ্যাঁরে অপু তোরা নাকি এ গাঁ ছেড়ে চ'লে যাবি? সত্যি?

অপু বলিল—সত্যি রাণুদি, জিজ্ঞেস্ করো মাকে—

তবুও রাণী বিশ্বাস করে না। শেষে সর্বজয়ার মুখে সব শুনিয়া রাণী অবাক হইয়া গেল। অপুকে বাহিরের উঠানে ডাকিয়া বলিল কবে যাবি রে?

—সামনের বুধবারের পরের বুধবারে।—আস্‌বি নে আর কখনো?

রাণীর চোখ অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, বলিল—তুই যে বলিস্ নিশ্চিন্দিপুর আমাদের বড় ভাল গাঁ, এমন নদী, এমন মাঠ কোথাও নেই—সে গাঁ ছেড়ে তুই যা'ব কি ক'রে?

অপু বলিল—আমি কি করবো, আমি তো আর বলিনি যাবার কথা। বাবার সেখানে বাস করবার মন, এখানে আমাদের চলে না যে? আমার লেখা খাতাটা তোমাকে দিয়ে যাবো রাণুদি। বড় হোলে হয়তো আবার দেখা হবে—

রাণী বলিল—আমার খাতাতে গল্পটাও শেষ করে দিলি নে, খাতায় নাম সইও কোরে দিলিনে, তুই বেশ ছেলে তো অপু?

চোখের জল চাপিয়া রাণী দ্রুতপদে বাটির বাহির হইয়া গেল। অপু বুঝিতে পারে না রাণুদি মিছামিছি কেন রাগ করে। সে কি নিজের ইচ্ছাতে দেশ ছাড়িয়া যাইতেছে?

স্নানের ঘাটে পটুর সঙ্গে অপুর কথা হইল। পটুও কথাটা জানিত না, অপুর মুখে সব শুনিয়া তাহার মনটা বেজায় দমিয়া গেল। ম্লানমুখে বলিল—তোর জন্যে নিজে জলে নেবে কত কষ্টে শেওলা সরিয়ে ফুট্ কাট্‌লাম, একদিন মাছ ধরবিনে তাতে?

চড়কের পর দিন জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা হইতে লাগিল। কাল দুপুরে আহারাদির পর রওনা হইতে হইবে।

সন্ধ্যার সময় রান্নাঘরের দাওয়ায় তাহার মা তাহাকে গরম গরম পরটা ভাজিয়া দিতেছিল। নীলমণি জ্যেঠার ভিটায় নারিকেল গাছটার পাতাগুলি জ্যোৎস্নার আলোয় চিক্‌চিক্ করিতেছে—চাহিয়া দেখিয়া অপুর মন দুঃখে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। এতদিন নতুন দেশে যাইবার জন্য তাহার যে উৎসাহটা ছিল, যতই যাওয়ার দিন কাছে আসিয়া পড়িতেছে, ততই আসন্ন বিরহের গভীর ব্যথায় তাহার মনের সুরটি করুণ হইয়া বাজিতেছে।

পরদিন দুপুর একটু গড়াইয়া গেলে হীরু গাড়োয়ানের গরুর গাড়ী রওনা হইল। সকালের দিকে আকাশে একটু একটু মেঘ ছিল বটে, কিন্তু বেলা দশটার পূর্বেই সেটুকু কাটিয়া গিয়া পরিপূর্ণ প্রচুর বৈশাখী মধ্যাহ্নের রৌদ্র গাছ-পালার পথে মাঠে যেন অগ্নিবৃষ্টি করিতেছে। পটু গাড়ীর পিছনে পিছনে অনেক দূর পর্যন্ত আসিতেছিল, বলিল—অপু-দা, এবার বারোয়ারীতে ভাল যাত্রাদলের বায়না হয়েছে, তুই শুনতে পেলিনে এবার। অপু বলিল—তুই পালার কাগজ একখানা বেশী ক'রে নিবি, আমায় পাঠিয়ে দিবি—

আবার সেই চড়কের মাঠের ধার দিয়া রাস্তা। মেলার চিহ্ন-স্বরূপ সারা মাঠটায় কাটা ডাবের খোলা গড়াগড়ি যাইতেছে, কাহারা মাঠের একপাশে রাঁধিয়া খাইতেছে, আগুনে কালো মাটির ঢেলা ও একপাশে কালিমাখা নতুন হাঁড়ি পড়িয়া আছে।

গ্রামের শেষ বাড়ী হইতেছে আতুরী বুড়ীর সেই দোচালা ঘরখানা, যতক্ষণ দেখা গেল অপু হাঁ করিয়া সেদিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পরই একটা বড় খেজুর-বাগানের পাশ দিয়া গাড়ী গিয়া একেবারে আষাঢ়ু যাইবার বাঁধা রাস্তার উপর উঠিল।• গ্রাম শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সর্বজয়ার মনে হইল যা কিছু দারিদ্র্য, যা কিছু হীনতা, যা কিছু অপমান সব রহিল পিছনে পড়িয়া—এখন সামনে শুধু নতুন সংসার, জীবনযাত্রা, নব সচ্ছলতা!

ক্রমে রৌদ্র পড়িল—গাড়ী তখন সোনাডাঙার মাঠের মধ্য দিয়া যাইতেছিল। হরিহর মাঠের মধ্যের একটা বড় বটগাছ দেখাইয়া কহিল—এই ছ্যাখো, ঠাকুরঝি পুকুরের ঠ্যাঙাড়ে বটগাছ। সর্বজয়া মুখ বাহির করিয়া দেখিল। পথ হইতে অল্প দূরেই একটা নাবাল জমির ধারে বিশাল বটগাছটা চারিধারে ঝুরি গাড়িয়া বসিয়া আছে।

হরিহর দূরের একটা গ্রাম আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—ওই হল ধঞ্চে-পলাশগাছি, ওরই ওপাশে নাটাবেড়ে—ওইখানে বনবিবির দরগা-তলায় শ্রাবণ মাসে ভারী মেলা হয়, এমন সস্তা কুমড়ো আর কোথাও মেলে না।

রাত্রি প্রায় দশটার সময় স্টেশনে আসিয়া গাড়ী পৌঁছিল। আজ অনেকক্ষণ হইতেই কখন গাড়ী স্টেশনে পৌঁছাইবে সেই আশায় অপু বসিয়াছিল, গাড়ী থামিতেই নামিয়া সে একদৌড়ে গিয়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে হাজির হইল। সন্ধ্যা সাড়ে আটটার ট্রেন অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছে, বাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়া সে জানিয়াছে সারা রাত্রির মধ্যে আর ট্রেন নাই ঐ হীরু গাড়োয়ানের গরু দুইটার জন্যই এরূপ ঘটিল, নতুবা এখনি সে ট্রেন দেখিতে পাইত। প্ল্যাটফর্মে একরাশ তামাকের গাঁট সাজানো—দু'জন রেলের লোক একটা লোহার বাক্স মত দেখিতে অথচ খুব লম্বা ডাণ্ডাওয়ালা কলে তামাকের গাঁট চাপাইয়া কি করিতেছে। জ্যোৎস্না পড়িয়া রেলের পাটি চিক্ চিক্ করিতেছে। ওদিকে রেল লাইনের ধারে একটা উঁচু খুঁটির গায়ে দুটা লাল আলো, এদিকে আবার ঠিক সেই রকম দুটা

লাল আলো। স্টেশনে ঘরে টেবিলের উপরে চৌপায়া তেলের লণ্ঠন জ্বলিতেছে এক রাশ বাঁধানো খাতাপত্র। অপু দরজার কাছে গিয়া খানিকটা দাঁড়াইয়া দেখিল, একটা, ছোট খড়মের বউলের মত জিনিস টিপিয়া স্টেশনের বাবু খট্‌ খট্‌ শব্দ করিতেছে।

প্ল্যাটফর্ম হইতে নড়িতে তাহার মন সরিতেছিল না। কিন্তু তাহার বাবা ডাকিতে আসিল। খড়মের বউলের মত জিনিসটাই নাকি টেলিগ্রাফের কল, তাহার বাবা বলিল।

সকাল সাড়ে সাতটায় ট্রেন আসিল। অপু গাড়ী দেখিবার জন্য প্ল্যাটফর্মের ধারে ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহার বাবা বলিল, খোকা, অত ঝুঁকে দাঁড়িয়ে থেকো না, সবে এসো এদিকে। একজন খালাসীও লোকজনদের হটাইয়া দিতেছিল।

কতবড় ট্রেনখানা! কি ভয়ানক শব্দ! হবিব্‌পুবেব বৌটি ঘোমটা খুলিয়া কৌতুহলের সহিত প্রবেশমান ট্রেনখানার দিকে চাহিয়াছিল।

গাড়ীতে হৈ হৈ কবিয়া মোট-ঘাট সব উঠানো হইল। কাঠের বেঞ্চি সব মুখোমুখি কবিয়া পাতা। গাড়ীর মেজেটা যেন সিমেণ্টের বলিয়া মনে হইল। ঠিক যেন ঘর একখানা; জানালা দবজা সব হুবহু! এই ভাবী গাড়ীখানা, যাহা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা যে আবার চলিবে, সে বিশ্বাস অপুব হইতেছিল না। কি জানি হয়তো নাও চলিতে পারে; হয়ত উহারা এখনই বলিতে পারে, ওগো তোমরা সব নামিয়া যাও, আমাদের গাড়ী আজ চলিবে না। তারের বেড়ার এদিকে একজন লোক একবোঝা উলুঘাস মাথায় করিয়া ট্রেনখানা চলিয়া যাওয়ার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়াছিল, অপুর মনে হইল লোকটা কৃপার পাত্র! আজিকাব দিনে যে গাড়ী চড়িল না সে বাঁচিয়া থাকিবে কি করিয়া? হীরু গাড়োয়ান ফটকে দাঁড়াইয়া গাড়ীর দিক চাহিয়া আছে।

গাড়ী চলিল। অদ্ভুত, অপূর্ব দুলনি! দেখিতে দেখিতে মাঝেরপাড়া স্টেশন্, লোকজন, তামাকের গাঁট, হাঁ করিয়া-দাঁড়াইয়া-থাকা হীরু গাড়োয়ান, সকলকে পিছনে ফেলিয়া গাড়ী বাইরের

উলুখড়ের মাঠে আসিয়া পড়িল। গাছগুলো সট্‌সট্‌ করিয়া দুদিকের জানালার পাশ কাটাইয়া ছুটিয়া পলাইতেছে—কী বেগ! এরই নাম রেলগাড়ী! উঃ! মাঠখানা যেন ঘুরাইয়া ফেলিতেছে। ঝোপঝাপ গাছপালা, উলুখড়ের ছাউনি ছোটো-খাটো চাষাদের ঘর সব একাকার করিয়া দিতেছে! গাড়ীর তলায় জাঁতা-পেষার মত একটানা শব্দ হইতেছে—সামনের দিকে ইঞ্জিনের কি শব্দ!

মাঝেরপাড়া স্টেশনের ডিস্‌ট্যান্ট সিগন্যালখানাও ক্রমে মিলাইয়া যাইতেছে। অনেকদিন আগের সে দিনটা।

সে ও দিদি যেদিন দু'জনে বাছুর খুঁজিয়া খুঁজিতে মাঠ-জলা ভাঙিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে রেলের রাস্তা দেখিতে ছুটিয়া গিয়াছিল! সেদিন—আর আজ?

ঐ যেখানে আকাশের তলে আষাঢ়ু-দুর্গাপুরের সড়কের গাছের সারি ক্রমশ দূরে হইতে দূরে গিয়া পড়িতেছে, ওরই ওদিকে যেখানে তাহাদের গাঁয়ের পথ বাঁকিয়া আসিয়া সোনাডাঙা মাঠের মধ্যে উঠিয়াছে, সেখানে পথের ঠিক সেই মোড়টিতে, গ্রামের প্রান্তের বুড়ো জামতলাটায় তাহার দিদি যেন ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া তাহাদের রেলগাড়ীর দিকে চাহিয়া আছে!...

তাহাকে কেহ লইয়া আসে নাই, সবাই ফেলিয়া আসিয়াছে, দিদি মারা গেলেও দু'জনের খেলা করার পথে ঘাটে বাঁশবনে আমতলায় সে দিদিকে যেন এতদিন কাছে কাছে পাইয়াছে, দিদির অদৃশ্য স্নেহস্পর্শ ছিল নিশ্চিন্দিপুরের ভাঙা কোঠাবাড়ীর গৃহ-কোণে—আজ কিন্তু সত্যসত্যই দিদির সহিত চিরকালের ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল!...

তাহার যেন মনে হয়, দিদিকে আর কেহ ভালবাসিত না, না নয়, কেউ নয়। কেহ তাহাকে ছাড়িয়া আসিতে দুঃখিত নয়।

হঠাৎ অপুর মন এক বিচিত্র অনুভূতিতে ভরিয়া গেল! তাহা দুঃখ নয়, শোক নয়, বিরহ নয়, তাহা কি সে জানে না। কত কি মনে আসিল অল্প এক মুহূর্তের মধ্যে...আতুরী ডাইনী...নদীর ঘাট...তাহাদের কোঠাবাড়ীটা...চালতে তলার পথ...রাণুদি...

কত বৈকাল, কত দুপুর…কতদিনের কত হাসি-খেলা…পটু…দিদির মুখ…দিদির কত না-মেটা সাধ…

দিদি এখনও একদৃষ্টে চাহিয়া আছে…

পরক্ষণেই তাহার মনের মধ্যের অবাক-ভাষা চোখের জলে আত্মপ্রকাশ করিয়া যেন এই কথাই বার বার বুলিতে চাহিল—আমি যাইনি দিদি, আমি তোকে ভুলিনি, ইচ্ছে ক'রে ফেলেও আসিনি—ওরা আমায় নিয়ে যাচ্ছে। সত্যই সে ভুলে নাই।

উত্তরজীবনে নীলকুন্তলা সাগরমেলা ধরণীর সঙ্গে তাহার খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটিয়াছিল। কিন্তু যখনই গতির পুলকে তাহার সারাদেহ শিহরিয়া উঠিতে থাকিত, সমুদ্রগামী জাহাজের ডেক হইতে প্রতি মুহূর্তে নীল আকাশের নব নব মায়ারূপ চোখে পড়িত, হয়তো দ্রাক্ষাকুঞ্জবেষ্টিত কোন নীল পর্বতসানু সমুদ্রের বিলীন চক্রবাল-সীমায় দূর হইতে দূরে ক্ষীণ হইয়া পড়িত, দূরের অস্পষ্ট আবছায়া দেখিতে-পাওয়া বেলাভূমি এক প্রতিভাশালী স্বরস্রষ্টার প্রতিভার দানের মত মহামধুর কুহকের সৃষ্টি করিত তাহার ভাবময় মনে—তখনই, এই সব সময়েই, তাহার মনে পড়িত এক ঘনবর্ষার রাতে, অবিশ্রান্ত বৃষ্টির শব্দের মধ্যে এক পুরানো কোঠার অন্ধকার ঘরে, রোগশয্যাগ্রস্ত এক পাড়াগাঁয়ের গরীব ঘরের মেয়ের কথা—

অপু, সেরে উঠলে আমায় একদিন রেলগাড়ী দেখাবি?

মাঝেরপাড়া স্টেশনের ডিস্ট্যান্ট সিগ্ন্যালখানা দেখিতে দেখিতে কতদূরে অস্পষ্ট হইতে হইতে শেষ মিলাইয়া গেল।

কাশী যাইবার পর বৎসর মাঘ মাসে হরিহর জ্বরে পড়িল। সামান্য জ্বর। কিন্তু দেখিতে দেখিতে অসুখ ঘোরালো হইয়া উঠিল। হাতে টাকা-পয়সা দেখিতে দেখিতে খরচ হইয়া গেল। দোতলায় নন্দবাবু সাহায্য না করিলে সর্বজয়াকে অত্যন্ত বিপদে পড়িতে হইত। কিন্তু এত করিয়াও কিছুতেই কিছু হইল না। একদিন ঘোর শীতের শেষ রাত্রে হরিহর মারা গেল।

সর্বজয়া অথৈ জলে পড়িল। দেখিবার কেহ নাই। খাইবার

সংস্থান নাই—অপুর নিষ্পাপ সরল মুখের দিকে তাকাইয়া তাহার বুক কি এক আশংকায় সংকুচিত হইয়া আসে। এমন বিপদে সে আর কখনো পড়ে নাই। কাহার উপর সে ভরসা করিবে?

মাসখানেক পরে কেদার ঘাটের এক ভদ্রলোক তাঁহার পরিচিত এক ধনী পরিবারে কাজের জন্য একজন ব্রাহ্মণকন্যার খোঁজ করিতেছিলেন। সর্বজয়ার সংবাদ পাইয়া তিনি তাহাদেরই সেখানে পাঠাইতে রাজী হইলেন। সর্বজয়া অকূল সমুদ্রে কূল পাইয়া গেল।

সর্বজয়া রাঁধুনী হিসাবে কাজে ভর্তি হইল। এত বড় কাণ্ড-কারখানা সে পূর্বে কখনো দেখে নাই। দুই বেলায় তিন সের তেলের খরচ। তাহার ছোট সংসারের অভিজ্ঞতা লইয়া সে অবাক হয়।

অপু সুখে-দুঃখে মানুষ হইতে লাগিল। রাঁধুনীর ছেলে বলিয়া কেহ তাহাকে খুব একটা আমল দেয় না। কেবল মেজ বৌ-রাণীর মেয়ে লীলার সহিত তাহার খুব ভাব হইয়া গেল। সে তাহাকে ছবির বই দেখাইত, নিজের দুধ হইতে ভাগ দিত—তাহাদের ঘরে আসিয়া গল্প করিত। প্রায় সমবয়সী দুইজনের ভিতর কোন বাধার প্রাচীর ছিল না। অপুর মতই লীলাও বই পড়িতে খুব ভালবাসে। অপু লেখে শুনিয়া লীলা তাহাকে একটা ঝর্ণা কলম একেবারে দিয়া দিল। অপু ভারী খুশী হইল। মেজ বৌ-রাণী কলিকাতায় থাকেন। কিছুদিন পরে লীলা কলিকাতায় চলিয়া গেল।

নিশ্চিন্দিপুরের জন্য অপুর প্রাণ কেমন করে। এখানে আর থাকিতে ইচ্ছা করে না। তাহাদের ভিটায় এতদিন বুঝি জঙ্গল গজাইয়া গেল। এমন সুন্দর পাখীডাকা মায়াময় বৈকালগুলি কি বৃথাই বহিয়া যাইবে? কোনদিন কি তারা নিশ্চিন্দিপুরে ফিরিবে না?

সে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানায়—তোমার পায়ে পড়ি ঠাকুর, আমাকে নিশ্চিন্দিপুরে ফিরিয়ে নাও। আর কিছু আমি চাই নে।"

॥ শেষ ॥

অপুর গাঁয়ে ফেরা এক

সেদিন সে স্কুল হইতে ফিরিয়া তাহাদের ঘরটাতে ঢুকিতেই তাহার মা বলিল, অপু, আগে খাবার খেয়ে নে। আজ একখানা চিঠি এসেছে, দেখাচ্ছি।

অপু বিস্মিতমুখে বলিল, চিঠি? কোথায়? কে দিয়েচে মা?

কাশীতে তাহার বাবার মৃত্যুর পর হইতে এ পর্যন্ত আজ আড়াই বৎসরের উপর এ বাড়িতে তাহারা আসিয়াছে, কই, কেহ তো একখানা পোস্টকার্ডে এক ছত্র লিখিয়া তাহাদের খোঁজ করে নাই? লোকের যে পত্র আসে, একথা তাহারা তো ভুলিয়াই গিয়াছে।

সে বলিল, কই দেখি?

পত্র—তা আবার খামে। খামটার উপরে মায়ের নাম লেখা। সে তাড়াতাড়ি পত্রখানা খাম হইতে বাহির করিয়া অধীর আগ্রহের সহিত সেখানাকে পড়িতে লাগিল। পড়া শেষ করিয়া বুঝিতে-না-পারার দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, ভবতারণ চক্রবর্তী কে মা?—পরে পত্রের উপরকার ঠিকানাটা আর একবার দেখিয়া বলিল, কাশী থেকে লিখেচে।

সর্বজয়া বলিল, তুই তো ওঁকে নিশ্চিন্দিপুরে দেখেচিস্। সেই সেবার গেলেন, দুগ্‌গাকে পুতুলের বাক্স কিনে দিয়ে গেলেন, তুই তখন সাত বছরের। মনে নেই তোর? তিনদিন ছিলেন আমাদের বাড়ি।

—জানি মা, দিদি বলতো তোমার জ্যাঠামশায় হন—না? তা এতদিন তো আর কোনও—

—আপন নয়; দূর সম্পর্কের। জ্যাঠামশায় তো দেশে বড় একটা

থাকতেন না, কাশী-গয়া ঠাকুর দেবতার জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন, এখনও বেড়ান। ওঁদের দেশ হচ্চে মনসাপোতা, আড়ংঘাটার কাছে। সেখান থেকে ক্রোশ দুই—সেবার আড়ংঘাটার যুগল দেখ্‌তে গিয়ে ওঁদের বাড়ি গিয়েছিলাম দু'দিন। বাড়িতে মেয়ে-জামাই থাকত। সে মেয়ে-জামাই তো লিখেচেন মারা গিয়েচে—ছেলেপিলে কারুর নেই—

অপু বলিল, হ্যাঁ, তাই তো লিখেচেন। নিশ্চিন্দিপুরে গিয়ে আমাদের খোঁজ করেচেন। সেখানে শুনেচেন কাশী গিইচি। তারপর কাশীতে গিয়ে আমাদের সব খবর জেনেচেন। এখানকার ঠিকানা নিয়েচেন বোধ হয় রামকৃষ্ণ মিশন থেকে।

সর্বজয়া হাসিয়া বলিল—আমি দুপুরবেলা খেয়ে একটু বলি গড়াই—ক্ষেমি ঝি বললে তোমার একখানা চিঠি আছে। হাতে নিয়ে দেখি আমার নাম—আমি তো অবাক হয়ে গেলাম—তারপর খুলে পড়ে দেখি এই—নিতে আসবেন লিখেচেন শীগ্‌গির। ছাখ্‌ দিকি কবে আসবেন লেখা আছে কিছু?

অপু বলিল, বেশ হয়, না মা? এদের এখানে একদণ্ডও ভাল লাগে না। তোমার খাটুনিটা কমে—সেই সকালে উঠে রান্না-বাড়ি ঢোকা, আর দুটো তিনটে—

ব্যাপারটা এখনও সর্বজয়া বিশ্বাস করে নাই। আমার গৃহ মিলিবে, আশ্রয় মিলিবে, নিজের মনোমত ঘর গড়া চলিবে। বড়লোকের বাড়ির এ রাঁধুনীবৃত্তি—এ ছন্নছাড়া জীবনযাত্রার কি এতদিনে—বিশ্বাস হয় না। অদৃষ্ট তেমন নয় বলিয়া ভয় করে।

দুপুরের পর সে মায়ের পাতে ভাত খাইতে বসিয়াছে, এমন সময় দুয়ারের সামনে কাহার ছায়া পড়িল। চাহিয়া দেখিয়া সে ভাতের গ্রাস আর মুখে তুলতে পারিল না।

লীলা!

পরক্ষণেই লীলা হাসিমুখে ঘরে ঢুকিল; কিন্তু অপুর দিকে চাহিয়া সে যেন একটু অবাক হইয়া গেল। অপুকে যেন আর চেনা

যায় না—সে তো দেখিতে বরাবরই সুন্দর, কিন্তু এই দেড় বৎসরে কি হইয়া উঠিয়াছে সে? কি গায়ের রং, কি মুখের শ্রী, কি সুন্দর স্বপ্ন-মাখা চোখদুটি! লীলার যেন একটু লজ্জা হইল। বলিল, উঃ! আগের চেয়ে মাথাতে কত বড় হয়ে গিয়েচ!

লীলার সম্বন্ধেও অপুর ঠিক সেই কথাই মনে হইল। এ যেন সে লীলা নয়, যাহার সঙ্গে সে দেড় বৎসর পূর্বে অবাধে মিলিয়া মিশিয়া কত গল্প ও খেলা করিয়াছে। তাহার তো মনে হয় না লীলার মত সুন্দরী মেয়ে সে কোথাও দেখিয়াছে—রাণুদিও নয়। খানিকক্ষণ সে যেন চোখ ফিরাইতে পারিল না।

দু'জনেই যেন একটু সঙ্কোচ বোধ করিতে লাগিল।

অপু বলিল, তুমি কি ক'রে এলে? আমি আজ সকালেও জিজ্ঞেস করিচি! নিস্তারিণী মাসী বললে, তুমি আসবে না, এখন স্কুলের ছুটি নেই—সেই বড়দিনের সময় নাকি আসবে?

লীলা বলিল, আমার কথা তোমার মনে ছিল?

—না, তা কেন? তারপর এতদিন পরে বুঝি—বেশ—একেবারে ডুমুরের ফুল—

—ডুমুরের ফুল আমি, না তুমি? খোকামণির ভাতের সময় তোমাকে যাওয়ার জন্যে চিঠি লেখালাম ঠাকুরমায়ের কাছে, এ বাড়ির সবাই গেল, যাও নি কেন?

অপু এসব কথা কিছুই জানে না। তাহাকে কেহ বলে নাই। জিজ্ঞাসা করিল, খোকামণি কে?

লীলা বলিল, বাঃ আমার ভাই! জানো না?…এই এক বছরের হলো।

লীলার জন্য অপুর মনে একটু দুঃখ হইল। লীলা জানে না যাহাকে সে এত আগ্রহ করিয়া ভাইয়ের অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, এ বাড়িতে তাহার স্থান কোথায় বা অবস্থা কি। সে বলিল—দেড় বছর আসো নি—না? পড়চ কোন ক্লাসে?

লীলা তক্তপোশের কোণে বসিয়া পড়িল। বলিল, আমি

আমার কথা কিছু বলবো না আগে—আগে তোমার কথা বলো। তোমার মা ভাল আছেন? তুমিও তো পড়ো—না?

—আমি এবারে মাইনর ক্লাসে উঠবো—পরে একটু গর্বিত মুখে বলিল, আর বছর ফার্স্ট হয়ে ক্লাসে উঠেচি, প্রাইজ দিয়েচে।

লীলা অপুর দিকে চাহিল। বেলা তিনটার কম নয়। এত বেলায় সে খাইতে বসিয়াছে? বিস্ময়ের সুরে বলিল, এখন খেতে বসেচ, এত বেলায়?

অপুর লজ্জা হইল। সে সকালে সরকারদের ঘরে বসিয়া খাইয়া স্কুলে যায়—শুধু ডাল-ভাত,—তাও শ্রীকণ্ঠ ঠাকুর বেগার-শোধ ভাবে দিয়া যায়, খাইয়া পেট ভরে না, স্কুলেই ক্ষুধা পায়, সেখান হইতে ফিরিয়া মায়ের পাতে ভাত ঢাকা থাকে, বৈকালে তাহাই খায়। আজ ছুটির দিন বলিয়া সকালেই মায়ের পাতে খাইতে বসিয়াছে।

অপু ভাল করিয়া উত্তর দিতে পারিল না বটে, কিন্তু লীলা ব্যাপারটা কতক না বুঝিল এমন নহে। ঘরের হীন আসবাব পত্র, অপুর হীন বেশ—অবেলায় নিরুপকরণ দু'টি ভাত সাগ্রহে খাওয়া—লীলার কেমন যেন মনে বড় বিঁধিল। সে কোন কথা বলিল না।

অপু বলিল, তোমার সব বই এনেচ এখেনে? দেখাতে হবে আমাকে। ভাল গল্প কি ছবির বই নেই?

লীলা বলিল, তোমার জন্যে কিনে এনেচি আসবার সময়। তুমি গল্পের বই ভালোবাসো ব'লে একখানা 'সাগরের কথা' এনেচি, আর দু-তিনখানা এনেচি। আনচি, তুমি খেয়ে ওঠো।

অপুর খাওয়া প্রায় শেষ হইয়াছিল, খুশিতে বাকিটা কোনো রকমে শেষ করিয়া উঠিয়া পড়িল। লীলা লক্ষ্য করিয়া দেখিল সে পাতের সবটা এমন করিয়া খাইতেছে, পাতে একটা দানাও পড়িয়া নাই। সঙ্গে সঙ্গে তাহার উপর লীলার কেমন একটা অপূর্ব মনের ভাব হইল—সে ধরনের অনুভূতি লীলার জীবনে এই প্রথম, আর কাহারও সম্পর্কে সে ধরনের কিছু তো কখনও হয় নাই।

একটু পরে লীলা অনেক বই আনিল। অপুর মনে হইল, লীলা

কেমন করিয়া তাহার মনের কথাটি জানিয়া, সে যাহা পড়িতে জানিতে ভালবাসে সেই ধরনের বইগুলি আনিয়াছে। 'সাগরের কথা' বইখানিতে অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প। সাগরের তলায় বড় বড় পাহাড় আছে, আগ্নেয়গিরি আছে, প্রবাল নামক এক প্রকার প্রাণী আছে, দেখিতে গাছপালার মত—কোথায় এক মহাদেশ নাকি সমুদ্রের গর্ভে ডুবিয়া আছে—এই সব।

লীলা একখানা পুরাতন খাতা দেখাইল। তাহার ঝোঁক ছবি আঁকিবার দিকে; বলিল—সেই তোমায় একবার ফলগাছ এঁকে দেখতে দিলাম মনে আছে? তারপর কত এঁকেচি দেখবে?

অপুর মনে হইল লীলার হাতের আঁকা আগের চেয়ে এখন ভাল হইয়াছে। সে নিজে একটা রেখা কখনো সোজা করিয়া টানিতে পারে না— ড্রইংগুলি দেখিতে দেখিতে লীলার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বেশ এঁকেচো তো। তোমাদের ইস্কুলে করায়, না এমনি আঁকো?

এতক্ষণ পরে অপুর মনে পড়িল লীলা স্কুলে পড়ে, কোন্ ক্লাসে পড়ে সে কথা কিছুই জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। বলিল—তোমাদের কি ইস্কুল? এবার কোন্ ক্লাসে পড়চো?

—এবার মাইনর সেকেণ্ড ক্লাসে উঠেচি—'গিরিন্দ্রমোহিনী গার্লস্ স্কুল' আমাদের বাড়ির পাশেই—

অপু বলিল, জিজ্ঞেস করবো?

লীলা হাসি মুখে ঘাড় নাড়িয়া চুপ করিয়া রহিল।

অপু বলিল, আচ্ছা বলো—চট্টগ্রাম কর্ণফুলির মোহনায়—কি ইংরেজি হবে?

লীলা ভাবিয়া বলিল, চিট্টাগং ইজ্ অন্ দি মাউথ অফ্ দি কর্ণফুলি।

অপু বলিল, ক'জন মাস্টার তোমাদের সেখেনে?

—আটজন, হেড মিস্ট্রেস্ এন্ট্রান্স পাশ আমাদের গ্রামার পড়ান। পরে সে বলিল—মা'র সঙ্গে দেখা করবে না?

—এখন যাবো, না একটু পরে যাবো? বিকেলে যাবো এখন, সেই ভালো।—তাহার পরে সে একটু থামিয়া বলিল, তুমি শোন নি লীলা, আমরা যে এখান থেকে চলে যাচ্চি।

লীলা আশ্চর্য হইয়া অপুর দিকে চাহিল। বলিল—কোথায়?

আমার এক দাদামশায় আছেন, তিনি এতদিন পরে আমাদের খোঁজ পেয়ে তাঁদের দেশের বাড়িতে নিয়ে যেতে এসেচেন।

অপু সংক্ষেপে সব বলিল।

লীলা বলিয়া উঠিল—চলে যাবে? বাঃ রে।

হয়তো সে কি আপত্তি করিতে যাইতেছিল, কিন্তু পরক্ষণেই বুঝিল, যাওয়া না-যাওয়ার উপর অপুর তো কোনও হাত নাই, কোনও কথাই এক্ষেত্রে বলা চলিতে পারে না।

খানিকক্ষণ কেহই কথা বলিল না।

লীলা বলিল, তুমি বেশ এখানে থেকে ইস্কুলে পড়ো না কেন? সেখানে কি ইস্কুল আছে? পড়বে কোথায়? সে তো পাড়াগাঁ।

—আমি থাকতে পারি কিন্তু মা তো আমায় এখানে রেখে থাকতে পারবে না, নইলে আর কি—

—না হয় এক কাজ কর না কেন? কল্‌কাতায় আমাদের বাড়ি থেকে পড়বে। আমি মাকে বলবো, অপু আমাদের বাড়িতে থাকবে; বেশ সুবিধে—আমাদের বাড়ির সামনে আজকাল ইলেকট্রিক ট্রাম হয়েছে—এঞ্জিন্‌ও নেই, ঘোড়াও নেই, এমনি চলে—তারের মধ্যে বিদ্যুৎ পোরা আছে, তাতে চলে।

—কি রকম গাড়ি? তারের ওপর দিয়ে চলে?

—একটা ডাণ্ডা আছে। তারে ঠেকে থাকে, তাতেই চলে। কলকাতা গেলে দেখবে এখন—ছ-সাত বছর হ'ল ইলেকট্রিক ট্রাম হয়েছে, আগে ঘোড়ায় টানতো—

আরও অনেকক্ষণ দু'জনে কথাবার্তা চলিল।

বৈকালে সর্বজয়ার জ্যাঠামশায় ভবতারণ চক্রবর্তী আসিলেন। অপুকে কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। ঠিক করিলেন,

দুইদিন পরে বুধবারের দিন লইয়া যাইবেন। অপু দু-একবার ভাবিল লীলার প্রস্তাবটা একবার মায়ের কাছে তোলে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কথাটা আর কার্যে পরিণত হইল না।

সকালের রৌদ্র ফুটিয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই উলা স্টেশনে গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল। এখান হইতে মনসাপোতা যাইবার সুবিধা। ভবতারণ চক্রবর্তী পূর্ব হইতেই পত্র দিয়া গরুর গাড়ির ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। কাল রাত্রে একটু কষ্ট হইয়াছিল। 'এক্সপ্রেস্ ট্রেনখানা দেরিতে পৌছানোর জন্য ব্যাণ্ডেল হইতে নৈহাটির গাড়িখানা পাওয়া যায় নাই। ফলে বেশী রাত্রে নৈহাটিতে আসিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতে হইয়াছিল।

সারারাত্রি জাগরণের ফলে অপু কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল সে জানে না। চক্রবর্তী মহাশয়ের ডাকে উঠিয়া জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিল একটা স্টেশনের প্লাটফর্মে গাড়ি লাগিয়াছে। সেখানেই তাদের নামিতে হইবে। কুলিরা ইতিমধ্যে তাহাদের কিছু জিনিসপত্র নামাইয়াছে।

গরুর গাড়িতে উঠিয়া চক্রবর্তী মহাশয় অনবরত তামাক টানিতে লাগিলেন। বয়স সত্তরের কাছাকাছি হইবে, একহারা পাতলা চেহারা, মুখে দাড়ি গোঁফ নাই, মাথার চুল সব পাকা। বলিলেন—জয়া, ঘুম পাচ্ছে না তো?

সর্বজয়া হাসিয়া বলিল, আমি তো নৈহাটিতে ঘুমিয়ে নিইচি আধঘণ্টা অপুও ঘুমিয়েচে। আপনারই ঘুম হয় নি—

চক্রবর্তী মহাশয় খুব খানিকটা কাশিয়া লইয়া বলিলেন,—ওঃ, সোজা খোঁজটা করেচি তোদের! আর-বছর বোশেখে মেয়েটা গেল মারা, হরিধন তো তার আগেই। এই বয়েসে হাত পুড়িয়ে রেঁধেও খেতে হয়েচে,—কেউ নেই সংসারে। তাই ভাবলাম হরিহর বাবাজীর তো নিশ্চিন্দিপুর থেকে উঠে যাবার ইচ্ছে ছিল অনেকদিন থেকেই, যাই এখানেই নিয়ে আসি একটু ধানের জমি আছে, গৃহদেবতার সেবাটাও হবে। গ্রামে ব্রাহ্মণ তেমন নেই,—আর

আমি তো এখানে থাকব না। আমি একটু কিছু ঠিক ক'রে দিয়েই কাশী চলে যাবো। একরকম ক'রে হরিহর নেবেন চালিয়ে। তাই গেলাম নিশ্চিন্দিপুরে—

সর্বজয়া বলিল, আপনি বুঝি আমাদের কাশী যাওয়ার কথা শোনেন নি?

—তা কি ক'রে শুনবো? তোমাদের দেশে গিয়ে শুনলাম, তোমরা নেই সেখানে। কেউ তোমাদের কথা বলতে পারে না—সবাই বলে তারা এখান থেকে বেচে-কিনে তিন-চার বছর হ'ল কাশী চলে গিয়েচে। তখন কাশী যাই। কাশীতে আমি আজ দশ বছর। খুঁজতেই সব বেরিয়ে পড়লো। হিসেব ক'রে দেখলাম হরিহর যখন মারা যান, তখন আমিও কাশীতেই আচি, অথচ কখনো দেখাশুনো হয় নি, তা হলে কি আর—

অপু আগ্রহের সুরে বলিল, নিশ্চিন্দিপুরে আমাদের বাড়িটা কেমন আছে, দাদামশায়?

—সেদিকে আমি গেলাম কৈ। পথেই সব খবর পেলাম কি-না। আমি আর সেখানে দাঁড়াই নি। কেউ ঠিকানা দিতে পারলে না। ভুবন মুখুয্যে মশায় অবিশ্যি খাওয়া-দাওয়া করতে বললেন আর তোমার বাপের একশো নিন্দে—বুদ্ধি নেই, সাংসারিক জ্ঞান নেই—হেন-তেন। যাক্ সে সব কথা, তোমরা এলে ভাল হল। যে ক'ঘর যজমান আছে তোমাদের বছর তাতে কেটে যাবে। পাশেই তেলিরা বেশ অবস্থাপন্ন, তাদের ঠাকুর প্রতিষ্ঠা আছে। আমি পুজোটুজো করতাম অবিশ্যি, সেটাও হাতে নিতে হবে ক্রমে। তোমাদের নিজেদের জিনিস দেখে শুনে নিতে হবে।

উলা গ্রামের মধ্যেও খুব বন, গ্রাম ছাড়াইয়া মাঠের পথেও বনঝোপ। সূর্য আকাশে অনেকখানি উঠিয়া গিয়াছে। চারিধারে প্রভাতী রৌদ্রের মেলা, পথের ধারে বনতুলসীর জঙ্গল, মাঠের ঘাসে এখনও স্থানে স্থানে শিশির জমিয়া আছে, কোন্ রূপকথার দেশের মাকড়সা যেন রূপালী জাল বুনিয়া রাখিয়াছে। মাঝে মাঝে কিসের

একটা গন্ধ, বিশেষ কোনো ফুলের গন্ধ নয় কিন্তু। শিশিরসিক্ত ঘাস, সকালের বাতাস, অড়হরের ক্ষেত, এখানে ওখানে বনজ গাছপালা, সবসুদ্ধ মিলাইয়া একটা সুন্দর সুগন্ধ।

অনেক দিন পরে এই সব গাছপালার প্রথম দর্শনে অপুর প্রাণে একটা উল্লাসের ঢেউ উঠিল। অপূর্ব, অদ্ভুত, সুতীব্র, মিনমিনে ধরনের নয়, পান্‌সে পান্‌সে জোলো ধরনের নয়। অপুর মন সে শ্রেণীরই নয় আদৌ, তাহা সেই শ্রেণীর যাহা জীবনের সকল আবেদনকে, ঐশ্বর্যকে প্রাণপণে নিংড়াইয়া চুষিয়া আঁটিসার করিয়া খাইবার ক্ষমতা রাখে। অল্পেই নাচিয়া ওঠে, অল্পেই দমিয়াও যায় —যদিও পুনরায় নাচিয়া উঠিতে বেশী বিলম্ব করে না।

মনসাপোতা গ্রামে যখন গাড়ি ঢুকিল তখন বেলা দুপুর। সর্বজয়া ছইয়ের পিছন দিকের ফাঁক দিয়া চাহিয়া দেখিতেছে তাহার নূতনতম জীবনযাত্রা আরম্ভ করিবার স্থানটা কি রকম। তাহার মনে হইল গ্রামটাতে লোকের বাস একটু বেশী, একটু যেন ঠেসাঠেসি, ফাঁকা জায়গা বেশী নাই, গ্রামের মধ্যে বেশী বনজঙ্গলের বালাইও নাই। একটা কাহাদের বাড়ি, বাহির-বাটীর দাওয়ায় জনকয়েক লোক গল্প করিতেছিল, গোরুর গাড়িতে কাহারা আসিতেছে দেখিয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। উঠানে বাঁশের আলনায় মাছ ধরিবার জাল শুকাইতে দিয়াছে। বোধ হয় গ্রামের জেলেপাড়া।

আরও খানিক গিয়া গাড়ি দাঁড়াইল। ছোট উঠানের সামনে একখানি মাঝারি গোছের চালা ঘর, দু'খানা ছোট্ট দোচালা ঘর, উঠানে একটা পেয়ারা গাছ ও একপাশে একটা পাতকুয়া। বাড়ির পিছনে একটা তেঁতুল গাছ—তাহার ডালপালা বড় চালাঘরখানার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। সামনের উঠানটা বাঁশের জাফরি দিয়া ঘেরা। চক্রবর্তী মহাশয় গাড়ি হইতে নামিলেন। অপু মা'কে হাত ধরিয়া নামাইল।

চক্রবর্তী মহাশয় আসিবার সময় যে তেলিবাড়ির উল্লেখ করিয়াছিলেন; বৈকালের দিকে তাহাদের বাড়ির সকলে দেখিতে

আসিল। তেলি-গিন্নী খুব মোটা, রং বেজায় কালো। সঙ্গে চার পাঁচটি ছেলেমেয়ে, দু'টি পুত্রবধূ। প্রায় সকলেরই হাতে মোটা মোটা সোনার অনন্ত দেখিয়া সর্বজয়ার মন সম্ভ্রমে পূর্ণ হইয়া উঠিল ; ঘরের ভিতর হইতে দু'খানা কুশাসন বাহির করিয়া আনিয়া সলজ্জ ভাবে বলিল, আসুন আসুন, বসুন।

তেলি-গিন্নী পায়ের ধূলা লইয়া প্রমাণ করিলে ছেলেমেয়ে ও পুত্রবধূরাও দেখাদেখি তাহাই করিল। তেলি গিন্নি হাসিমুখে বলিল, দুপুরবেলা এলেন মা-ঠাকরুণ একবার বলি যাই। এই যে পাশেই বাড়ি, তা আসতে পেলাম না। মেজছেলে এল গোয়াড়ী থেকে—গোয়াড়ী দোকান আছে কি-না। মেজ বৌমার মেয়েটা ন্যাওটো, মা দেখতে ফুরসৎ পায় না, দুপুরবেলা আমাকে একেবারে পেয়ে বসে—ঘুম পাড়াতে বেলা দুটো। ঘুঙ্ড়ি কাশি, গুপী কবরেজ বলছে ময়ূরপুচ্ছ পুড়িয়ে মধু দিয়ে খাওয়াতে। তাই কি সোজাসুজি পুড়্লে হবে মা, চৌষট্টি ফৈজৎ—কাঁসার ঘটির মধ্যে পোরো, তা ঘুঁটের জাল করো, তা ঢিমে আঁচে চড়াও হ্যাঁরে হাজীরা, ভোঁদা গোয়াড়ী থেকে কাল মধু এনেছে কি-না জানিস ?

বড় পুত্রবধূ এতক্ষণ কথা বলে নাই। সে ইহাদের মত হুড্ বার্নিস নয়, বেশ টকটকে রং। বোধ হয় শহর-অঞ্চলেব মেয়ে। এ-দলের মধ্যে সে-ই সুন্দরী, বয়স বাইশ-তেইশ হইবে। সে নীচের ঠোঁটের কেমন চমৎকার এক প্রকার ভঙ্গি করিয়া বলিল, এঁরা এসেচেন সারাদিন খাওয়া-দাওয়া হয় নি, এঁদের আজকের সব ব্যবস্থা তো করে দিতে হবে ? বেলাও তো গিয়েছে, এঁরা আবার রান্না করবেন।

এই সময় অপু বাড়ির উঠানে ঢুকিল। সে আসিয়াই গ্রামখানা বেড়াইয়া দেখিতে বাহিরে গিয়েছিল। তেলি গিন্নী বলিল—কে মা-ঠাকরুণ ? ছেলে বুঝি ? এই এক ছেলে ? বাঃ চেহারা যেন রাজপুত্তুর।

সকলেরই চোখ তাহার উপর পড়িল। অপু উঠানে ঢুকিয়াই

এতগুলি অপরিচিতের সম্মুখে পড়িয়া কিছু লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। পাশ কাটাইয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিতেছিল, তাহার মা বলিল, দাঁড়া না এখেনে। ভারি লাজুক ছেলে মা—এখন ওইটুকুতে দাঁড়িয়েছে—আর এক মেয়ে ছিল, তা—সর্বজয়ার গলার স্বর ভারী হইয়া আসিল। গিন্নী ও বড় পুত্রবধূ একসঙ্গে বলিল, নেই, হ্যাঁ মা? সর্বজয়া বলিল, সে কি মেয়ে মা। আমায় ছলতে এসেছিল, কি চুল, কি চোখ, কি মিষ্টি কথা? বকো-ঝকো, গাল দাও, মা'র মুখে উঁচু কথাটি কেউ শোনে নি কোন দিন।

ছোটবৌ বলিল, কত বয়সে গেল মা?

—এই তেরোয় পড়েই—ভাদ্রমাসে তেরোয় পড়ল, আশ্বিন মাসের ৭ই—দেখতে দেখতে চার বছর হয়ে গেল।

তেলি-গিন্নী দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া কহিল—আহা মা, তা কি করবে বলো সংসারে থাকতে গেলে সবই...

আট দশ দিন কাটিয়া গেল ; সর্বজয়া ঘরবাড়ি মনের মত করিয়া সাজাইয়াছে। দেওয়াল উঠান নিকাইয়া পুঁছিয়া লইয়াছে। নিজস্ব ঘরদোর অনেকদিন ছিল না, নিশ্চিন্দিপুর ছাড়িয়া অবধিই নাই—এতদিন পরে একটা সংসারেব সমস্ত ভার হাতে পাইয়া সে গত চার বৎসরের সঞ্চিত সাধ মিটাইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

সকলের তাগিদে শীঘ্রই অপু পূজার কাজ আরম্ভ করিল—দু'টি একটি করিয়া কাজকর্ম আরম্ভ হইতে হইতে ক্রমে এপাড়ায় ওপাড়ায় অনেক বাড়ি হইতেই লক্ষ্মীপূজায় মাকালপূজায় তাহার ডাক আসে। অপু মহা উৎসাহে প্রাতঃস্নান করিয়া উপনয়নের চেলীর কাপড় পরিয়া নিজের টিনের বাক্সের বাংলা নিত্যকর্মপদ্ধতিখানা হাতে লইয়া পূজা করিতে যায়। পূজা করিতে বসিয়া আনাড়ীর মত কোন্ অনুষ্ঠান করিতে কোন্ অনুষ্ঠান করে। পূজার কোন পদ্ধতি জানে না—বার বার বইয়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখে কি লেখা আছে—'বজ্রায় হুঃ' বলিবার পর শিবের মাথায় বজ্রের কি গতি করিতে হইবে 'ওঁ ব্রহ্মপৃষ্ঠ ঋষি সুতলছন্দঃ কূর্মো দেবতা' বলিয়া কোন্ মুদ্রায়

আসনের কোণ কি ভাবে ধরিতে হইবে—কোন রকমে-গোঁজামিল দিয়া কাজ সারিবার মত পটুত্বও তাহার আয়ত্ত হয় নাই, সুতরাং পদে পদে আনাড়ীপণাটুকু ধরা পড়ে।

একদিন সেটুকু বেশী করিয়া ধরা পড়িল ওপাড়ার সরকারদের বাড়ি। যে ব্রাহ্মণ তাহাদের বাড়িতে পূজা করিত, সে কিজন্য রাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, গৃহদেবতার নারায়ণের পূজার জন্য তাহাদের লোক অপুকে ডাকিয়া লইয়া গেল। বাড়ির বড় মেয়ে নিরুপমা পূজার যোগাড় করিয়া দিতেছিল, চৌদ্দ বছরের ছেলেকে চেলী পরিয়া পুঁথি বগলে গম্ভীর মুখে আসিতে দেখিয়া সে একটু অবাক্ হইল। জিজ্ঞাসা করিল, তুমি পুজো করতে পারবে? কি নাম তোমার? চক্কত্তি মশায় তোমার কে হন? মুখচোরা অপুর মুখে বেশী কথা যোগাইল না, লাজুক মুখে সে গিয়া আনাড়ীর মত আসনের উপর বসিল।

পূজা কিছুদূর অগ্রসর হইতে না হইতে নিরুপমার কাছে পূজারীর বিদ্যা ধরা পড়িয়া গেল। নিরুপমা হাসিয়া বলিল, ওকি? ঠাকুর নামিয়ে আগে নাইয়ে নাও, তবে তো তুলসী দেবে?—অপু থতমত খাইয়া ঠাকুর নামাইতে গেল।

নিরুপমা বসিয়া পড়িয়া বলিল—উঁহু, তাড়াতাড়ি ক'রো না। এই টাটে আগে ঠাকুর নামাও—আচ্ছা, এখন বড় তাম্র কুণ্ডুতে জল ঢালো—

অপু ঝুঁকিয়া পড়িয়া বইয়ের পাতা উল্টাইয়া স্নানের মন্ত্র খুঁজিতে লাগিল। তুলসীপত্র পরাইয়া শালগ্রামকে সিংহাসনে উঠাইতে যাইতেছে, নিরুপমা বলিল, ওকি? তুলসীপাতা উপুড় ক'রে পরাতে হয় বুঝি? চিৎকরে ক'রে পরাও—

ঘামে রাঙামুখ হইয়া কোন রকমে পূজা সাঙ্গ করিয়া অপু চলিয়া আসিতেছিল, নিরুপমা ও বাড়ির অন্যান্য মেয়েরা তাহাকে আসন পাতিয়া বসাইয়া ভোগের ফলমূল ও সন্দেশ জলযোগ করাইয়া তবে ছাড়িয়া দিল।

বর্ষাকালের মাঝামাঝি অপু একদিন মাকে বলিল যে, সে স্কুলে পড়িতে যাইবে।

সর্বজয়া আশ্চর্য হইয়া তার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, কোন ইস্কুলে রে?

—কেন, এই তো আড়বোয়ালেতে বেশ ইস্কুল রয়েচে।

—সে তো এখন থেকে যেতে-আসতে চার ক্রোশ পথ। সেখেনে যাবি হেঁটে পড়তে?

সর্বজয়া কথাটা তখনকার মত উড়াইয়া দিল বটে, কিন্তু ছেলের মুখে কয়েকদিন ধরিয়া বার বার কথাটা শুনিয়া সে শেষে বিরক্ত হইয়া বলিল, যা খুশি করো বাপু, আমি জানি নে। তোমরা কোনো কালে কারুর কথা তো শুনলে না? শুনবেও না—সেই একজন নিজের খেয়ালে সারাজন্ম কাটিয়ে গেল, তোমারও তো সে ধারা বজায় রাখা চাই। ইস্কুলে পড়বো। ইস্কুলে পড়বি তো এদিকে কি হবে? দিব্যি একটা যাহোক দাঁড়াবার পথ তবু হয়ে আসছে—এখন তুমি দাও ছেড়ে—তারপর ইদিকেও যাক্, ওদিকেও যাক্—

দুই-এক দিনের মধ্যে সে মায়ের কাছে কথাটা আবার তুলিল। একবার শুধু তোলা নয়, নিতান্ত নাছোড়বান্দা হইয়া পড়িল। আড়বোয়ালের স্কুল দুই ক্রোশ দূরে, তাই কি? সে খুব হাঁটিতে পারিবে এটুকু। সে বুঝি চিরকাল এই রকম চাষাগাঁয়ে বসিয়া বসিয়া ঠাকুরপুজো করিবে? বাহিরে যাইতে পারিবে না বুঝি।

তবু আরও মাস দুই কাটিল। স্কুলের পড়াশোনা সর্বজয়া বোঝে না, সে যাহা বোঝে তাহা পাইয়াছে। তবে আবার ইস্কুলে পড়িয়া কি লাভ? বেশ তো সংসার গুছাইয়া উঠিতেছে। আর বছর কয়েক পরে ছেলের বিবাহ—তারপরই একঘর মানুষের মত মানুষ।

সর্বজয়ার স্বপ্ন সার্থক হইয়াছে।

কিন্তু অপুর তাহা হয় নাই। তাহাকে ধরিয়া রাখা গেল না—শ্রাবণের প্রথমে সে আড়বোয়ালের মাইনর স্কুলে ভর্তি হইয়া যাতায়াত শুরু করিল।

এই পথের কথা সে জীবনে কোনদিন ভোলে নাই—এই একটি বৎসর ধরিয়া কি অপরূপ আনন্দই পাইয়াছিল—প্রতিদিন সকালে-বিকেলে এই পথ হাঁটিবার সময়টাতে।…নিশ্চিন্দিপুর ছাড়িয়া অবধি এত আনন্দ আর হয় নাই।

ক্রোশ দুই পথ। দুধারে বট, তুতের ছায়া, ঝোপঝাপ, মাঠ, মাঝে মাঝে অনেকখানি ফাঁকা আকাশ। স্কুলে বসিয়া অপুর মনে হইত সে যেন একা কত দূর বিদেশে আসিয়াছে, মন চঞ্চল হইয়া উঠিত—ছুটির পরে নির্জন পথে বাহির হইয়া পড়িত। বৈকালের ছায়ায় ঢ্যাঙা তাল খেজুর গাছগুলো যেন দিগন্তের আকাশ ছুইতে চাহিতেছে—পিড়িং পিড়িং পাখির ডাকে—হু-হু মাঠের হাওয়ায় পাকা ফসলের গন্ধ আসিতেছে—সর্বত্র একটা মুক্তি, একটা আনন্দের বার্তা…

কিন্তু সর্বাপেক্ষা সে আনন্দ পাইত পথ-চল্‌তি লোকজনের সঙ্গে কথা কহিয়া। কত ধরনের লোকের সঙ্গে পথে দেখা হইত—কত দূর-গ্রামের লোক পথ দিয়া হাঁটিত, কত দেশের লোক কত দেশে যাইত। অপু সবেমাত্র একা পথে বাহির হইয়াছে, বাহিরের পৃথিবীটার সহিত নতুন ভাবে পরিচয় হইতেছে, পথে ঘাটে সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়া তাহাদের কথা জানিতে তাহার প্রবল আগ্রহ। পথ চলিবার সময়টা এইজন্য বড়ো ভাল লাগে, সাগ্রহে সে ইহার প্রতীক্ষা করে, স্কুলের ছুটির পর পথে নামিয়াই ভাবে—এইবার গল্প শুনবো। পরে ক্ষিপ্রপদে আগাইয়া আসিয়া কোনো অপরিচিত লোকের নাগাল ধরিয়া ফেলে। প্রায়ই চাষালোক, হাতে হুঁকোকল্কে। অপু জিজ্ঞাসা করে—কোথায় যাচ্ছ, হ্যাঁ কাকা? চলো আমি মনসাপোতা পর্যন্ত তোমার সঙ্গে যাবো। মামজোয়ান গিইচিলে—তোমাদের বাড়ি বুঝি? না? শিক্‌ড়ে? নাম শুনেচি, কোন্‌দিকে জানি নে। কি খেয়ে সকালে বেরিয়েচ, হ্যাঁ কাকা?…

তারপর সে নানা খুঁটিনাটি কথা জিজ্ঞেস করে—কেমন সে গ্রাম, ক'ঘর লোকের বাস, কোন্ নদীর ধারে? ক'জন লোক তাদের বাড়ি, কত ছেলে-মেয়ে তারা কি করে?…

কত গল্প, কত গ্রামের কিংবদন্তী, সেকাল-একালের কত কথা, পল্লীগৃহস্থের কত সুখদুঃখের কাহিনী—সে শুনিয়াছিল এই এক বৎসরে। সে চিরদিন গল্প পাগলা, গল্প শুনিতে শুনিতে আহার-নিদ্রা ভুলিয়া যায়—যত সামান্য ঘটনাই হোক, তাহার ভাল লাগে।

সেদিন সে স্কুলে গিয়া দেখিল স্কুলশুদ্ধ লোক বেজায় সন্ত্রস্ত। মাস্টাররা এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতেছেন। স্কুল-ঘর গাঁদা ফুলের মালা দিয়া সাজানো হইতেছে, তৃতীয় পণ্ডিত মহাশয় খামোকা একটা সুবৃহৎ সিঁড়িভাঙা ভগ্নাংশ কষিয়া নিজের বোর্ড পুরাইয়া রাখিয়াছেন। হঠাৎ আজ স্কুলঘরের বারান্দা ও কম্পাউণ্ড এত সাফ করিয়া রাখা হইয়াছে যে, যাহারা বারোমাস এস্থানের সহিত পরিচিত, তাহাদের বিস্মিত হইবার কথা। হেডমাস্টার ফণীবাবু খাতাপত্র এ্যাডমিশন বুক, শিক্ষকগণের হাজিরা বই লইয়া মহা ব্যস্ত। সেকেণ্ড পণ্ডিতকে ডাকিয়া বলিলেন, ও অমূল্যবাবু, চৌঠো তারিখে খাতায় যে নাম সই করেন নি? আপনাকে ব'লে ব'লে আর পারা গেল না। দেরিতে এসেছিলেন তো খাতায় সই ক'রে ক্লাসে গেলেই হত? সব মনে থাকে, এইটের বেলাতেই—

অপু শুনিল একটার সময় ইন্সপেক্টর আসিবেন স্কুল দেখিতে। ইন্সপেক্টর আসিলে কি করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে হইবে, তৃতীয় পণ্ডিত মহাশয় ক্লাসের ছেলেদের সে বিষয়ে তালিম দিতে লাগিলেন।

বারোটার কিছু পূর্বে একখানা ঘোড়ার গাড়ি আসিয়া স্কুলের সামনে থামিল। হেডমাস্টার তখনও ফাইল দুরস্ত শেষ করিয়া উঠিতে পারেন নাই বোধ হয়—তিনি এত সকালে ইন্সপেক্টর আসিয়া পড়াটা প্রত্যাশা করেন নাই, জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া গাড়ি দেখিতে পাইয়াই উঠি-পড়ি অবস্থায় ছুটিলেন। তৃতীয় পণ্ডিত মহাশয় হঠাৎ তড়িৎস্পৃষ্ট ভেকের মত সজীব হইয়া উঠিয়া তারস্বরে ও মহা উৎসাহে (অন্যদিন এই সময়টাই তিনি ক্লাসে বসিয়া মাধ্যাহ্নিক নিদ্রাটুকু উপভোগ করিয়া থাকেন) দ্রব পদার্থ কাহাকে বলে তাহার

বর্ণনা আরম্ভ করিলেন। পাশের ঘরে সেকেণ্ড পণ্ডিত মহাশয়ের হুঁকোর শব্দ অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সহিত বন্ধ হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উচ্চকণ্ঠ শোনা যাইতে লাগিল। শিক্ষক বলিলেন, মতি, তোমরা অবশ্যই কমলালেবু দেখিয়াছ, পৃথিবীর আকার—এই হরেন—কমলালেবুর ন্যায় গোলাকাব—

হেডমাস্টারের পিছনে পিছনে ইন্সপেক্টর ঘরে ঢুকিলেন। বয়স চল্লিশ বিয়াল্লিশ বৎসব হইবে, বেঁটে, গৌরবর্ণ, সাটিন জিনের লম্বা কোট গায়ে, সিল্কের চাদর গলায়, পায়ে সাদা ক্যাম্বিসের জুতা, চোখে চশমা। গলার স্বর ভারী। প্রথমে তিনি অফিস-ঘরে ঢুকিয়া খাতাপত্র অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখার পরে বাহির হইয়া হেডমাস্টারের সঙ্গে ফার্ষ্ট ক্লাসে গেলেন। অপুর বুক টিপ্ টিপ্ করিতেছিল। এইবার তাহাদের ক্লাসে আসিবার পালা। তৃতীয় পণ্ডিত মহাশয় গলার সুর আর এক গ্রাম চড়াইলেন।

ইন্সপেক্টর ঘরে ঢুকিয়া বোর্ডের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা কবিলেন, এরা কি ভগ্নাংশ ধরেছে ? তৃতীয় পণ্ডিত মহাশয়ের মুখ আত্মপ্রসাদে উজ্জ্বল দেখাইল ; বলিলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, ছ' ক্লাসে আমিই অঙ্ক কষাই কি না। ও ক্লাসেই অনেকটা এগিয়ে দিই—সরল ভগ্নাংশটা শেষ করে ফেলি—

ইন্সপেক্টর এক এক করিয়া বাংলা রিডিং পড়িতে বলিলেন। পড়িতে উঠিয়াই অপুর গলা কাঁপিতে লাগিল। শেষের দিকে তাহার পড়া বেশ ভাল হইতেছে বলিয়া তাহার নিজেরই কানে ঠেকিল। পরিষ্কার সতেজ বাঁশির মত গলা। রিন্‌রিনে মিষ্টি।

—বেশ, বেশ রিডিং। কি নাম তোমার ?

তিনি আরও কয়েকটি প্রশ্ন করিলেন। তারপর সবগুলি ক্লাস একে একে ঘুরিয়া আসিয়া জলের ঘরে ডাব ও সন্দেশ খাইলেন। তৃতীয় পণ্ডিত মহাশয় অপুকে বলিলেন, তুই হাতে ক'রে এই ছুটির দরখাস্তখানা নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে থাক, তোকে খুব পছন্দ করেছেন,

যেমন বাইরে আসবেন, অমনি দরখাস্তখানা হাতে দিবি—দু'দিন ছুটি চাইবি—তোর কথায় হয়ে যাবে—এগিয়ে যা।

ইন্সপেক্টর চলিয়া গেলেন। তাঁহার গাড়ি কিছুদূর যাইতে না যাইতে ছেলেরা সমস্বরে কলরব করিতে করিতে স্কুল হইতে বাহির হইয়া পড়িল। হেডমাস্টার ফণীবাবু অপুকে বলিলেন, ইন্সপেক্টরবাবু খুব সন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছেন তোমার ওপর। বোর্ডের এগ্‌জামিন দেওয়াবো তোমাকে দিয়ে—তৈরী হও, বুঝলে?

বোর্ডের পরীক্ষা দিতে মনোনীত হওয়ার জন্য যত না হউক ইন্সপেক্টরের পরিদর্শনেব জন্য দু'দিন স্কুল বন্ধ থাকিবার আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সে বাড়ির দিকে রওনা হইল। অন্য দিনের চেয়ে দেরি হইয়া গিয়াছে। অর্ধেক পথ চলিয়া আসিয়া পথের ধারে একটা সাঁকোর উপর বসিয়া মায়ের দেওয়া খাবারের পুটুলি খুলিয়া রুটি নারিকেলকোরা ও গুড় বাহির করিল। এইখানটাতে বসিয়া রোজ সে স্কুল হইতে ফিরিবার পথে খাবার খায়। রাস্তার বাঁকের মুখে সাঁকোটা, হঠাৎ কোনো দিক হইতে দেখা যায় না, একটা বড় তুঁত-গাছের ডালপালা নত হইয়া ছায়া ও আশ্রয় দুই-ই যোগাইতেছে। সাঁকোর নীচে আমরুল শাকের বনের ধারে একটু একটু জল বাধিয়াছে, মুখ বাড়াইলে জলে ছায়া পড়ে। অপুর কেমন একটা অস্পষ্ট ভিত্তিহীন ধারণা আছে যে, জলটা মাছে ভর্তি, তাই সে একটু একটু রুটির টুক্‌রা উপর হইতে ফেলিয়া দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখে মাছ ঠোক্‌রাইতেছে কি না।

সাঁকোর নীচের জলে হাত মুখ ধুইতে নামিতে গিয়া হঠাৎ তাহাব চোখ পড়িল। একজন ঝাঁকড়া-চুল কালো-মত লোক রাস্তার ধারের মাঠে নামিয়া লতা-কাঠি কুড়াইতেছে। অপু কৌতূহলী হইয়া চাহিয়া রহিল। লোকটা খুব লম্বা নয়, বেঁটে ধরনের, শক্ত হাত পা, পিঠে একগাছা বড় ধনুক, একটা বড় বোঁচকা, মাথার চুল লম্বা লম্বা, গলায় রাঙা ও সবুজ হিংলাজের মালা। সে অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়া ডাকিয়া বলিল, ওখানে কি খুঁজচো। পরে লোকটির সঙ্গে তাহার

আলাপ হইল। সে জাতিতে সাঁওতাল, অনেক দূরে কোথায় ডুমকা জেলা আছে, সেখানে বাড়ি। অনেক দিন বর্ধমানে ছিল, বাঁকা বাঁকা বাংলা বলে, পায়ে হাঁটিয়া সেখান হইতে আসিতেছে। গন্তব্য স্থান অনির্দেশ্য—এরূপে যতদূর যাওয়া যায় যাইবে, সঙ্গে তীর ধনুক আছে, পথের ধারে বনে মাটে যাহা শিকার মেলে—তাহাই খায়। সম্প্রতি একটা কি পাখি মারিয়াছে, মাঠের কোন ক্ষেত হইতে গোটাকয়েক বড় বড় বেগুনও তুলিয়াছে—তাহাই পুড়াইয়া খাইবার যোগাড়ে শুক্‌নো লতা-কাঠি কুড়াইতেছে। অপু বলিল, কি পাখি দেখি? লোকটা ঝোলা হইতে বাহির করিয়া দেখাইল একটা বড় হরিয়াল ঘুঘু। সত্যিকারের তীর ধনুক—যাহাতে সত্যিকারের শিকার সম্ভব হয়—অপু কখনও দেখে নাই। বলিল, দেখি একগাছা তীর তোমার? পরে হাতে লইয়া দেখিল, মুখে শক্ত লোহার ফলা, পিছনে বুনোপাখির পালক বাঁধা—অদ্ভুত কৌতূহলপ্রদ ও মুগ্ধকর জিনিস!—

—আচ্ছা এতে পাখি মরে, আর কি মরে?

লোকটা উত্তর দিল, সবই মারা যায়—খরগোস, শিয়াল, বেঁজী, এমন কি বাঘ পর্যন্ত। তবে বাঘ মারিবার সময় তীরের ফলায় অন্য একটা লতার রস মাখাইয়া লইতে হয়।...তাহার পর সে তুঁত গাছতলায় শুক্‌না পাতা-লতার আগুন জ্বালিল। অপুর পা আর সেখান হইতে নড়িতে চাহিল না—মুগ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল, লোকটা পাখিটার পালক ছাড়াইয়া আগুনে ঝলসাইতে দিল, বেগুনগুলাও পুড়াইতে দিল।

বেলা অত্যন্ত পড়িলে অপু বাড়ি রওনা হইল। আহার শেষ করিয়া লোকটা তখন তাহার বোঁচকা ও তীর ধনুক লইয়া রওনা হইয়াছে। এ রকম মানুষ সে তো কখনো দেখে নাই। বাঃ—যেদিকে দুই চোখ যায় সেদিকে যাওয়া—পথে পথে তীর ধনুক দিয়া শিকার করা, বনের লতাপাতা কুড়াইয়া গাছতলায় দিনের শেষে বেগুন পুড়াইয়া খাওয়া! গোটা আষ্টেক বড় বড় বেগুন সামান্য একটু নুনের

ছিটা দিয়া গ্রাসের পর গ্রাস তুলিয়া কি করিয়াই নিমেষের মধ্যে সাবাড় করিয়া ফেলিল !···

মাস কয়েক কাটিয়া গেল। সকালবেলা স্কুলের ভাত চাহিতে গিয়া অপু দেখিল রান্না চড়ানো হয় নাই। সর্বজয়া বলিল, আজ যে কুলুইচণ্ডী পূজো—আজ স্কুলে যাবি কি ক'রে?···ওরা বলে গিয়েচে ওদের পূজোটা সেরে দেওয়ার জন্যে—পূজোবারে কি আর স্কুলে যেতে পারবি? বড্ড দেরী হয়ে যাবে।

—হ্যাঁ, তাই বৈ কি? আমি পূজো করতে গিয়ে স্কুল কামাই করি আর কি? আমি ওসব পারবো না, পূজোটুজো আমি আর করব কি ক'রে, রোজই তো পূজো লেগে থাকবে আর আমি বুঝি রোজ রোজ—তুমি ভাত নিয়ে এস, আমি ওসব শুনছিনে—।

—লক্ষ্মী বাবা আমার। আচ্ছা, আজকের দিনটা পূজোটা সেরে নে। ওরা বলে গিয়েচে ওপাড়াসুদ্ধ পূজো হবে। চাল পাওয়া যাবে এক ধামার কম নয়, মানিক আমার কথা শোনো, শুনতে হয়।

অপু কোন মতেই কথা শুনিল না। অবশেষে না খাইয়াই স্কুলে চলিয়া গেল। সর্বজয়া ভাবে নাই যে, ছেলে সত্যসত্যই তাহার কথা ঠেলিয়া না খাইয়া স্কুলে চলিয়া যাইবে। যখন সত্যই বুঝিতে পারিল তখন তাহার চোখের জল বাধা মানিল না। ইহা সে আশা করে নাই।

অপু স্কুলে পৌঁছিতেই হেডমাস্টার ফণীবাবু তাহাকে নিজের ঘরে ডাক দিলেন। ফণীবাবুর ঘরেই স্থানীয় ব্রাঞ্চ পোস্ট-অফিস, ফণীবাবুই পোস্টমাস্টার। তিনি তখন ডাকঘরের কাজ করিতেছিলেন। বলিলেন, এসো অপূর্ব, তোমার নম্বর দেখবে? আজ ইন্সপেক্টর অফিস থেকে পাঠিয়ে দিয়েচে—বোর্ডের এগ্‌জামিনে তুমি জেলায় প্রথম হয়েচ—পাঁচ টাকার একটা স্কলারশিপ পাবে যদি আরো পড়ো তবে। পড়বে তো?

এই সময় তৃতীয় পণ্ডিত মহাশয় ঘরে ঢুকিলেন। ফণীবাবু বলিলেন

ওকে সে কথা এখন বললাম পণ্ডিতমশাই। জিজ্ঞেস করচি আরও পড়বে তো?

তৃতীয় পণ্ডিত বলিলেন, পড়বে না, বাঃ। হীরের টুক্‌রো ছেলে, স্কুলের নাম রেখেছে। ওরা যদি না পড়ে তো পড়বে কে, কেষ্ট তেলির বেটা গোবর্ধন? কিচ্ছু না, আপনি ইন্সপেক্টর অফিসে লিখে দিন যে, ও হাই স্কুলে পড়বে ওর আবার জিজ্ঞেসটা কি?—ওঃ, সোজা পরিশ্রম করিচি মশাই ওকে ভগ্নাংশটা শেখাতে?

প্রথমটা অপু যেন ভাল করিয়া কথাটা বুঝিতে পারিল না। পরে যখন বুঝিল তখন তাহার মুখে কথা যোগাইল না। হেডমাস্টার একখানা কাগজ বাহির করিয়া তাহার সামনে ধরিয়া বলিলেন—এইখানে একটা নাম সই ক'রে দাও তো। আমি কিন্তু লিখে দিলাম যে, তুমি হাইস্কুলে পড়বে। আজই ইন্সপেক্টর অফিসে পাঠিয়ে দেবো।

মাসখানেক পরে বৃত্তি পাওয়ার খবর, কাগজে পাওয়া গেল।

যাইবার পূর্বদিন বৈকালে সর্বজয়া ব্যস্তভাবে ছেলের জিনিসপত্র গুছাইয়া দিতে লাগিল। ছেলে কখনও একা বিদেশে বাহির হয় নাই। নিতান্ত আনাড়ী, ছেলে-মানুষ ছেলে। কত জিনিসের দরকার হইবে, কে থাকিবে তখন সেখানে যে মুখে মুখে সব অভাব যোগাইয়া ফিরিবে, সব জিনিস হাতে লইয়া বসিয়া থাকিবে। খুঁটিনাটি—একখানা কাঁথা পাতিবার, একখানি গায়ের—একটি জল খাইবার গ্লাস, ঘরের তৈরী এক শিশি সরের ঘি, এক পুঁটুলি নারিকেল নাড়ু, অপু ফুলকাটা একটা মাঝারি জামবাটিতে দুধ খাইতে ভালবাসে—সেই বাটিটা, ছোট একটা বোতলে মাখিবার চৈ-মিশানো নারিকেল তৈল, আরও কত কি। অপুর মাথার বালিশের পুরানো ওয়াড় বদলাইয়া নূতন ওয়াড় পরাইয়া দিল। দধি-যাত্রায় আবশ্যকীয় দই একটা ছোট পাথরবাটিতে পাতিয়া রাখিল। ছেলেকে কি করিয়া বিদেশে চলিতে হইবে সে বিষয়ে সহস্র উপদেশ দিয়াও তাহার মনে তৃপ্তি হইতেছিল না। ভাবিয়া দেখিয়া যেটি বাদ দিয়াছে মনে হয় সেটি তখনি আবার ডাকিয়া বলিয়া দিতেছিল।

—যদি কেউ মারে টারে, কত দুষ্টু ছেলে তো আচে, অমনি মাষ্টারকে বলে দিবি—বুঝলি? রাত্তিরে ঘুমিয়ে পড়িস নে যেন ভাত খাবার আগে। এ তো বাড়ি নয় যে কেউ তোকে ওঠাবে—খেয়ে তবে ঘুমুবি—নয়তো তাদের বলবি, যা হয়েচে তাই দিয়ে ভাত দাও—বুঝলি তো?

যাত্রার পূর্বে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের দধির ফোঁটা অপুর কপালে পরাইয়া দিতে দিতে বলিল—বাড়ি আবার শীগ্‌গির শীগ্‌গির আসবি কিন্তু, তোদের ইতুপূজোর ছুটি দেবে তো?

—হ্যাঁ, ইস্কুলে বুঝি ইতুপূজোয় ছুটি হয়? তাতে আবার বড় ইস্কুল। সেই আবার আসবো গরমের ছুটিতে।

ছেলের অকল্যাণের আশঙ্কায় উচ্ছ্বসিত চোখের জল বহু কষ্টে সর্বজয়া চাপিয়া রাখিল।

অপু মায়ের পায়ের ধূলা লইয়া ভারী বোচকাটা পিঠে ঝুলাইয়া লইয়া বাড়ির বাহির হইয়া গেল।

দেওয়ানপুরের মডেল হাইস্কুল — দুই

সবে ভোর হইয়াছে। দেওয়ানপুর গবর্নমেণ্ট মডেল ইন্‌ষ্টিটিউশনের ছেলেদের বোর্ডিং ঘরের সব দরজা এখনও খুলে নাই। কেবল স্কুলের মাঠে দুইজন শিক্ষক পায়চারী করিতেছেন। সম্মুখের রাস্তা দিয়া এত ভোরেই গ্রাম হইতে গোয়ালারা বাজারে দুধ বেচিতে আসিতেছিল একজন শিক্ষক আগাইয়া আসিয়া বলিলেন—দাঁড়াও, ও ঘোষের পো, কাল দুধ দিয়ে গেলে তা নিছক জল, আজ দেখি কেমন দুধটা!

অপর শিক্ষকটি পিছুপিছু আসিয়া বলিল, নেবেন না সত্যেনবাবু, একটু বেলা না গেলে ভাল দুধ পাওয়া যায় না। আপনি নতুন লোক, এসব জায়গার গতিক জানেন না, যার-তার কাছে দুধ নেবেন না—আমার জানা গোয়ালা আছে, কিনে দেবো বেলা হলে।

বোর্ডিং বাড়ির কোণের ঘরে দরজা খুলিয়া একটি ছেলে বাহির হইয়া আসিল ও দূরের করোনেশন ক্লক-টাওয়ারের ঘড়িতে কয়টা বাজিয়াছে চাহিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল। সত্যেনবাবুর সঙ্গী শিক্ষকটির নাম রামপদবাবু, তিনি ডাকিয়া বলিলেন—ওহে সমীর, ওই যে ছেলেটি এবার ডিস্ট্রিক্ট স্কলারশিপ পেয়েছে, সে কাল রাত্রে এসেছে না?

ছেলেটি বলিল, এসেছে স্যার, ঘুমুচ্ছে এখনও। ডেকে দেবো? —পরে সে জানলার কাছে গিয়া ডাকিল, অপূর্ব, ও অপূর্ব!

ছিপছিপে পাতলা চেহারা, চৌদ্দ পনেরো বৎসরের একটি খুব

সুন্দর ছেলে চোখ মুছিতে মুছিতে বাহির হইয়া আসিল। রামপদবাবু বলিলেন, তোমার নাম অপূর্ব! ও!—এবার আড়বোয়ালের স্কুল থেকে স্কলারশিপ পেয়েছ? বাড়ি কোথায়? ও! বেশ বেশ, আচ্ছা স্কুলে দেখা হবে।

সমীর জিজ্ঞাসা করিল, স্যার, অপূর্ব কোন্ ঘরে থাকবে এখনও সেকেন্ মাস্টার মশায় ঠিক করে দেননি। আপনি একটু বলবেন?

রামপদবাবু বলিলেন, কেন তোর ঘরে তো সীট খালি রয়েছে—ওখানেই থাকবে। সমীর বোধ হয় ইহাই চাহিতেছিল, বলিল,—আপনি একটু বলবেন তাহলে সেকেন্—

রামপদবাবু চলিয়া গেলে অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল ইনি কে? পরে পরিচয় শুনিয়া সে একটু অপ্রতিভ হইল। হয়ত বোর্ডিং-এর নিয়ম নাই এত বেলা পর্যন্ত ঘুমানো, সে না জানিয়া প্রথম দিনটাতেই হয়ত একটা অপরাধের কাজ করিয়া বসিয়াছে।...

একটু বেলা হইলে সে স্কুলবাড়ি দেখিতে গেল। কাল অনেক রাত্রে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ পায় নাই। রাত্রের অন্ধকারে আবছায়া-দেখিতে-পাওয়া সাদা রং-এর প্রকাণ্ড স্কুল বাড়িটা তাহার মনে একটা আনন্দ ও রহস্যের সঞ্চার করিয়াছিল।

এই স্কুলে সে পড়িতে পাইবে!—কতদিন শহরে থাকিতে তাহাদের ছোট স্কুলটা হইতে বাহির হইয়া বাড়ি ফিরিবার পথে দেখিতে পাইত—হাই স্কুলের প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ডে ছেলেরা সকলেই এক ধরনের পোশাক পরিয়া ফুটবল খেলিতেছে। তখন কতদিন মনে হইয়াছে এত বড় স্কুলে পড়িতে যাওয়া কি তাহার ঘটিবে কোন কালে—এসব বড়লোকের ছেলেদের জন্য। এতদিনে তাহার আশা পূর্ণ হইতে চলিল।

বেলা দশটার কিছু আগে বোর্ডিং-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বিধুবাবু তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সে কোন্ ঘরে আছে, নাম কি, বাড়ি কোথায়, নানা জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া বলিলেন, সমীর ছোকরা ভাল,

একসঙ্গে থাকবে, বেশ পড়াশুনো হবে। এখানকার পুকুরের জলে নাইবে না কখনো—জল ভালো নয় স্কুলের ইন্দারার জলে ছাড়া—আচ্ছা যাও, এদিকে আবার ঘণ্টা বাজার সময় হ'ল।

সাড়ে দশটায় ক্লাস বসিল। প্রথম বই খাতা হাতে ক্লাস-রুমে ঢুকিবার সময় তাহার বুক আগ্রহের ঔৎসুক্যে টিপ্‌টিপ্‌ করিতেছিল। বেশ বড় ঘর, নীচু চৌকির উপর মাস্টারের চেয়ারে পাতা—খুব বড় ব্ল্যাকবোর্ড। সব ভারী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, নিখুঁতভাবে সাজানো। চেয়ার, বেঞ্চি, টেবিল, ডেস্ক সব ঝক্‌মক্‌ করিতেছে, কোথাও একটু ময়লা বা দাগ নাই।

মাস্টার ক্লাসে ঢুকিলে সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। এ নিয়ম পূর্বে সে যে সব স্কুলে পড়িত সেখানে দেখে নাই। কেউ স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিলে উঠিয়া দাঁড়াইবার কথা মাস্টার শিখাইয়া দিতেন। সত্য সত্যই এতদিন পরে সে বড় স্কুলে পড়িতেছে বটে!...

জানালা দিয়া চাহিয়া দেখিল পাশের ক্লাস-রুমের একজন কোট-প্যাণ্টপরা মাস্টার বোর্ডে কি লিখিতে দিয়া ক্লাসের এদিক-ওদিক পায়চারী করিতেছেন—চোখে চশমা, আধপাকা দাড়ি বুকের উপর পড়িয়াছে, গম্ভীর চেহারা। সে পাশের ছেলেকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল উনি কোন্ মাস্টার ভাই ?

ছেলেটি বলিল—উনি মিঃ দত্ত, হেডমাস্টার—ক্রিশ্চান, খুব ভাল ইংরিজী জানেন।

অপূর্ব শুনিয়া নিরাশ হইল যে তাহাদের ক্লাসে মিঃ দত্তের কোন ঘণ্টা নাই! থার্ডক্লাসের নিচে কোন ক্লাসে নাকি নামেন না।

পাশেই স্কুলের লাইব্রেরী, ন্যাপ্‌থলিনের গন্ধ-ভরা পুরানো বই-এর গন্ধ আসিতেছিল। ভাবিল এ ধরনের ভরপুর লাইব্রেরীর গন্ধ কি কখনো ছোটোখাটো স্কুলে পাওয়া যায় ?

ঢং ঢং করিয়া ক্লাস শেষ হওয়ার ঘণ্টা পড়ে—আড়বোয়ালের স্কুলের মত একখণ্ড রেলের পাটির লোহা বাজায় না, সত্যিকারের ঘণ্টা—কি গম্ভীর আওয়াজটা!

টিফিনের পরের ঘণ্টায় সত্যেনবাবুর ক্লাসে। চব্বিশ-পঁচিশ বৎসরের যুবক, বেশ বলিষ্ঠ গড়ন, ইহার মুখ দেখিয়া অপুর মনে হইল ইনি ভারী বিদ্বান বুদ্ধিমানও বটে। প্রথম দিনই ইহার উপর কেমন এক ধরনের শ্রদ্ধা তাহার গড়িয়া উঠিল! সে শ্রদ্ধা আরও গভীর ইহার মুখের ইংরিজী উচ্চারণে।

ছুটির পর স্কুলের মাঠে বোর্ডিং-এর ছেলেদের নানা ধরনের খেলা শুরু হইল। তাহাদের ক্লাসের ননী ও সমীর তাহাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া অন্য সকল ছেলেদের সহিত পরিচয় করাইয়া দিল। সে ক্রিকেট খেলা জানে না, ননী তাহার হাতে নিজের ব্যাটখানা দিয়া তাহাকে বল মারিতে বলিল ও নিজে উইকেট্ হইতে একটু দূরে দাঁড়াইয়া খেলার আইনকানুন বুঝাইয়া দিতে লাগিল।

খেলার অবসানে যে-যাহার স্থানে চলিয়া গেল। খেলার মাঠে পশ্চিম কোণে একটা বড় বাদাম গাছ, অপু গিয়া তাহার তলায় বসিল। একটু দূরে গবর্ণমেণ্টের দাতব্য ঔষধালয়। বৈকালেও সেখানে একদল রোগীর ভিড় হইয়াছে, তাহাদের নানা কলরবের মধ্যে একটি ছোট মেয়ের কান্নার সুর শোনা যাইতেছে। অপূর্ব কেমন অন্যমনস্ক হইয়া গেল চৌদ্দ-পনেরো বৎসর বয়সের মধ্যে এই আজ প্রথম দিন, সেদিনটি সে মায়ের নিকট হইতে বহুদূরে আত্মীয়-বন্ধুহীন প্রবাসে একা কাটাইতেছে। সেদিক দিয়া দেখিতে গেলে আজ তাহার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন।

কত কথা মনে ওঠে, এই সুদীর্ঘ পনেরো বৎসরের জীবনে কি অপূর্ব বৈচিত্র্য, কি ঐশ্বর্য!

সমীর টেবিলে আলো জ্বালিয়াছে। অপুর কিছু ভালো লাগিতেছিল না—বিছানায় গিয়া শুইয়া রহিল। খানিকটা পরে সমীর পিছনে চাহিয়া তাহাকে সে অবস্থায় দেখিয়া বলিল, পড়বে না?

অপু বলিল, একটু পরে—এই উঠচি।

—আলোটা জ্বালিয়ে রাখো, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এখুনি দেখতে আসবে, শুয়ে আছ দেখলে বকবে।

অপু উঠিয়া আলো জ্বালিল। বলিল, রোজ আসেন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ! সেকেণ্ড মাস্টার তো—না ?

সমীরের কথা ঠিক। অপু আলো জ্বালিবার একটু পরেই বিধুবাবু ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি রকম লাগলো আজ ক্লাসে ? পড়াশুনো সব দেখে নিয়েচ তো ? সমীর, ওকে একটু দেখিয়ে দিস্ তো কোথায় কিসেব পড়া। ক্লাসের রুটিনটা ওকে দে বরং—সব বই কেনা হয়েচে তো তোমার ? ....জিওমেট্রি নেই ? আচ্ছা, আমার কাছে পাওয়া যাবে, এক টাকা সাড়ে পাঁচ আনা, কাল সকালে আমার ঘর থেকে গিয়ে নিয়ে এসো একখানা।

বিধুবাবু চলিয়া গেলে সমীর পড়িতে বসিল ; কিন্তু পিছনে চাহিয়া পুনরায় অপূর্বকে শুইয়া থাকিতে দেখিয়া সে কাছে আসিয়া বলিল, বাড়ির জন্যে মন কেমন—না ?

তাহার পর সে খাটের ধারে বসিয়া তাহাকে বাড়ির সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। বলিল, তোমার মা একা থাকেন বাড়িতে ? আর কেউ না ? তাঁর তো থাকতে কষ্ট হয়।

অপূর্ব বলিল, ও কিসের ঘণ্টা ভাই।

—বোর্ডিং-এর খাওয়ার ঘণ্টা—চলো যাই।

খাওয়া-দাওয়ার পব দুই-তিনজন ছেলে তাহাদের ঘরে আসিল। এই সময়টা আর সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের ভয় নাই, তিনি নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। শীতের রাত্রে আর বড় একটা বাহির হন না। ছেলেরা এই সময়ে এঘর-ওঘর বেড়াইয়া গল্পগুজবের অবকাশ পায়।

একদিন একটা বড় মজা হইল। সত্যেনবাবু ক্লাসে আসিয়া বাংলা হইতে ইংরেজি করিতে দিয়াছেন, এমন সময় হেডমাস্টার ক্লাসে ঢুকিতেই সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। হেডমাস্টার বইখানা সত্যেনবাবুর হাত হইতে লইয়া একবার চোখ বুলাইয়া দেখিয়া লইয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন—আচ্ছা, এই যে এতে ভিক্টর হিউগো কথাটা লেখা আছে, ভিক্টর হাইগো কে ছিলেন জানো ? ক্লাস নীরব। এ নাম কেহ

জানে না। পাড়াগাঁয়ের স্কুলের ফোর্থ ক্লাসের ছেলে, কেহ নামও শোনে নাই।—

কে বলতে পারো—তুমি—তুমি?

ক্লাসে স্থচ পড়িলে তাহার শব্দ শোনা যায়।

অপুর অস্পষ্ট মনে হইল নামটা—যেন তাহার নিতান্ত অপরিচিত নয়, কোথাও যেন পাইয়াছে ইহার আগে। কিন্তু তাহার পালা আসিল ও চলিয়া গেল, তাহার মনে পড়িল না। ওদিকের বেঞ্চিটা ঘুরিয়া যখন প্রশ্নটা তাহার সম্মুখের বেঞ্চের ছেলেদের কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তখন তাহার হঠাৎ মনে পড়িল, নিশ্চিন্দিপুরে থাকিতে সেই পুরাতন 'বঙ্গবাসী'গুলার মধ্যে কোথায় সে এ-কথাটা পড়িয়াছে —বোধ হয়, সেই 'বিলাত যাত্রীর চিঠি'র মধ্যে হইবে—তাহার মনে পড়িয়াছে! পরক্ষণেই সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—ফরাসী দেশের লেখক খুব বড় লেখক। প্যারিসে তাঁর পাথরের মূর্তি আছে, পথের ধারে।

হেডমাস্টার বোধ হয় এ ক্লাসের নিকট এ ভাবে উত্তর আশা করেন নাই, তাহার দিকে চশমা-আঁটা জ্বলজ্বলে চোখে পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিতেই অপু অভিভূত ও সঙ্কুচিত অবস্থায় চোখ নামাইয়া লইল। হেডমাস্টার বলিলেন, আচ্ছা, বেশ। পথের ধারে নয়, বাগানের মধ্যে মূর্তিটা আছে—বসো বসো সব।

সত্যেনবাবু তাহার উপর খুব সন্তুষ্ট হইলেন! ছুটির পর তাহাকে সঙ্গে করিয়া নিজের বাসায় লইয়া গেলেন। ছোটখাটো বাড়ি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, একাই থাকেন। স্টোভ জ্বালিয়া চা ও খাবার করিয়া তাহাকে দিলেন, নিজেও খাইলেন। বলিলেন, আর একটু ক'রে গ্রামারটা পড়বে—আমি তোমাকে দাগ দিয়ে দেখিয়ে দেবো।

অপুর লজ্জাটা অনেকক্ষণ কাটিয়া গিয়াছিল, সে আলমারিটার দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—ওতে আপনার অনেক বই আছে?

সত্যেনবাবু আলমারি খুলিয়া দেখাইলেন। বেশীর ভাগই আইনের

বই, শীঘ্রই আইন পরীক্ষা দিবেন। একখানা বই তাহার হাতে দিয়া বলিলেন—এখানা তুমি পড়ো—বাংলা বই, ইতিহাসের গল্প।

অপুর আরও দু'একখানা বই নামাইয়া দেখিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারিল না।

প্রথম কয়েকমাস কাটিয়া গেল। স্কুল-কম্পাউণ্ডের সেই পাতা-বাহার চীনা-জবার ঝোপটা অপুর বড় প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। সে রবিবারের শান্ত দুপুরের রৌদ্রে পিঠ দিয়া শুক্‌না পাতার রাশির মধ্যে বসিয়া বসিয়া বই পড়ে। ক্লাসের বই পড়িতে তাহার ভাল লাগে না, সে-সব বই-এর গল্পগুলি সে মাসখানেকের মধ্যেই পড়িয়া শেষ করিয়াছে। কিন্তু মুশকিল এই যে, স্কুল লাইব্রেরীতে ইংরেজি বই বেশী; যে বইগুলোর বাঁধাই চিত্তাকর্ষক, ছবি বেশী, সেগুলো সবই ইংরেজি। ইংবেজি সে ভাল বুঝিতে পারে না, কেবল ছবির তলাকার বর্ণনাটা বোঝে মাত্র।

একদিন হেডমাস্টারের অফিসে তাহার ডাক পড়িল। হেডমাস্টার ডাকিতেছেন শুনিয়া তাহাব প্রাণ উড়িয়া গেল। ভয়ে ভয়ে অফিস ঘরের দুয়ারের কাছে গিয়া দেখিল, আর একজন সাহেবী পোশাক-পরা ভদ্রলোক ঘরের মধ্যে বসিয়া আছেন। হেডমাস্টারের ইঙ্গিতে সে ঘরে ঢুকিয়া দু'জনের সামনে গিয়া দাঁড়াইল।

ভদ্রলোকটি ইংরেজিতে তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন ও সামনের একখানা পাতার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কি দেখিয়া লইয়া একখানি ইংরেজি বই তাহার হাতে দিয়া ইংরেজিতে বলিলেন, এই বইখানা তুমি পড়তে নিয়েছিলে?

অপু দেখিল, বইখানা The World of Ice, মাসখানেক আগে লাইব্রেরী হইতে পড়িবার জন্য সে লইয়াছিল। সবটা ভাল বুঝিতে পারে নাই সে কম্পিত কণ্ঠে বলিল, ইয়েস—

হেডমাস্টার গর্জন করিয়া বলিলেন, ইয়েস স্যার।

অপুর পা কাঁপিতেছিল, জিভ শুকাইয়া আসিতেছিল, থতমত খাইয়া বলিল, ইয়েস স্যার—

ভদ্রলোকটি পুনরায় ইংরেজিতে বলিলেন, স্লেজ কাকে বলে?

অপু ইহার আগে কখনও ইংরেজি বলিতে অভ্যাস করে নাই, ভাবিয়া ভাবিয়া ইংরেজিতে বানাইয়া বলিল, এক ধরনের গাড়ি কুকুরে টানে। বরফের উপর দিয়া যাওয়ার কথাটা মনে আসিলেও হঠাৎ সে ইংরেজী করিতে পারিল না।

—অন্য গাড়ির সঙ্গে স্লেজের পার্থক্য কি?

অপু প্রথমে বলিল, স্লেজ হ্যাজ—তারপরই তাহার মনে পড়িল —আর্টিক্ল-সংক্রান্ত কোন গোলযোগ এখানে উঠিতে পারে। 'এ' বা 'দি' কোনটা বলিতে হইবে তাড়াতাড়ির মাথায় ভাবিবার সময় না পাইয়া সোজাসুজি বহুবচনে বলিল, স্লেজেস্ হ্যাভ নো হুইলস্—

—অরোরা বোরিয়ালিস কাহাকে বলে?

অপুর চোখমুখ উজ্জ্বল দেখাইল। মাত্র দিন কতক আগে সত্যেন বাবুর কি একখানা ইংরেজি বইতে সে ইহার ছবি দেখিয়াছিল। সে জায়গাটা পড়িয়া মানে না বুঝিলেও এ-কথাটা খুব গাল-ভরা বলিয়া সত্যেনবাবুর নিকট উচ্চারণ জানিয়া মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছিল। তাড়াতাড়ি বলিল, আরোরা বোরিয়ালিস ইজ এ কাইণ্ড অব্ এ্যাটমোস্ফেরিক ইলেক্ট্রিসিটি—

ফিরিয়া আসিবার সময় শুনিল, আগন্তুক ভদ্রলোকটি বলিতেছেন আন্ইউজুয়াল ফর এ বয় অব্ ফোর্থ ক্লাস। কি নাম বললেন? এ স্ট্রাইকিংলি হ্যাণ্ডসাম বয়—বেশ বেশ।

অপু পরে জানিয়াছিল তিনি স্কুল-বিভাগের বড় ইন্সপেক্টর, না বলিয়া হঠাৎ স্কুল দেখিতে আসিয়াছিলেন।

সরস্বতী পূজার সময় তাহার আট আনা চাঁদা ধরাতে অপু বড় বিপদে পড়িল। মাসের শেষ, হাতেও পয়সা তেমন নাই, অথচ সে মুখে কাহাকেও 'না' বলিতে পারে না, সরস্বতী পূজার চাঁদা দিয়া হাত একেবারে খালি হইয়া গেল। বৈকালে সমীর জিজ্ঞাসা করিল, খাবার খেতে গেলি নে অপূর্ব?

সে হাসিয়া ঘাড় নাড়িল।

সমীর তাহার সব খবর রাখে, বলিল, আমি বরাবর দেখে আসছি অপূর্ব, হাতের পয়সা ভারী বে-আন্দাজি খরচ করিস্ তুই —বুঝেসুজে চললে এরকম হয় না—আট আনা চাঁদা কে দিতে বলেছে?

অপু হাসিমুখে বলিল, আচ্ছা আচ্ছা, যা তোকে আর শেখাতে হবে না—ভারী আমার গুরুঠাকুর—

সমীর বলিল, না হাসি নয়, সত্যি কথা বলছি। আর এই ননী, ভুলো, রাসবেহারী—ওদের ও রকম বাজারে নিয়ে গিয়ে খাবার খাওয়াস্ কেন?

অপু তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলিল, যাঃ বকিস্ নে—ওরা ধরে খাওয়াবার জন্যে, তা করবো কি?

সমীর রাগ করিয়া বলিল, খাওয়াতে বললেই অমনি খাওয়াতে হবে? ওরাও দুষ্টুর ধাড়ি, তোকে পেয়েছে ওই রকম তাই। অন্য কারুর কাছে তো কই ঘেঁষে না। আড়ালে তোকে বোকা বলে তা জানিস?

কোনো কোনোদিন বৈকালে সে একখানা বই হাতে লইয়া তাহার প্রিয় গাছপালা-ঘেরা সেই কোণটিতে বসিতে যায়। মনে পড়ে এতক্ষণ সেখানে ছায়া পড়িয়া গিয়াছে, চীনে জবা গাছে কচি কচি পাতা ধরিয়াছে। যাইবার সময় ভাবে, দেখি আর ক'টা লজেঞ্চুস আছে?—পরে বোতল হইতে গোটাকতক বাহির করিয়া মুখে পুরিয়া দেয়। ভাবে আসছে মাসের টাকা পেলে ঐ যে আনারসের একরকম আছে, তাই কিনে আনবো এক শিশি—কি চমৎকার এগুলো খেতে! এ ধরনের ফলের অস্বাদযুক্ত লজেঞ্চুস সে আর কখনও খায় নাই।

কম্পাউণ্ডে নামিয়া লাইব্রেরীর কোণটা দিয়া যাইতে যাইতে সে হঠাৎ অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। একজন বেঁটে-মত লোক ইঁদারার কাছে দাঁড়াইয়া স্কুলের কেরাণী ও বোর্ডিং-এর বাজার-সরকার গোপীনাথ দত্তের সঙ্গে আলাপ করিতেছে।

তাহার বুকের ভিতরটা কেমন ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল···সে কিসের টানে যেন লোকটার দিকে পায়ে পায়ে আগাইয়া গেল···লোকটা এবার তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়াছে—হাতটা কেমন বাঁকাইয়া আছে, তখনি কথা শেষ করিয়া সে ইঁদারার পাড়ের গায়ে ঠেস-দেওয়ানো ছাতাটা হাতে লইয়া কম্পাউণ্ডের ফটক দিয়া বাহির হইয়া গেল।

অপু খানিকক্ষণ একদৃষ্টে সেদিকে চাহিয়া রহিল! লোকটাকে দেখিতে অবিকল তাহার বাবার মত।

কতদিন সে বাবার মুখ দেখে নাই। আজ চার বৎসর!

উদগত চোখের জল চাপিয়া জবাতলায় গিয়া সে গাছের ছায়ায় চুপ করিয়া বসিল।

অন্যমনস্ক ভাবে বইখানা সে উল্টাইয়া যায়। তাহার প্রিয় সেই তিন-রঙা ছবিটা বাহির করিল, পাশের পৃষ্ঠায় সেই পদ্যটা।

স্বদেশ হইতে বহুদূরে, আত্মীয়স্বজন হইতে বহুদূরে, আলজিরিয়ার কর্কশ, বন্ধুর, জলহীন মরুপ্রান্তে একজন মুমূর্ষু তরুণ সৈনিক বালু-শয্যায় শায়িত। দেখিবার কেহ নাই। কেবল জনৈক সৈনিকবন্ধু হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া মুখে চামড়ার বোতল হইতে একটু একটু জল দিতেছে। পৃথিবীর নিকট হইতে শেষ বিদায় লইবার সময় সম্মুখের এই অপরিচিত, ধূসর উঁচুনিচু বালিয়াড়ি, পিছনের আকাশে সান্ধ্য-সূর্যরক্তচ্ছটা, দূরে খর্জুরকুঞ্জ ও ঊর্ধ্বমুখ উষ্ট্রশ্রেণীর দিকে চোখ রাখিয়া মুমূর্ষু সৈনিকটির কেবলই মনে পড়িতেছে বহুদূরে রাইন নদীতীরবর্তী তাহার জন্মপল্লীর কথা···তাহার মা আছেন সেখানে। বন্ধু, তুমি আমার মায়ের কাছে খবরটা পৌঁছাইয়া দিও, ভুলিও না।···

For my home is in distend Bingen, Fair Bingen on the Rhine!···

মাকে অপু দেখে নাই আজ পাঁচ মাস!—সে আর থাকিতে পারে না···বোর্ডিং তাহার ভাল লাগে না, স্কুল আর ভাল লাগে না, মাকে না দেখিয়া আর থাকা যায় না।

এই সব সময়ে এই নির্জন অপরাহ্ণগুলিতে নিশ্চিন্দিপুরের কথা কেমন করিয়া তাহাব মনে পড়িয়া যায়। সেই একদিনের কথা মনে পড়ে।...

বাড়িতে পাশের পোড়ো ভিটার বনে অনেকগুলো ছাতারে পাখি কিচমিচ করিতেছিল, কি ভাবিয়া একটা ঢিল ছুঁড়িয়া মারিতেই দলের মধ্যে ছোট একটা পাখি ঘাড় মোচড়াইয়া টুপ করিয়া ঝোপের নিচে পড়িয়া গেল, বাকীগুলো উড়িয়া পলাইল। তাহার ঢিলে পাখি সত্য সত্য মরিবে ইহা সে ভাবে নাই, দৌড়িয়া গিয়া মহা-আগ্রহে দিদিকে ডাকিল, ওবে দিদি, শীগ্‌গির আয়রে, দেখবি একটা জিনিস, ছুটে আয়—

দুর্গা আসিয়া দেখিয়া বলিল, দেখি, দে-দিকি আমার হাতে। পরে সে নিজের হাতে পাখিটিকে লইয়া কৌতূহলের সহিত নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল। ঘাড় ভাঙিয়া গিয়াছে, মুখ দিয়া রক্ত উঠিয়াছে, দুর্গার আঙুলে রক্ত লাগিয়া গেল। দুর্গা তিবস্কাবেব সুরে বলিল, আহা কেন মাবতে গেলি তুই ?

অপুব বিজয়গর্বে উৎফুল্ল মন একটু দমিয়া গেল।

দুর্গা বলিল, আজ কি বাব বে ? সোমবাব না ? তুই তো বামুনেব ছেলে—চল, তুই আব আমি একে নিয়ে গিয়ে গাঙেব ধাবে পুড়িয়ে আসি, এর গতি হয়ে যাবে।

তারপর দুর্গা কোথা হইতে একটা দেশলাই সংগ্রহ করিয়া আনিল তেঁতুলতলায় ঘাটের এক ঝোপের ধারে শুকনো পাতার আগুনে পাখিটাকে খানিক পুড়াইল, পরে আধ-ঝল্‌সানো পাখিটা নদীর জলে ফেলিয়া দিয়া সে ভক্তিভাবে বলিল—হরিবোল হরি, হরি ঠাকুর ওব গতি করবেন, দেখিস্। আহা, কি ক'রে ঘাড়টা থেতলে দিয়েছিলি ? কখ্‌খনো ওরকম করিস নে আর। বনে জঙ্গলে উড়ে বেড়ায়, কারুর কিছু করে না, মারতে আছে, ছিঃ!

নদী হইতে অঞ্জলি ভরিয়া জল তুলিয়া দুর্গা চিতার জায়গায় ধুইয়া দিল।

সন্ধ্যার আগে বাড়ি ফিরিবার সময় কে জানে তাহারা কোন্ মুক্ত বিহঙ্গ আত্মার আশীর্বাদ লইয়া ফিরিয়াছিল !···

দেবব্রত আসিয়া ডাক দিতে অপুর নিশ্চিন্দিপুরের স্বপ্ন মিলাইয়া গেল।

দেওয়ানপুর স্কুলেই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা গৃহীত হয়। খরচ-পত্র করিয়া কোথাও যাইতে হইল না। পরীক্ষার পর হেডমাস্টার মিঃ দত্ত অপুকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বলিলেন—বাড়ি যাবে কবে?

এই কয় বৎসরে হেডমাস্টারের সঙ্গে তাহার কেমন একটা নিবিড় সৌহার্দ্যের সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিয়াছে, দু'জনের কেহই এতদিনে জানিতে পারে নাই সে বন্ধন কতটা দৃঢ়।

অপু বলিল—সামনের বুধবারে যাব ভাবছি।

—পাশ হলে কি করবে ভাবছো? কলেজে পড়বে তো?

—কলেজে পড়বার খুব ইচ্ছে, স্যর।

—যদি স্কলারশিপ না পাও?

—অপু মৃদু হাসিয়া চুপ করিয়া থাকে।

—ভগবানের ওপর নির্ভর ক'রে চলো, সব ঠিক হয়ে যাবে। দাঁড়াও, বাইবেলের একটা জায়গা পড়ে শোনাই তোমাকে—

মিঃ দত্ত খ্রীষ্টান। ক্লাসে কতদিন বাইবেল খুলিয়া চমৎকার চমৎকার উক্তি তাহাদের পড়িয়া শুনাইয়াছেন, অপুর তরুণ মনে বুদ্ধদেবের পীতবাসধারী সৌম্যমূর্তির পাশে, তাহাদের গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিশালাক্ষীর পাশে, বোষ্টমদাদু নরোত্তম দাসের ঠাকুর শ্রীচৈতন্যের পাশে, দীর্ঘদেহ শান্তনয়ন যীশুর মূর্তি কোন্ কালে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল—তাহার মন যীশুকে বর্জন করে নাই, কাঁটার মুকুট পরা, লাঞ্ছিত, অপমানিত এক দেবোন্মাদ যুবককে মনে প্রাণে বরণ করিতে শিখিয়াছিল।

মিঃ দত্ত বলিলেন—কলকাতাতেই পড়ো—অনেক জিনিস দেখবার শেখবার আছে—কোন কোন পাড়াগাঁয়ের কলেজে খরচ

কম পড়ে বটে কিন্তু সেখানে মন বড় হয় না, চোখ ফোটে না, আমি কলকাতাকেই ভাল বলি।

অপু অনেকদিন হইতেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছে, কলেজে পড়িবে এবং কলিকাতার কলেজেই পড়িবে?

. মিঃ দত্ত বলিলেন—স্কুল লাইব্রেরীর 'লে মিজারেব্‌ল্'-খানা তুমি খুব ভালবাসতে—ওখানা তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি, আমি আর একখানা কিনে নেবো।

অপু বেশী কথা বলিতে জানে না—এখনও পারিল না—মুখ-চোরার মত খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া হেডমাস্টারের পায়ের ধুলা লইয়া প্রমাণ করিয়া বাহির হইয়া আসিল।

হেডমাস্টারের মনে হইল—তাঁহার দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের শিক্ষক-জীবনে এ রকম আর কোন ছেলের সংস্পর্শে তিনি কখনও আসেন নাই।—ভাবময় স্বপ্নদর্শী বালক, জগতে সহায়হীন, সম্পদহীন। হয়ত একটু নির্বোধ, একটু অপরিণামদর্শী—কিন্তু উদার, সরল, নিষ্পাপ, জ্ঞানপিপাসু ও জিজ্ঞাসু। মনে মনে তিনি বালকটিকে বড় ভালবাসিয়াছিলেন।

তাঁহার জীবনে এই একটি আসিয়াছিল, চলিয়া গেল। ক্লাসে পড়াইবার সময় ইহার কৌতূহলী ডাগর চোখ ও আগ্রহোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া ইংরেজীর ঘণ্টায় কত নতুন কথা, কত গল্প, ইতিহাসের কাহিনী বলিয়া যাইতেন—ইহার নীরব, জিজ্ঞাসু চোখ দু'টি তাঁহার নিকট হইতে যেরূপ জোর করিয়া পাঠ আদায় করিয়া লইয়াছে, সেরূপ আর কেহ পারে নাই, সে প্রেরণা সহজলভ্য নয়, তিনি তাহা জানেন।

গত চার বৎসরের স্মৃতি-জড়ানো দেওয়ানপুর হইতে বিদায় লইবার সময়ে অপুর মন ভাল ছিল না। দেবব্রত বলিল—তুমি চলে গেলে, অপূর্বদা এবার পড়া ছেড়ে দেবো।
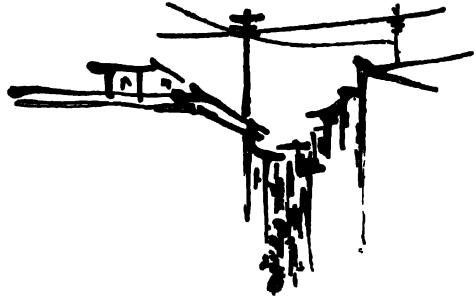
কলিকাতার কলেজে অপু — তিন

বাড়িতে অপু মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করিল। কলিকাতায় যদি পড়িতে যায় স্কলারশিপ না পাইলে কি কোন সুবিধা হইবে? সর্বজয়া কখনও জীবনে কলিকাতা দেখে নাই—সে কিছু জানে না। পড়া তো অনেক হইয়াছে আর পড়বার দরকার কি?—অপুর মনে কলেজে পড়িবার ইচ্ছা খুব প্রবল। কলেজে পড়িলে মানুষ বিদ্যার জাহাজ হয়। সবাই বলিবে কলেজের ছেলে।

মাকে বলিল—না-ই যদি স্কলারশিপ পাই, তাই বা কি? একরকম ক'রে হয়ে যাবে—রমাপতিদা বলে, কত গরীবের ছেলে কলকাতায় পড়চে, গিয়ে একটু চেষ্টা করলেই নাকি সুবিধা হয়ে যাবে, ও আমি ক'রে নেবো মা—

কলিকাতায় যাইবার পূর্বদিন রাত্রে আগ্রহে উত্তেজনায় তাহার ঘুম হইল না। মাথার মধ্যে যেন কেমন করে, বুকের মধ্যেও। গলায় যেন কি আটকাইয়া গিয়াছে। সত্য সত্য সে কাল এমন সময় কলিকাতায় বসিয়া আছে!···কলিকাতায়!···কলিকাতা সম্বন্ধে কত গল্প, কত কি সে শুনিয়াছে। অতবড় শহর আর নাই। কত কি অদ্ভুত জিনিস দেখিবার আছে, বড় বড় লাইব্রেরী আছে সে শুনিয়াছে, বই চাহিলেই সেখানে বসিয়া পড়িতে দেয়।

বিছানায় শুইয়া সারারাত্রি ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। বাড়ির পিছনের তেঁতুল গাছের ডালপালা অন্ধকারকে আরও ঘন করিয়াছে,

ভোর আর কিছুতেই হয় না। হয়ত তাহার কলিকাতা যাওয়া ঘটিবে না, কলেজে পড়া ঘটিবে না, কত লোক হঠাৎ মারা গিয়াছে, এমনি হয়ত সেও মরিয়া যাইতে পারে। কলিকাতা না দেখিয়া, কলেজে অন্তত কিছুদিন পড়ার আগে যেন সে না মরে!—দোহাই ভগবান।

কলিকাতায় সে কাহাকেও চেনে না, কোথায় গিয়া উঠিবে ঠিক জানা নাই, পথঘাটও জানা নাই। মাসকতক আগে দেবব্রত তাহাকে নিজের এক মেসোমশাইয়ের কলিকাতার ঠিকানা দিয়া বলিয়াছিল, দরকার হইলে এই ঠিকানায় গিয়া তাহার নাম করিলেই তিনি আদর করিয়া থাকিবার স্থান দিবেন। ট্রেনে উঠিবার সময়ে অপু সে কাগজখানা বাহির করিয়া পকেটে রাখিল। রেলের পুরানো টাইমটেবেলের পিছন হইতে ছিঁড়িয়া লওয়া একখানা কলিকাতা শহরের নক্সা তাহার টিনের তোরঙ্গটার মধ্যে অনেকদিন আগে ছিল, সেখানাও বাহির করিয়া বসিল।

ইহার পূর্বেও অপু শহর দেখিয়াছে, তবুও ট্রেন হইতে নামিয়া শিয়ালদহ স্টেশনের সম্মুখে বড় রাস্তায় একবার আসিয়া দাঁড়াইতেই সে অবাক হইয়া গেল। এরকম কাণ্ড সে কোথায় দেখিয়াছে? ট্রামগাড়ি ইহার নাম? আর এক রকমের গাড়ি নিঃশব্দে দৌড়াইয়া চলিয়াছে, অপু কখনও না দেখিলেও মনে মনে আন্দাজ করিল, ইহারই নাম মোটর গাড়ি। সে বিস্ময়ের সহিত দু-একখানার দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল; স্টেশনের অফিস ঘরে সে মাথার উপর একটা কি চাকার মত জিনিস বন্ বন্ বেগে ঘুরিতে দেখিয়াছে, সে আন্দাজ করিল উহাই ইলেকট্রিক পাখা।

যে-ঠিকানা বন্ধু দিয়াছিল, তাহা খুঁজিয়া বাহির করা তাহার পক্ষে এক মহা মুশকিলের ব্যাপার, পকেটে রেলের টাইমটেবলের মোড়ক হইতে সংগ্রহ করা কলিকাতার যে নক্সা ছিল তাহা মিলাইয়া হ্যারিসন রোড খুঁজিয়া বাহির করিল। জিনিসপত্র তাহার এমন বেশী কিছু নহে, বগলে ছোট বিছানাটি ও ডান হাতে ভারী পুঁটলিটা

ঝুলাইয়া পথ চলিতে চলিতে সামনে পাওয়া গেল আমহার্স্ট স্ট্রীট। তাহার পর আরও খানিক ঘুরিয়া সে পঞ্চানন দাসের গলি বাহির করিল।

অখিলবাবু সন্ধ্যার আগে আসিলেন, কালো নাদুস-নুদুস চেহারা, অপুর পরিচয় ও উদ্দেশ্য শুনিয়া খুশী হইলেন ও খুব উৎসাহ দিলেন। ঝিকে ডাকাইয়া তখনই খাবার আনাইয়া অপুকে খাইতে দিলেন, সারাদিন খাওয়া হয় নাই জানিতে পারিয়া তিনি এত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন যে, নিজে সন্ধ্যাহ্নিক করিবার জন্য আসনখানি মেসের ছাদে পাতিয়াও আহ্নিক করিতে ভুলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার সময় সে মেসের ছাদে শুইয়া পড়িল। সারাদিন বেড়াইয়া সে বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে।

সে তো কলিকাতায় আসিয়াছে—মিউজিয়াম, গড়ের মাঠ দেখিতে পাইবে তো?…বায়োস্কোপ দেখিবে…এখানে খুব বড় বায়োস্কোপ আছে সে জানে। তাহাদের দেওয়ানপুরের স্কুলে একবার একটা ভ্রমণকারী বায়োস্কোপের দল গিয়াছিল, তাহাতেই সে জানে বায়োস্কোপ কি অদ্ভুত দেখিতে। তবে এখানে নাকি বায়োস্কোপে গল্পের বই দেখায়। সেখানে তাহা ছিল না—রেলগাড়ি দৌড়াইতেছে একটা লোক হাত পা নাড়িয়া মুখভঙ্গী করিয়া লোক হাসাইতেছে —এই সব। এখানে বায়োস্কোপে গল্পের বই দেখিতে চায়। অখিলবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, বায়োস্কোপ যেখানে হয়, এখান থেকে কত দূর?

অখিলবাবু মেসে খাইয়া অপুর ইহার উহার পরামর্শমত নানাস্থানে হাঁটাহাঁটি করিতে লাগিল, কোথাও বা থাকিবার স্থানের জন্য, কোথাও বা ছেলে পড়াইবার সুবিধার জন্য, কাহারও কাছে বা কলেজে বিনা বেতনে ভর্তি হইবার যোগাযোগের জন্য। এদিকে কলেজে ভর্তি হইবার সময়ও চলিয়া যায়, সঙ্গে যে কয়টা টাকা ছিল তাহা পকেটে লইয়া একদিন সে ভর্তি হইতে বাহির হইল। প্রেসিডেন্সী কলেজের দিকে সে ইচ্ছা করিয়া ঘেঁসিল না, সেখানে

সবদিকেই খরচ অত্যন্ত বেশী। মেট্রোপলিটান কলেজ গলির ভিতর, বিশেষতঃ পুরানো ধরনের বলিয়া সেখানেও ভর্তি হইতে ইচ্ছা হইল না। মিশনারীদের কলেজ হইতে একদল ছেলে বাহির হইয়া সিটি কলেজে ভর্তি হইতে চলিয়াছিল, তাহাদের দলে মিশিয়া গিয়া কেরানীর নিকট হইতে কাগজ চাহিয়া নাম লিখিয়া ফেলিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাড়িটার গড়ন ও আকৃতি তাহার কাছে এত খারাপ ঠেকিল যে, কাগজখানি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সে বাহিরে আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। অবশেষে রিপন কলেজের বাড়ি তাহার কাছে বেশ ভাল ও উঁচু মনে হইল। ভর্তি হইয়া সে আর একটি ছেলের সঙ্গে ক্লাস-রুমগুলি দেখিতে গেল। ক্লাসে ইলেকট্রিক পাখা। কি করিয়া খুলিতে হয়? তাহার সঙ্গী দেখাইয়া দিল। সে খুশীর সহিত তাহার নীচে খানিকক্ষণ বসিয়া রহিল, এত হাতের কাছে ইলেকট্রিক পাখা পাইয়া বার বার পাখা খুলিয়া বন্ধ করিয়া দেখিতে লাগিল।

মাসের শেষে অখিলবাবু অপুর জন্য একটা ছেলে পড়ানো ঠিক করিয়া দিলেন, দুইবেলা একটা ছোট ছেলে ও একটি মেয়েকে পড়াইতে হইবে মাসে পনেরো টাকা।

অখিলবাবুর মেসে পরের বিছানায় শুইয়া থাকা তাহার পছন্দ হয় না। কিন্তু কলেজ হইতে ফিরিয়া পথে কয়েকটি মেসে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, পনেরো টাকা মাত্র আয়ে কোনো মেসে থাকা চলে না। তাহার ক্লাসের কয়েকটি ছেলে মিলিয়া একখানা ঘর ভাড়া করিয়া থাকিত, নিজেরাই রাঁধিয়া খাইত, অপুকে তাহারা লইতে রাজী হইল।

যে তিনটি ছেলে একসঙ্গে ঘর ভাড়া করিয়া থাকে, তাহাদের সকলেরই বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলায়। ইহাদের মধ্যে সুরেশ্বরের আয় কিছু বেশী, এম-এ ক্লাসের ছাত্র, চল্লিশ টাকার টিউশনি আছে। জানকী যেন কোথায় ছেলে পড়াইয়া কুড়ি টাকা পায়। নির্মলের আয় আরও কম। সকলের আয় একত্র করিয়া যে মাসে যাহা

অকুলান হয়, সুরেশ্বর নিজেই তাহা দিয়া দেয়, কাহাকেও বলে না। অপু প্রথমে তাহা জানিত না, মাস দুই থাকিবার পর তাহার সন্দেহ হইল প্রতিমাসে সুরেশ্বর পঁচিশ-ত্রিশ টাকা দোকানের দেনা শোধ করে, অথচ কাহারও নিকট চায় না কেন? সুরেশ্বরের কাছে একদিন কথাটা তুলিলে, সে হাসিয়া উড়াইয়া দিল। সে বেশী এমন কিছু দেয় না, যদিই বা দেয়—তাহাতেই বা কি? তাহাদের যখন আয় বাড়িবে তখন তাহারাও অনায়াসে দিতে পারিবে, কেহ বাধা দিবে না তখন।

নির্মল রবি ঠাকুরের কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে ঘরে ঢুকিল। তাঁহার গায়ে খুব শক্তি, সুগঠিত মাংসপেশী, চওড়া বুক। অপুর মতই বয়স। হাতের ভিতর একটা কাগজের ঠোঙা দেখাইয়া বলিল—নতুন মটরশুঁটি লঙ্কা দিয়ে ভেজে—

অপু হাত হইতে ঠোঙাটা কাড়িয়া লইয়া বলিল—দেখি? পরে হাসিমুখে বলিল—সুরেশ্বরদা, স্টোভ ধরিয়ে নিন—আমি মুড়ি আনি—ক'পয়সার আনবো? এক-দুই-তিন-চার—

—আমার দিকে আঙুল দিয়ে গুণো না ওরকম—

অপু হাসিয়া নির্মলের দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিল—তোমার দিকেই আঙুল বেশী ক'রে দেখাবো—তিন-তিন-তিন—

নির্মল তাহাকে ধরিতে যাইবার পূর্বে সে হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। সুরেশ্বর বলিল—একরাশ বই এনেছে কলেজের লাইব্রেরী থেকে—এতও পড়তে পারে—মায় মম্‌সেনের রোমের হিষ্ট্রি এক ভল্যুম—

অপুর গলা মিষ্টি বলিয়া সন্ধ্যার পর সবাই গান গাওয়ার জন্য ধরে। কিন্তু পুরাতন লাজুকপনা তাহার এখনও যায় নাই, অনেক সাধ্যসাধনার পর একটি বা দুটি গান গাহিয়া থাকে, আর কিছুতেই গাওয়ানো যায় না। কিন্তু রবি ঠাকুরের কবিতার সে বড় ভক্ত, নির্মলের চেয়েও। যখন কেউ ঘরে থাকে না, নির্জনে হাত-পা নাড়িয়া আবৃত্তি করে—

সন্ন্যাসী উপগুপ্ত

মথুরাপুরীর প্রাচীরের তলে,

একদা ছিলেন সুপ্ত।

ইতিহাসের অধ্যাপক মিঃ বসুকে অপুর সবচেয়ে ভাল লাগে। সবদিন তাঁহার ক্লাস থাকে না—কলেজের পড়ায় কোন উৎসাহ থাকে না সেদিন। কালো রিবন-ঝোলানো পাঁশ-নে চশমা পরিয়া উজ্জ্বলচক্ষু মিঃ বসু ক্লাসরুমে ঢুকিলেই সে নড়িয়া চড়িয়া সংযত হইয়া বসে, বক্তৃতার প্রত্যেক কথা মন দিয়া শোনে। এম-এ-তে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। অপুর ধারণায় মহাপণ্ডিত।—গিবন বা মম্‌সেন বা লর্ড ব্রাইস্ জাতীয়। মানবজাতির সমগ্র ইতিহাস—ঈজিপ্ট, ব্যাবিলন, আসিরিয়া, ভারতবর্ষীয় সভ্যতার উত্থানপতনেব কাহিনী তাঁহার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে ছবির মত পড়িয়া আছে।

ইতিহাসের পরে লজিকের ঘণ্টা। হাজিরা ডাকিয়া অধ্যাপক পড়ানো শুরু করিবার সঙ্গে সঙ্গেই ছেলে কমিতে শুরু করিল। অপু এ ঘণ্টায় পিছনের বেঞ্চিতে বসিয়া লাইব্রেরী হইতে লওয়া ইতিহাস উপন্যাস বা কবিতার বই পড়ে, অধ্যাপকের কথার দিকে এতটুকু মন দেয় না, শুনিতে ভাল লাগে না। সেদিন একমনে অন্য বই পড়িতেছে হঠাৎ অধ্যাপক তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কি প্রশ্ন করিলেন। প্রশ্নটা সে শুনিতে পায় নাই, কিন্তু ক্লাস হঠাৎ নীরব হইয়া যাওয়াতে তাহার চমক ভাঙ্গিল, চাহিয়া দেখিল সকলেরই চোখ তাহার দিকে। সে উঠিয়া দাঁড়াইল। অধ্যাপক বলিলেন—তোমার হাতে এখানা লজিকের বই?

অপু বলিল—না স্যার, প্যালগ্রেভের গোল্ডেন ট্রেজারি—

—তোমাকে যদি আমার ঘণ্টায় পার্সেন্টেজ না দিই? পড়া শোনো না কেন?

অপু চুপ করিয়া রহিল। অধ্যাপক তাহাকে বসিতে বলিয়া পুনরায় অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন। জানকী চিমটি কাটিয়া বলিল

—হ'ল তো? রোজ রোজ বলি লজিকের ঘণ্টায় আমাদের সঙ্গে পালাতে—তা শোনা হয় না—আয় চলে—

দেড়শত ছেলের ক্লাস। পিছনের বেঞ্চের সামনের দরজাটি ছেলেরা ইচ্ছা করিয়া খুলিয়া রাখে পলাইবার সুবিধার জন্য। জানকী এদিক ওদিক চাহিয়া সুড়ুৎ করিয়া সরিয়া পড়িল। তাহার পরে বিরাজ। অপুও মহাজনদের পথ ধরিল। নীচে আসিলে লাইব্রেরীয়ান বলিল—কি রায় মশাই, আমাদের পার্বণীটা কি পাব না।

অপু খুব খুশী হয়। কে তাহাকে চিনিত পাঁচ মাস আগে! এতবড় কলিকাতা শহর, এতবড় কলেজ, এত ছেলে। এখানেও তাহাকে রায় মশাই বলিয়া খাতির করিতেছে, তাহার কাছে পার্বণী চাহিতেছে! সে হাসিয়া বলে—কাল এনে দেবো ঠিক সত্যবাবু, আজ ভুলে গেছি—আপনি এক ভল্যুম গিবন্ দেবেন কিন্তু আজ—

উৎসাহে পড়িয়া গিবন্ বাড়ি লইয়া যায় বটে কিন্তু ভাল লাগে না। এত খুঁটিনাটি বিরক্তিকর মনে হয়। পরদিন সেখানা ফেরত দিয়া অন্য ইতিহাস লইয়া গেল।

পূজার কিছু পূর্বে অপুদের বাসা উঠিয়া গেল। খরচে আয়ে অনেকদিন হইতে কুলাইতেছিল না, সুরেশ্বরের ভাল টিউশনিটা হঠাৎ হাতছাড়া হইল—কে বাড়তি খরচ চালায়? নির্মল ও জানকী অন্য কোথায় চলিয়া গেল, সুরেশ্বর গিয়া মেসে উঠিল। অপুর যে মাসিক আয়, কলেজের মাহিনা দিয়া তাহা হইতে বারো টাকা বাঁচে—কলিকাতা শহরে বারো টাকায় যে কিছুতেই চলিতে পারে না, অপুর সে জ্ঞান এতদিনেও হয় নাই। সুতরাং সে ভাবিল বারো টাকাতেই চলিবে, খুব চলিবে। বারো টাকা কি কম টাকা!

কিন্তু বারো টাকা আয়ও বেশীদিন রহিল না, একদিন পড়াইতে গিয়া শুনিল, ছেলের শরীর খারাপ বলিয়া ডাক্তার হাওয়া বদলাইতে বলিয়াছে, পড়াশুনা এখন বন্ধ থাকিবে। এক মাসের মাহিনা তাহারা বাড়তি দিয়া জবাব দিল।

টাকা কয়টি পকেটে করিয়া সেখান হইতে বাহির হইয়া অপু আকাশ-পাতাল ভাবিতে ভাবিতে ফুটপাথ বাহিয়া চলিল। সুরেশ্বরের মেসে সে জিনিসপত্র রাখিয়া দিয়াছে, সেইখানেই গেষ্ট-চার্জ দিয়া খায়, রাত্রে মেসের বারান্দাতে শুইয়া থাকে। টাকা যাহা আছে, মেসের দেনা মিটাইতে যাইবে। সামান্য কিছু হাতে থাকিতে পারে বটে, কিন্তু তাহার পর ?

সুরেশ্বরের মেসে আসিয়া নিজের নামের একখানি পত্র ডাকবাক্সে দেখিল। হাতের লেখাটা সে চেনে না—খুলিয়া দেখিল চিঠিখানা মায়ের, কিন্তু অপরের হাতের লেখা। হাতে ব্যথা হইয়া মা বড় কষ্ট পাইতেছেন, অপু কি তিনটি টাকা পাঠাইয়া দিতে পারে ? মা কখনো কিছু চান না, মুখ বুজিয়া সকল দুঃখ সহ্য করেন, সে-ই বরং দেওয়ানপুরে থাকিতে নানা ছল-ছুতায় মাঝে মাঝে কত টাকা মায়ের কাছ হইতে লইয়াছে। হাতে না থাকিলেও তেলিবাড়ি হইতে চাহিয়া-চিন্তিয়া মা যোগাড় করিয়া দিতেন। খুব কষ্ট না হইলে কখনো মা তাহাকে টাকার জন্য লেখেন নাই।

পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া গুণিয়া দেখিল সাতাশটি টাকা আছে। মেসের দেনা সাড়ে পনেরো টাকা বাদে সাড়ে এগারো টাকা থাকে। মাকে কত টাকা পাঠানো যায় ? মনে মনে ভাবিল তিনটে টাকা তো চেয়েছেন, আমি দশ টাকা পাঠিয়ে দিই, মনিঅর্ডার পিওন যখন টাকা নিয়ে যাবে, মা ভাববেন, বুঝি তিন টাকা কিংবা হয়তো দু'টাকার মনিঅর্ডার—জিজ্ঞেস করবেন, কত টাকা ? পিওন যেই বলবে দশ টাকা, মা অবাক হয়ে যাবেন। মাকে তাক লাগিয়ে দেবো ভারি মজা, বাড়িতে গেলে মা শুধু সেই গল্পই করবেন দিনরাত—

অপ্রত্যাশিত টাকা প্রাপ্তিতে মায়ের আনন্দোজ্জ্বল মুখখানা কল্পনা করিয়া অপু ভারী খুশী হইল। বৌবাজার পোস্টআফিস হইতে টাকাটা পাঠাইয়া দিয়া সে ভাবিল—বেশ হ'ল। আহা, মাকে কেউ কখনো দশ টাকার মনিঅর্ডার এক সঙ্গে পাঠায় নি—টাকা পেয়ে খুশী

হবেন। আমার তো এখন রইল দেড় টাকা, তারপর একটা কিছু ঠিক হয়ে যাবেই।

কলেজের একটি ছেলের সঙ্গে তাহার খুব বন্ধুত্ব হইয়াছে। সেও গরীব ছাত্র, ঢাকা জেলায় বাড়ি, নাম প্রণব মুখার্জি। খুব লম্বা, গৌরবর্ণ, দোহারা চেহারা, বুদ্ধিপ্রোজ্জ্বল দৃষ্টি। কলেজ-লাইব্রেরীতে এক সঙ্গে বসিয়া বই পড়িতে পড়িতে দু'জনের আলাপ। এমন সব বই দু'জনে লইয়া যায়, যাহা সাধারণ ছাত্রেরা পড়ে না, নামও জানে না। ফার্স্ট-ইয়ারের ছেলেকে মেম্‌সেন লইতে দেখিয়া প্রণব তাহার দিকে প্রথম আকৃষ্ট হয়। আলাপ ক্রমে বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছে।

অপু শীঘ্রই বুঝিতে পারিল, প্রণবের পড়াশুনা তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী। অনেক গ্রন্থাকারের নামও সে কখনো শোনে নাই —নীট্‌শে, এমার্সন, টুর্গেনিভ, ব্রেস্টেড্‌—প্রণবের কথায় সে ইহাদের বই পড়িতে আরম্ভ করিল। তাহারই উৎসাহে সে পুনরায় ধৈর্য ও অধ্যাবসায়ের সহিত গিবন্‌ শুরু করিল, ইলিয়াডের অনুবাদ পড়িল।

অপুর পড়াশুনার কোনও বাঁধাবাধি রীতি নাই। যখন যাহা ভাল লাগে, কখনও ইতিহাস, কখনও নাটক, কখনও কবিতা, কখনও প্রবন্ধ, কখনও বিজ্ঞান। প্রণব নিজে অত্যন্ত সংযমী ও শৃঙ্খলাপ্রিয়। সে বলিল, ওতে কিছু হবে না, ওরকম পড় কেন?

অপু চেষ্টা করিয়াও পড়াশুনার শৃঙ্খলা আনিতে পারিল না। লাইব্রেরী ঘরের ছাদ পর্যন্ত উঁচু বড় বড় বইয়ে ভরা আলমারির দৃশ্য তাহাকে দিশাহারা করিয়া দেয়। সকল বই খুলিয়া দেখিতে সাধ যায়,—Gases of the Atmosphere—স্যার উইলিয়াম র‍্যামজের। সে পড়িয়া দেখিবে কি কি গ্যাস। Extinct Animals —ই. রে. ল্যান্‌কাস্টার, জানিবার তার ভয়ানক আগ্রহ। Worlds Around Us—প্রক্টর। উঃ, বইখানা না পড়িলে রাত্রে ঘুম হইবে না। প্রণব হাসিয়া বলে—দূর! ও কি পড়া? তোমার তো পড়া নয়, পড়া পড়া খেলা—

এত বড় লাইব্রেরী, এত বই। নক্ষত্রজগৎ হইতে শুরু করিয়া

পৃথিবীর জীবজগৎ, উদ্ভিদজগৎ, আণুবীক্ষণিক প্রাণিকুল, ইতিহাস সব সংক্রান্ত বই। তাহার অধীর উৎসুক মন চায় এই বিশ্বের সব কথা জানিতে। বুঝিতে পারুক আর নাই পারুক—একবার বইগুলি খুলিয়া দেখিতেও সাধ যায়! লুপ্ত প্রাণীকুল সম্বন্ধে খানকতক ভাল বই পড়িল—অলিভার লজের Pioneers of Science—বড় বড় নীহারিকাদের ফটো দেখিয়া মুগ্ধ হইল। নীট্‌শে ভাল বুঝিতে না পারিলেও দু-তিনখানা বই পড়িল। টুর্গেনেভ একেবারে শেষ করিয়া ফেলিল, বারোখানা না ষোলখানা বই। চোখের সামনে টুর্গেনেভ এক নতুন জগৎ খুলিয়া দিয়া গেল—কি অপূর্ব হাসি-অশ্রু-মাখানো কল্পলোক।

প্রণবের কাছেই সে সন্ধান পাইল, শ্যামবাজারে এক বড়লোকের বাড়ি দরিদ্র ছাত্রদের খাইতে দেওয়া হয়। প্রণবের পরামর্শে সে ঠিকানা খুঁজিয়া সেখানে গেল। এ পর্যন্ত কখনও কিছু সে চায় নাই, কাহারও কাছে চাহিতে পারে না; আত্মমর্যাদাবোধের জন্য নহে, লাজুকতা ও আনাড়ীপনার জন্য। এতদিন সে-সবের দরকারও হয় নাই, কিন্তু আর যে চলে না।

খুব বড়লোকের বাড়; দারোয়ান বলিল—কি চাই?

অপু বলিল, এখানে গরীব ছেলেদের খেতে দেয়, তাই জানতে—কাকে বলবো জানো?

দারোয়ান তাহাকে পাশের দিকে একটা ছোট ঘরে লইয়া গেল।

ইলেক্‌ট্রিক পাখার তলায় একজন মোটাসোটা ভদ্রলোক বসিয়া কি লিখিতেছিলেন। মুখ তুলিয়া বলিলেন—এখানে কি দরকার আপনার?

অপু সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল—এখানে কি পুওর ষ্টুডেণ্টদের খেতে দেওয়া হয়? তাই আমি—

—আপনি দরখাস্ত করেছিলেন?

কিসের দরখাস্ত অপু জানে না।

—জুন মাসে দরখাস্ত করতে হয়, আমাদের নাম্বার লিমিটেড

কিনা, এখন আর খালি নেই ? আবার আসছে বছর—তাছাড়া, আমরা ভাবছি ওটা উঠিয়ে দেবো, এস্টেট রিসিভারের হাতে যাচ্ছে, ও-সব আর সুবিধে হবে না।

ফিরিবার সময় গেটের বাহিরে আসিয়া অপুর মনে বড় কষ্ট হইল। কখনও সে কাহারও নিকট কিছু চায় নাই, চাহিয়া বিমুখ হইবার দুঃখ কখনও ভোগ করে নাই, চোখে তাহার প্রায় জল আসিল।

পকেটে মাত্র আনা দুই পয়সা অবশিষ্ট আছে—এই বিশাল কলিকাতা শহরে তাহাই শেষ অবলম্বন। কাহাকেই বা সে এখানে চেনে, কাহার কাছে যাইবে ? অখিলবাবুর মেসে দুই মাস সে প্রথম খাইয়াছে, সেখানে যাইতে লজ্জা করে। সুরেশ্বরের নিজেরই চলে না ; তাহার উপর সে কখনও জুলুম করিতে পারিবে না।

আরও কয়েকদিন কাটিয়া গেল। কোনদিন সুরেশ্বরের মেসে এক বেলা খাইয়া, কোনদিন বা জানকীর কাছে কাটাইয়া চলিতেছিল। একদিন সারাদিন না খাওয়ার পর সে নিরুপায় হইয়া অখিলবাবুর মেসে সন্ধ্যার পর গেল। অখিলবাবু অনেকদিন পর তাহাকে পাইয়া খুশী হইলেন। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর অনেকক্ষণ গল্প-গুজব করিলেন। বলি বলি করিয়াও অপু নিজের দুর্দশার কথা অখিলবাবুকে বলিতে পারিল না। তাহা হইলে হয়তো তিনি তাহাকে ছাড়িবেন না, সেখানে থাকিতে বাধ্য করিবেন। সে জুলুম করা হয় অনর্থক।

কিন্তু এদিকে আর চলে না। এক জায়গায় বই, এক জায়গায় বিছানা। কোথায় কখন রাত কাটাইবে কিছু ঠিক নাই ইহাতে পড়াশুনা হয় না। পরীক্ষাও নিকটবর্তী। না খাইয়াই বা কয় দিন চলে।

অখিলবাবুর মেস হইতে ফিরিবার পথে একটা খুব বড় বাড়ি। ফটকের কাছে মোটর গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে। এই বাড়ির লোকে যদি ইচ্ছা করে তবে এখনি তাহার কলিকাতায় থাকার সকল ব্যবস্থা

করিয়া দিতে পারে। সাহস করিয়া যদি সে বলিতে পারে, তবে হয়তো এখুনি হয়। একবার সে বলিয়া দেখিবে?

কোথাও কিছু সুবিধা না হইলে, তাহাকে বাধ্য হইয়া পড়াশুনা ছাড়িয়া দিয়া দেশে ফিরিতে হইবে। এই লাইব্রেরী, এত বই, বন্ধুবান্ধব, কলেজ—সব ফেলিয়া হয়তো মনসাপোতায় গিয়া আবার পুরাতন জীবনের পুনরাবৃত্তি করিতে হইবে। পড়াশুনা তাহার কাছে একটা রোমান্স, একটা অজানা বিচিত্র জগৎ দিনে দিনে চোখের সামনে খুলিয়া যাওয়া, ইহাকে সে চায়, ইহাই এতদিন চাহিয়া আসিয়াছে। কলেজ হইতে বাহির হইয়া চাকরি, অর্থোপার্জন—এসব কথা সে কোনদিন ভাবে নাই, তাহার মাথার মধ্যে কোন-দিন এসব সাংসারিক কথা ঢোকে নাই—সে চায় এই অজানার রোমান্স—এই বিচিত্র ভাবধারার সহিত আরও ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ। প্রাচীন দিনের জগৎ, অধুনালুপ্ত অতিকায় প্রাণীদল, বিশাল শূন্যের দৃশ্য, অদৃশ্য গ্রহনক্ষত্ররাজি, ফরাসী বিদ্রোহ—নানা কথা। এই সব ছাড়িয়া শালগ্রাম হাতে মনসাপোতায় বাড়ি-বাড়ি ঠাকুর পূজা···।

অপুর মনে হইল—এই রকমই বড় বাড়ি আছে লীলাদের, কলিকাতারই কোন জায়গায়। অনেকদিন আগে লীলা তাহাকে বলিয়াছিল, কলিকাতায় তাহাদের বাড়িতে থাকিয়া পড়িতে। সে ঠিকানা জানে না—কোথায় লীলাদের বাড়ি, কে-ই বা এখানে তাহাকে বলিয়া দিবে, তাহা ছাড়া সে-সব আজ ছয় সাত বছরের কথা হইয়া গেল, এতদিন কি আর লীলা তাহার কথা মনে রাখিয়াছে? কোন্ কালে ভুলিয়া গিয়াছে।

অপু ভাবিল—ঠিকানা জানলেই কি আর আমি সেখানে যেতে পারতাম না, গিয়ে কিছু বলতে—সে আমার কাজ নয়—তার ওপর এই অবস্থায়। দূর, তা কখনও হয়? তাছাড়া লীলার বিয়ে-থাওয়া হয়ে এতদিন সে শ্বশুরবাড়ি চলে গিয়েছে। সে সব কি আর আজকের কথা?

ক্লাসে জানকী একদিন একটা সুবিধার কথা বলিল। সে

ঝামাপুকুরে কোন ঠাকুরবাড়িতে রাত্রে খায়। সকালে কোথায় ছেলে পড়াইয়া একবেলা তাহাদের সেখানে খায়। সম্প্রতি সে বোনের বিবাহে বাড়ি যাইতেছে, ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত অপু রাত্রে ঠাকুরবাড়িতে তাহার বদলে খাইতে পারে? বাড়ি যাইবার পূর্বে ঠাকুরবাড়ির সেবাইতকে বলিয়া কহিয়া সে সব ব্যবস্থা করিয়া যাইবে এখন। অপু রাজী আছো?

রাজী? হাতে স্বর্গ পাওয়া নিতান্ত গল্প কথা নয় তাহা হইলে!

ঠাকুরবাড়ির খাওয়া নিতান্ত মন্দ নয়। অপুর কাছে তাহা খুব ভাল লাগে। আলোচালের ভাত, টক, কোনও কোনও দিন ভোগের পায়েসও পাওয়া যায়, তবে মাছ মাংসের সংস্পর্শ নাই, নিরামিষ।

কিন্তু এ তো আর দু'বেলা নয়; শুধু রাত্রে। দিনমানটাতে বড় কষ্ট হয়। দুই পয়সার মুড়ি ও কলের জল। তবুও তো পেটটা ভরে। কলেজ হইতে বাহির হইয়া বৈকালে তাহার এত ক্ষুধা পায় যে গা ঝিম্ ঝিম করে, পেটে যেন এক ঝাঁক বোলতা হুল ফুটাইতেছে —পয়সা জুটাইতে পারিলে অপু এ সময়টা পথের ধারের দোকান হইতে এক পয়সার ছোলা ভাজা কিনিয়া খায়।

সব দিন পয়সা থাকে না, সেদিন সন্ধ্যার পরেই ঠাকুরবাড়ি চলিয়া যায়, কিন্তু ঠাকুরের আরতি শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেখানে খাইতে দিবার নিয়ম নাই—তাও একবার নয়, দুইবার দুটি ঠাকুরের আরতি। আরতির কোন নির্দিষ্ট সময় নাই, সেবাইত ঠাকুরের মর্জি ও সুবিধামত রাত আটটাতেও হয়, ন'টাতেও হয়, দশটাতেও হয় আবার এক-একদিন সন্ধ্যার পরেই হয়।

মায়ের কাছে অপু চার

সন্ধ্যা ঠিক হয় নাই, উঠানে তেলি-বাড়ির বৌ দাঁড়াইয়া কি গল্প করিতেছিল, দূর হইতে অপুকে আসিতে দেখিয়া হাসিমুখে বলিল —কে আসছে বলুন তো মা-ঠাক্‌রুণ ?—সর্বজয়ার বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিল, অপু নয় তো—অসম্ভব—সে এখন কেন—

পরক্ষণেই সে ছুটিয়া আসিয়া অপুকে বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিল। সর্বজয়ার চোখের জলে তাহার জামার হাতাটা ভিজিয়া উঠিল। মাকে যেন নিজের অপেক্ষা মাথায় ছোট, দুর্বল ও অসহায় বলিয়া অপুর মনে হইতে লাগিল। তপঃকৃশ শবরীর মত ক্ষীণাঙ্গী, আলুথালু, অর্ধরুক্ষ চুলের গোছা একদিকে পড়িয়াছে, মুখের চেহারা এখনও সুন্দর, গ্রীবা ও কপালের রেখাবলী এখনও অনেকাংশে ঋজু ও সুকুমার। তবে এবারে মায়ের চুল পাকিয়াছে, কানের পাশের চুলে পাক ধরিয়াছে। নিজের সরল দৃঢ় বাহু-বেষ্টনে, সরলা, চিরদুঃখিনী মাকে সংসারের সহস্র দুঃখ-বিপদ হইতে বাঁচাইয়া রাখিতে অপুর ইচ্ছা যায়। এ ভাবটা এইবার প্রথম সে মনের মধ্যে অনুভব করিল, ইতিপূর্বে কখনও হয় নাই।

বড়-বৌ একপাশে হাসিমুখে দাঁড়াইয়াছিল, সে অপুকে ছোট দেখিয়াছে এখন আর তাহাকে দেখিয়া ঘোমটা দেয় না। সর্বজয়া বলিল—এবার ও এসেছে বৌমা এবার কালই কিন্তু।

অপু নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কি খুড়ীমা, কাল কি ?

বড় বৌ হাসিয়া বলিল,—দেখো কাল,—আজ বলবো না তো।

খিচুড়ী খাইতে ভালবাসে বলিয়া সর্বজয়া অপুকে রাত্রে খিচুড়ী রাঁধিয়া দিল ; পেট ভরিয়া খাওয়া ঘটিল, এই সাত-আট দিন পর আজ মায়ের কাছে। সর্বজয়া জিজ্ঞাসা করিল,—হ্যাঁ রে সেখানে খিচুড়ী খেতে পাস ?

অপুর শৈশবে তাহার মা শত প্রতারণার আবরণে নগ্ন দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর রূপকে তাহাদের শিশুচক্ষুর আড়াল করিয়া রাখিত, এখন আবার অপুর পালা। সে বলিল—হুঁ, বাদলা হলেই খিচুড়ী হয়।

—কি ডালের করে ?

—মুগের বেশী, মসুরীরও করে, খাঁড়ি মসুরী।

—সকালে জলখাবার খেতে দেয় কি কি ?

অপু প্রাতঃকালীন জলযোগের কথা এক কাল্পনিক বিবরণ খুব উৎসাহের সহিত বিবৃত করিয়া গেল। মোহনভোগ, চা, এক এক-দিন লুচিও দেয়। খাওয়ার বেশ সুবিধা।

টুইশনি কোন্‌কালে চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু অপু সে কথা মাকে জানায় নাই ; সর্বজয়া বলিল—হ্যাঁরে, তুই যে মেয়েটিকে পড়াস —তাকে কি বলে ডাকিস ? খুব বড়লোকের মেয়ে, না ?

—তার নাম ধরেই ডাকি—

—দেখতে শুনতে বেশ ভাল ?

—বেশ দেখতে—

—হ্যাঁ রে তোর সঙ্গে বিয়ে দেয় না ? বেশ হয় তা হ'লে—

অপু লজ্জারক্ত মুখে বলিল,—হ্যাঁ—তারা হ'ল বড়লোক—আমার সঙ্গে—তা কি কখনও—তোমার যেমন কথা !

সর্বজয়ার কিন্তু মনে মনে বিশ্বাস অপুর মত ছেলে পাইলে লোকে এখনি লুফিয়া লইবে। অপু ভাবে, তবুও তো মা আসল কথা কিছুই জানে না। টুইশনি থাকিলে কি আর না খাইয়া দিন যায় কলিকাতায় ?

অপু দেখিল—সে যে টাকা পাঠায় নাই, মা একটিবারও সে কথা উত্থাপন করিল না, শুধুই তাহার কলিকাতায় অবস্থানের সুবিধা-অসুবিধা সংক্রান্ত নানা আগ্রহ-ভরা প্রশ্ন। নিজেকে এমনভাবে সর্বপ্রকারে মুছিয়া বিলোপ করিতে তাহার মায়ের মত সে আর কাহাকেও এ পর্যন্ত দেখে নাই। সে জানিত বাড়ি গেলে এ লইয়া মা কোন কথা তুলিবে না।

সর্বজয়া একটা এনামেলের বাটি ও গ্লাস ঘরের ভিতর হইতে আনিয়া হাসিমুখে বলিল,—এই ছ্যাখ, এই হু'খানা ছেড়া কাপড় বদলে তোর জন্য নিইচি—বেশ ভালো, না। কত বড় বাটিটা ছ্যাখ।

অপু ভাবিল, মা যা ছ্যাখে তাই বলে ভালো, এ আর কি ভালো, যদি আমার সেই পুরানো দোকানে কেনা প্লেটগুলো মা দেখত ?

কলিকাতায় সে হুরূহ জীবন-সংগ্রামের পর এখানে বেশ আনন্দে ও নির্ভাবনায় দিন কাটে। রাত্রে মায়ের কাছে শুইয়া সে আবার নিজেকে ছেলেমানুষের মত মনে করে—বলে, সেই গানটা কি মা, ছেলেবেলায় তুমি আর আমি শুয়ে শুয়ে রাত্রে গাইতাম—এক একদিন দিদিও—সেই চিরদিন কখনও সমান না যায়—কভু বনে বনে রাখালের সনে, কভু বা রাজত্ব পায়।

পরে আবদারের সুরে বলে—গাও না মা, গানটা ?

সর্বজয়া হাসিয়া বলে—হ্যাঁ, এখনকি আর গলা আছে—দূর—

—এসো হু'জনে গাই—এসো না মা—খুব হবে, এসো—

সর্বজয়ার মনে আছে—অপু যখন ছোট ছিল তখন কোনও কোনও মেয়ে-মজলিসে, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের গান হয়ত হইত, অপুর গলা ছিল খুব মিষ্টি কিন্তু তাহাকে প্রথমে কিছুতেই গান-গাওয়ানো যাইত না—অথচ যেদিন তাহার গাহিবার ইচ্ছা হইত, সেদিন মায়ের কাছে চুপি চুপি বার বার বলিত, আমি কিন্তু আজ গান গাইবো না, গাইতে বলো না। অর্থাৎ সেদিন তাকে এক আধবার বলিলেই সে গাহিবে। সর্বজয়া ছেলের মন বুঝিয়া অমনি বলিত—তা অপু

এবার কেন একটা গান কর না ?…ছু' একবার লাজুক-মুখে অস্বীকার করার পর অমনি অপু গান শুরু করিয়া দিত।

সেই অপু এখন একজন মানুষের মত মানুষ। এত রূপ এ অঞ্চলের মধ্যে কে কবে দেখিয়াছে ? একহারা চেহারা বটে, কিন্তু সবল, দীর্ঘ, শক্ত হাত-পা। কি মাথার চুল, কি ডাগর চোখের নিষ্পাপ পবিত্র দৃষ্টি ; রাঙা ঠোঁটের ছ'পাশে বাল্যের সে সুকুমার ভঙ্গী এখনও বিলুপ্ত হয় নাই, শুধু সর্বজয়াই তাহা ধরিতে পারে।

অপু কিন্তু সে ছেলেবেলার অপু আর নাই। প্রায় সবই বদলাইয়া গিয়াছে, সে অপূর্ব হাসি, সে ছেলেমানুষী, সে কথায় কথায় মান অভিমান, আবদার, গলায় সে রিণ্‌রিণে মিষ্টি সুর—এখনও অপুর স্বর খুবই মিষ্টি—তবুও সে অপরূপ বাল্যস্বর, সে চাঞ্চল্য—পাগলামি—সে সবের কিছুই নাই। সব ছেলেই বাল্যে সমান ছেলেমানুষ থাকে না কিন্তু অপু ছিল মূর্তিমান শৈশব। সরলতায়, ছুষ্টামিতে, রূপে, ভাবুকতায়—দেবশিশুর মত! এক ছেলে ছিল তাই কি, শত ছেলেতে কি হয় ? সর্বজয়া মনে মনে বলে—বেশী চাই নে, দশটা পাঁচটা চাইনে ঠাকুর, ওকেই আর জন্মে আবার কোলজোড়া ক'রে দিও।

সর্বজয়ার জীবনের পাত্র পরিপূর্ণ করিয়া অপু যে অমৃত শৈশবে পরিবেশন করিয়াছে, তারই স্মৃতি তার ছুঃখ-ভরা জীবনপথের পাথেয়। আর কিছুই সে চায় না।

কোনও কোনও দিন রাত্রে অপু মায়ের কাছে গল্প শুনিতে চায়। সর্বজয়া বলে—তুই তো কত ইংরেজি বই পড়িস, কত কি—তুই একটা গল্প বল না বরং শুনি। অপু গল্প করে। ছু'জনে নানা পরামর্শ করে, সর্বজয়া পুত্রের বিবাহ দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। কাঁটাদহের সাণ্ডাল বাড়ি নাকি ভালো মেয়ে আছে সে শুনিয়াছে, অপু পাশটা দিলেই এইবার…

তারপর অপু বলিল,—ভালো কথা মা—আজকাল জ্যেঠিমারা কলকাতায় বাড়ি পেয়েছে যে! সেদিন তাদের বাড়ি গেছলাম—

সর্বজয়া বলে,—তাই নাকি?…তোকে খুব যত্নটত্ন করলে?—কি খেতে দিলে—

অপু নানা কথা সাজাইয়া বানাইয়া বলে। সর্বজয়া বলে—আমায় একবার নিয়ে যাবি—কলকাতা কখনও দেখিনি, বট্‌ঠাকুরদের বাড়ি ছুদিন থেকে মা-কালীর চরণ দর্শন ক'রে আসি তা হ'লে?…

অপু বলে,—বেশ তো মা, নিয়ে যাব, যেও সেই পুজোর সময়।

সর্বজয়া বলে,—একটা সাধ আছে অপু, বট্‌ঠাকুরদের দরুন নিশ্চিন্দিপুরের বাগানখানা মানুষ হয়ে যদি নিতে পারতিস ভুবন মুখুয্যেদের কাছ থেকে, তবে—

সামান্য সাধ, সামান্য আশা। কিন্তু যার সাধ, যার আশা, তার কাছে তা ছোটও নয়, সামান্যও নয়। মায়ের ব্যথা কোন্‌খানে অপুর তাহা বুঝিতে দেরি হয় না। মায়ের অত্যন্ত ইচ্ছা নিশ্চিন্দিপুরে গিয়া বাস করা, সে অপু জানে। সর্বজয়া বলে,—তুই মানুষ হ'লে, তোর একটা ভাল চাকরি হ'লে তোর বৌ নিয়ে তখন আবার নিশ্চিন্দিপুরে গিয়ে ভিটেতে কোঠা উঠিয়ে বাস করবো। বাগানখানা কিন্তু যদি নিতে পারিস—বড় ইচ্ছে হয়।

অপুর কিন্তু একটা কথা মনে হয়, মা আর বেশীদিন বাঁচিবে না। মায়ের চেহারা অত্যন্ত রোগা হইয়া গিয়াছে এবার, কেবল অসুখে ভুগিতেছে। মুখে যত সান্ত্বনা, যত আশার কথা বলা—সব বলে। জানালার ধারে তক্তপোশে ছুপুরের পর মা একটু ঘুমাইয়া পড়ে, অনেক বেলা পড়িয়া যায়। অপু কাছে আসিয়া বসে, গায়ে হাত দিয়া বলে,—গা যে তোমার বেশ গরম, দেখি?

সর্বজয়া সে-সব কথা উড়াইয়া দেয়। এ-গল্প ও-গল্প করে। বলে হ্যাঁরে, অতসীর মা আমার কথা-টথা কিছু বলে?

অপু মনে মনে ভাবে—মা আর বাঁচবে না বেশী দিন। কেমন যেন—কেমন—কি ক'রে থাকব মা মারা গেলে?

অনেক বেলা পড়িয়া যায়—

জানালার পাশেই একটা আতা গাছ। আতা ফুলের মিষ্টি

ভুরভুরে গন্ধ বৈকালের বাতাসে। একটু পোড়ো জমি। এক ঢিবি সুরকি। একটা চারা জামরুল গাছ। পুরনো বাড়ির দেয়ালের ধারে ধারে বনমূলার গাছ। কন্টিকারীর ঝাড়। একটা জায়গায় কঞ্চি দিয়া ঘিরিয়া সর্বজয়া শাকের ক্ষেত করিয়াছে।

একটা অদ্ভুত ধরনের মনের ভাব হয় অপুর। কেমন এক ধরনের গভীর বিষাদ…মায়ের এই সব ছোটখাটো আশা, তুচ্ছ সাধ —কত নিষ্ফল।…মা কি ওই শাকের ক্ষেতের শাক খাইতে পারিবে? কালীঘাটের কালীদর্শন করিবে জ্যাঠাইমার বাসায় থাকিয়া!… নিশ্চিন্দিপুরের আমবাগান…

এক ধরনের নির্জনতা…সঙ্গীহীনতার ভাব…মায়ের উপর গভীর করুণা…রাঙা রোদ মিলাইতেছে চারা জামরুল গাছটাতে…সন্ধ্যা ঘনাইতেছে। ছাতারেও শালিক পাখির দল কিচ্-মিচ ও ঝটাপটি করিতেছে।…

অপুর চোখে জল আসিল…কি অদ্ভুত নির্জনতা মাখানো সন্ধ্যাটা! মুখে হাসিয়া সস্নেহে মায়ের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল,—আচ্ছা, মা, বড় বোয়ের সঙ্গে বাজি রেখেছিল কি নিয়ে— বলো না—বললে না তো সেদিন?…

ছুটি ফুরাইলে অপু বাড়ি হইতে রওনা হইল।

স্টেশনে আসিয়া কিন্তু ট্রেন পাইল না, গহনার নৌকা আসিতে অত্যন্ত দেরি হইয়াছে, ট্রেন আধ ঘণ্টা পূর্বে ছাড়িয়া দিয়াছে।

সর্বজয়া ছেলের বাড়ি হইতে যাইবার দিনটাতে অন্যমনস্ক থাকিবার জন্য কাপড়, বালিশের ওয়াড় সাজিমাটি দিয়া সিদ্ধ করিয়া বাঁশবনের ডোবার জলে কাচিতে নামিয়াছে—সন্ধ্যার কিছু পূর্বে অপু বাড়ির দাওয়ার জিনিসপত্র নামাইয়া ছুটিয়া ডোবার ধারে গিয়া পিছন হইতে ডাকিল,—মা!…

সর্বজয়া ভুলিয়া থাকিবার জন্য দুপুর হইতে কাপড় সিদ্ধ লইয়া

ব্যস্ত আছে, চমকিয়া পিছন দিকে চাহিয়া আনন্দ-মিশ্রিত সুরে বলে,—তুই, !—যাওয়া হ'ল না ?

অপু হাসিমুখে বলে,—গাড়ি পাওয়া গেল না—এসো বাড়ি—

বাঁশবনের ছায়ায় মায়ের মুখে সেদিন যে অপূর্ব আনন্দের ও তৃপ্তির ছাপ পড়িয়াছিল, অপু কোনও দিন তাহা দেখে নাই—বহুকাল পর্যন্ত মায়ের এ মুখখানা তাহার মনে ছিল। সেদিন রাত্রে দু'জনে নানা কথা। অপু আবার ছেলেবেলাকার গল্প শুনিতে চায় মা'র মুখে—সর্বজয়া লজ্জিত সুরে বলে—হ্যাঁ, আমার আবার গল্প! সে সব ছেলেবয়েসের গল্প—তা বুঝি এখনো শুনে তোর ভাল লাগবে। অপুকে আর সর্বজয়া বুঝিতে পারে না—এ সে ছোট্ট অপু নয়, যে ঠোঁট ফুলাইলেই সর্বজয়া বুঝিত ছেলে কি চাহিতেছে···এ কলেজের ছেলে, তরুণ অপু। এর মন, মতিগতি, আশা আকাঙ্ক্ষা—সর্বজয়ার অভিজ্ঞতার বাহিরে···অপু বলে,—না মা, তুমি সেই ছেলেবেলার শ্যামলঙ্কার গল্পটা করো। সর্বজয়া বলে,—তা আবার কি শুনবি—তুই বরং তোর বইয়ের একটা গল্প বল্—কত ভালো গল্প তো পড়িস!···
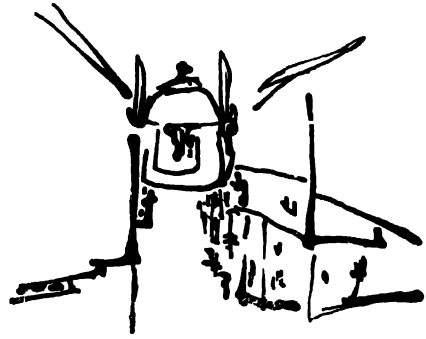
মাতৃহারা অপু — পাঁচ

পরদিন সে কলকাতায় ফিরিল।

কলেজ সেইদিনই প্রথম খুলিয়াছে, প্রমোশন পাওয়া ছেলেদের তালিকা বাহির হইয়াছে, নোটিশ বোর্ডের কাছে রথযাত্রার ভিড়—সে অধীর আগ্রহে ভিড় ঠেলিয়া নিজের নামটা আছে কিনা দেখিতে গেল।

আছে! দু'তিন বার বেশ ভাল করিয়া দেখিল। আরও আশ্চর্য এই যে পাশেই যে সব ছেলে পাশ করিয়াছে অথচ বেতন বাকী থাকার দরুণ প্রমোশন পায় নাই, তাহাদের একটা তালিকা দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তাহার মধ্যে অপুর নাম নাই, অথচ অপু জানে তাহারই সর্বাপেক্ষা বেশী বেতন বাকি!

সে ব্যাপারটা বুঝিতে না পারিয়া ভিড়ের বাহিরে আসিল। কেমন করিয়া এরূপ অসম্ভব সম্ভব হইল, নানাদিক হইতে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াও তখন কিছু ঠাহর করিতে পারিল না।

দু-তিন দিন পরে তাহার এক সহপাঠী নিজের প্রমোশন বন্ধ হওয়ার কারণ জানিতে অফিস-ঘরে কেরানীর কাছে গেল, সে-ও গেল সঙ্গে। হেড ক্লার্ক বলিল—একি ছেলের হাতের মোয়া হে ছোকরা! কত রোল?... পরে একখানা বাঁধানো খাতা খুলিয়া

আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—এই ভাখো রোল টেন—লাল কালির মার্কা মারা রয়েছে…দু'মাসের মাইনে বাকী—মাইনে শোধ না দিলে প্রমোশন দেওয়া হবে না, প্রিন্সিপালের কাছে যাও, আমি আর কি করবো?

অপু তাড়াতাড়ি ঝুঁকিয়া পাড়িয়া দেখিতে গেল—তাহার রোল নম্বর কুড়ি—একই পাতায়। দেখিল অনেক ছেলের নামের সঙ্গে কালিতে 'ডি' লেখা আছে অর্থাৎ ডিফল্টার—মাহিনা দেয় নাই। সঙ্গে সঙ্গে নামের উল্টোদিকে মন্তব্যের ঘরে কোন্ কোন মাসের মাহিনা বাকী তাহা লেখা আছে। কিন্তু তাহার নামটাতে কোন কিছু দাগ বা আঁচড় নাই—একেবারে পরিষ্কার মুক্তার মত হাতের লেখা জ্বলজ্বল করিতেছে—রায় অপূর্বকুমার—লাল কালির একটা বিন্দু পর্যন্ত নাই,…

ঘটনা হয়ত খুব সামান্য, কিছুই না—হয়ত এটা সম্পূর্ণ কলমের ভুল, না হয় কেরানীর হিসাবের ভুল, কিন্তু অপুর মনে ঘটনাটা গভীর রেখাপাত করিল।

সর্বজয়ার এরকম কোনও দিন হয় নাই। অপু চলিয়া যাওয়ার দিনটা হইতে বৈকালে তাহার মন এত হু হু করিতে লাগিল, যেন কেহ কোথাও নাই, একটা অসহায় ভাব, মনের উদাস অবস্থা। কত কথা, সারা জীবনের কত ঘটনা, কত আনন্দ ও অশ্রুর ইতিহাস একে একে মনে আসিয়া উদয় হয়। গত একমাস ধরিয়া এসব কথা মনে হইতেছে। নির্জনে বসিলেই বিশেষ করিয়া…। ছেলেবেলায় বুধী বলিয়া গাই ছিল বাড়িতে…বাল্যসঙ্গিনী হিমিদি…দু'জনে একসঙ্গে দো-পেটে গাঁদাগাছ পুঁতিয়া জল দিত। একদিন হিমিদি ও সে বন্যার জলে মাঠে ঘড়া বুকে সাঁতার কাটিতে গিয়া ডুবিয়া গিয়াছিল আর একটু হইলেই—

বিবাহ…মনে আছে। সেদিন দুপুরে খুব বৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার ছোট ভাই তখন বাঁচিয়া, লুকাইয়া তাহাকে নাড়ু দিয়া গিয়াছিল

হাতের মুঠায়। ছোট্ট ছেলেবেলায় অপু···কাচের পুতুলের মত রূপ···প্রথম স্পষ্ট কথা শিখিল, কি জানি কি করিয়া শিখিল 'ভিজে'। একদিন অপুকে কদ্‌মা হাতে বসাইয়া রাখিয়াছিল।
—কেমন খেলি ও খোকা?

অপু দন্তহীন মুখে কদ্‌মা চিবাইতে চিবাইতে ফুলের মত মুখটি তুলিয়া মায়ের দিকে চাহিয়া বলিল,—'ভিজে'। হি-হি—ভাবিলে এখনও সর্বজয়ার হাসি পায়।

সেদিন দুপুর হইতেই মাঝে মাঝে বুকে ফিক্-ধরা বেদনা হইতে লাগিল। তেলি-বৌ আসিয়া তেল গরম করিয়া দিয়া গেল। দু'-তিনবার দেখিয়াও গেল। সন্ধ্যার পর কেহ কোথাও নাই। একা নির্জন বাড়ি। জ্বরও আসিল।

রাত্রে খুব পরিষ্কার আকাশে ত্রয়োদশীর প্রকাণ্ড বড় চাঁদ উঠিয়াছে। জীবনে এই প্রথম সর্বজয়ার একা থাকিতে ভয় ভয় করিতে লাগিল। খানিক রাত্রে একবার যেন মনে হইল, সে জলের তলায় পড়িয়া আছে, নাকে মুখে জল ঢুকিয়া নিশ্বাস একেবারে বন্ধ হইয়া আসিতেছে···একেবারে বন্ধ। সে ভয়ে এক-গা ঘামিয়ে ধড়মড় করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। সে কি মরিয়া যাইতেছে? এই কি মৃত্যু?—সে এখন কাহাকে ডাকে? জীবনে সর্বপ্রথম এই তাহার জীবনের ভয় হইল—ইহার আগে কখনও তো এমন হয় নাই। পরে নিজের ভয় দেখিয়া তাঁহার আর একদফা ভয় হইল। ভয় কিসের? না—না—মৃত্যু, সে এরকম নয়। ও কিছু না।

কত চুরি, কত পাপ···চুরিই যে কত করিয়াছে তাহার কি ঠিক আছে? ছেলেমেয়েকে খাওয়াইতে অমুকের গাছের কলার কাঁদিটা, অমুকের গাছের শসাটা লুকাইয়া রাখিত তক্তপোশের তলায়—ভুবন মুখুয্যেদের বাড়ি হইতে একবার দশ পলা তেল ধার করিয়া আনিয়া ভালমানুষ রাণুর মার কাছে পাঁচ পলা শোধ দিয়া আসিয়াছিল, মিথ্যা করিয়া বলিয়াছিল—পাঁচ পলাই তো নিয়ে গিয়েছিলাম

ন'দি—বোন্‌নো সেজ ঠাকুরঝিকে। সারাজীবন ধরিয়া শুধু দুঃখ ও অপমান। কেন আজ এসব কথা মনে উঠিতেছে?

ঘর অন্ধকার।···খাটের তলায় নেংটি ইঁদুর ঘুট্ ঘুট্ করিতেছে। সর্বজয়া ভাবিল, ওদের বাড়ির কলটা না আন্‌লে আর চলে না—নতুন মুগগুলো সব খেয়ে ফেললে। কিন্তু নেংটি ইঁদুরের শব্দ তো? —সর্বজয়ার আবার সেই ভয়টা আসিল, দুর্দমনীয় ভয়···সারা শরীর যেন ধীরে ধীরে অসাড় হইয়া আসিতেছে ভয়ে···পায়ের দিক হইতে ভয়টা সুড়সুড়ি কাটিয়া উপরের দিকে উঠিতেছে, যতটা উঠিতেছে, ততটা অসাড় করিয়া দিতেছে···না—পায়ের দিক হইতে না—হাতের আঙুলের দিক হইতে···কিন্তু তাহার সন্দেহ হইতেছে কেন? ইঁদুরের শব্দ নয় কেন? কিসের শব্দ? কখনও তো এমন সন্দেহ হয় না? ···হঠাৎ সর্বজয়ার মনে হইল, না পায়ের ও হাতের দিক হইতে সুড়সুড়ি কাটিয়া যাহা উপরের দিকে উঠিতেছে তাহা ভয় নয়···তাহা মৃত্যু। মৃত্যু? ভীষণ ভয়ে সর্বজয়া ধড়মড় করিয়া আবার বিছানা হইতে উঠিতে গেল, চীৎকার করিতে গেল···খুব···খুব চীৎকার, আকাশ ফাটা চীৎকার—অনেকক্ষণ চীৎকার করিয়াছে, আর সে চেঁচাইতে পারে না—গলা ভাঙিয়া আসিয়াছে—কেউ আসিল না তো?···কিন্তু সে তো বিছানা হইতে···বিছানা হইতে উঠিল কখন? সে তো উঠে নাই—ভয়টা সুড়সুড়ি কাটিয়া সারা দেহ ছাইয়া ফেলিয়াছে, যেন খুব বড় একটা কালো মাকড়সা ··শুঁড়ের বিষে দেহ অবশ···অসাড়···হাতও নাড়ানো যায় না···পা-ও না···সে চীৎকার করে নাই···ভুল।···

সুন্দর জ্যোৎস্না উঠিয়াছে···একজনের কথাই মনে হয়···অপু··· অপু··অপুকে ফেলিয়া সে থাকিতে পারিতেছে না···অসম্ভব।··· বিস্ময়ের সহিত দেখিল···সে নিজে অনেকক্ষণ কাঁদিতেছে।—এতক্ষণ তো টের পায় নাই।···আশ্চর্য···চোখের জলে বালিশ ভিজিয়া গিয়াছে যে।···

জ্যোৎস্না অপূর্ব, ভয় হয় না ··কেমন একটা আনন্দ···আকাশটা,

পুরাতন আকাশটা যেন স্নেহে প্রেমে জ্যোৎস্না হইয়া গলিয়া ঝরিয়া বিন্দুতে বিন্দুতে নিজেকে নিঃশেষে করিয়া দিতেছে···টুপ···টুপ···টুপ ···টাপ···। আবার কান্না পায় ··জ্যোৎস্নার আলোয় জানালার গরাদ ধরিয়া হাসিমুখে ও কে দাঁড়াইয়া আছে? সর্বজয়ার দৃষ্টি পাশের জানালার দিকে···নিবদ্ধ হইল···বিস্ময়ে, আনন্দে রোগশীর্ণ মুখখানা মুহূর্তে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল···অপু দাঁড়াইয়া আছে।···এ অপু নয়··· সেই ছেলেবেলাকার ছোট্ট অপু···এতটুকু অপু···নিশ্চিন্দিপুরের বাঁশবনের ভিটেতে এমন কত চৈত্র-জ্যোৎস্না-রাতে ভাঙা জানালার ফাঁক দিয়া জ্যোৎস্নার আলো আসিয়া পড়িত যাহার দন্তহীন ফুলের কুঁড়ির মত কচি মুখে সেই অপু··· ওর ছেলেমানুষ খঞ্জন পাখির মত ডাগর ডাগর চোখের নীল চাহনি···চুল কোঁকড়া কোঁকড়া···মুখচোরা, ভালমানুষ···লাজুক বোকা জগতের ঘোরপ্যাঁচ কিছুই একেবারে বোঝে না···কোথায় যেন সে যায়···নীল আকাশ বাহিয়া বহু দূরে··· বহু দূরের দিকে, সুনীল মেঘপদবীর অনেক উপরে···যায়···যায়··· যায়···যায়···মেঘের ফাঁকে যাইতে যাইতে মিলাইয়া যায়···

বুঝি মৃত্যু আসিয়াছে। ··কিন্তু তার ছেলের বেশে, তাকে আদর করিয়া আগু বাড়াইয়া লইতে···এতই সুন্দর···

কি হাসি? কি মিষ্টি হাসি ওর মুখের!···

পরদিন সকালে তেলি বাড়ির বড়-বৌ আসিল। দরজায় রাত্রে খিল দেওয়া হয় নাই, খোলাই আছে, বড়-বৌ আপন মনে বলিল—রাত্রে দেখছি মা-ঠাকরুণের অসুখ বেড়েছে, খিলটাও দিতে পারেন নি।

বিছানার উপর যেন সর্বজয়া ঘুমাইতেছেন। তেলি-বৌ একবার ভাবিল—ডাকিবে না—কিন্তু পথ্যের কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ডাকিয়া উঠাইতে গেল। সর্বজয়া কোনও সাড়া দিলেন না, নড়িলেনও না। বড়-বৌ আরও দু'একবার ডাকাডাকি করিল, পরে হঠাৎ কি ভাবিয়া নিকটে আসিয়া ভাল করিয়া দেখিল।

পরক্ষণেই সে সব বুঝিল।

সর্বজয়ার মৃত্যুর পর কিছুকাল অপু এক অদ্ভুত মনোভাবের সহিত পরিচিত হইল। প্রথম অংশটা আনন্দ-মিশ্রিত—এমন কি মায়ের মৃত্যু-সংবাদ প্রথম যখন সে তেলি-বাড়ির তারের খবরে জানিল, তখন প্রথমটা তাহার মনে একটা আনন্দ, একটা যেন মুক্তির নিশ্বাস ...একটা বাঁধন-ছেঁড়ার উল্লাস ..অতি অল্পক্ষণের জন্য...নিজের অজ্ঞাতসারে। তাহার পরই নিজের মনোভাবে তাহার দুঃখ ও আতঙ্ক উপস্থিত হইল। এ কি ? সে চায় কি ! মা যে নিজেকে একেবারে বিলোপ করিয়া ফেলিয়াছিলেন তাহার সুবিধার জন্য। মা কি তাহার জীবনপথের বাধা ?—কেমন করিয়া সে এমন নিষ্ঠুর, এমন হৃদয়হীন—তবুও সত্যকে সে অস্বীকার করিতে পারিল না। মাকে এত ভালবাসিত তো, কিন্তু মায়ের মৃত্যু-সংবাদটা প্রথমে যে, একটা উল্লাসের স্পর্শ মনে আনিয়াছিল—ইহা সত্য—সত্য—তাহাকে উড়াইয়া দিবার উপায় নাই। তাহার পর সে বাড়ি রওনা হইল। উলা স্টেশনে নামিয়া হাঁটিতে শুরু করিল। এই প্রথম এ পথে সে যাইতেছে—যেদিন মা নাই। গ্রামে ঢুকিবার কিছু আগে আধমজা কোদলা নদী, এ সময়ে হাঁটিয়া পার হওয়া যায়—এরই তীরে কাল মাকে সবাই দাহ করিয়া গিয়াছে ! বাড়ি পৌঁছিল বৈকালে। এই সেদিন বাড়ি হইতে গিয়াছে, মা তখনও ছিলেন...ঘরে তালা দেওয়া, চাবি কাহাদের কাছে ? বোধ হয় তেলি-বাড়ির ওরা লইয়া গিয়াছে। ঘরের পৈঠায় অপু চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। উঠানের বাহিরে আগাড়ের কাছে এক জায়গায় পোড়া খড় জড়ো করা। সেদিকে চোখ পড়িতে অপু শিহরিয়া উঠিল—সে বুঝিয়াছে—মাকে যাহারা সৎকার করিতে গিয়াছিল, দাহ অন্তে তাহারা কাল এখানে আগুন ছুঁইয়া নিমপাতা খাইয়া শুদ্ধ হইয়াছে—প্রথাটা অপু জানে .. মা মারা গিয়াছেন এখনও অপুর বিশ্বাস হয় নাই।...একুশ বৎসরের বন্ধন, মন এক মুহূর্তে টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারে নাই...কিন্তু পোড়া খড়গুলোতে নগ্ন, রূঢ়, নিষ্ঠুর সত্যটা...মা নাই ! মা নাই ! ...বৈকালের কি রূপটা ! নির্জন, নিরালা, কোন দিকে কেহ নাই।

উদাস পৃথিবী, নিস্তব্ধ বিরাগী রাঙা রোদভরা আকাশটা।...অপু অর্থহীন দৃষ্টিতে পোড়া খড়গুলার দিকে চাহিয়া রহিল।...

কিন্তু মায়ের গায়ের কাঁথাখানা উঠানের আলনায় মেলিয়া দেওয়া কেন? কাঁথাখানা মায়ের গায়ে ছিল...সঙ্গেই তো যাওয়ার কথা। অনেক দিনের নিশ্চিন্দিপুরের আমলের, মায়ের হাতে সেলাই করা, কল্কা-কাটা রাঙা সূতার কাজ...কতক্ষণ সে বসিয়া ছিল জানে না, রোদ প্রায় পড়িয়া আসিল। তেলি-বাড়ির বড় ছেলে নাড়ুর ডাকে চমক ভাঙিতেই সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। ম্লান হাসিয়া বলিল—এই যে আমার ঘরের চাবিটা তোমাদের বাড়ি?..

নাড়ু বলিল—কখন এলে, এখানে ব'সে একলাটি—বেশ তো দাদাঠাকুর—এসো আমাদের বাড়ি। অপু বলিল, না ভাই, তুমি চাবিটা নিয়ে এসো—ঘরেব মধ্যে দেখি জিনিসগুলোর কি ব্যবস্থা। চাবি দিয়া নাড়ু চলিয়া গেল।—ঘর খুলে ছাখো, আমি আসছি এখুনি। অপু ঘরে ঢুকিল। তক্তপোশের উপর বিছানা নাই, বালিশ, মাদুর কিছু নাই—তক্তপোশটা পড়িয়া আছে—তক্তপোশের তলায় একটা পাথরের খোরায় কি ভিজানো—খোরাটা হাতে তুলিয়া দেখিল। চিরতা না নিমছাল কি ভিজানো—মায়ের ওষুধ।

বাহিরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। কে বলিল— ঘরের মধ্যে কে?—অপু খোরাটা তক্তপোশের কোণে নামাইয়া রাখিয়া বাহিরে দাওয়ায় আসিল। নিরুপমা দিদি—নিরুপমাও অবাক—গালে আঙুল দিয়া বলিল—তুমি! কখন এলে ভাই?—কৈ কেউ তো বলে নি!...

অপু বলিল—না, এই তো এলাম,—এই এখনও আধঘণ্টা হয় নি।

নিরুপমা বলিল—আমি বলি রোদ পড়ে গিয়েছে, কাঁথাটা কেচে মেলে দিয়ে এসেছি বাইরে, যাই কাঁথাখানা তুলে রেখে আসি কুণ্ডুদের বাড়ি। তাই আসছি—

অপু বলিল—কাঁথাখানা মায়ের গায়ে ছিল, না নিরুদি?

—কোথায়? পরশু রাতে তো তাঁর—পরশু বিকেলে বড় বৌকে

বলেছেন কাঁথাখানা সরিয়ে রাখো মা—ও আমার অপুর জন্যে, বর্ষাকালে কলকাতা পাঠাতে হবে—সেই পুরানো তুলোজমানো কালো কম্বলটা ছিল···সেইখানা গায়ে দিয়েছিলেন—তিনি আবার প্রাণ ধ'রে তোমার কাঁথা নষ্ট করবেন?···তাই কাল যখন ওরা তাঁকে নিয়ে-থুয়ে গেল তখন ভাবলাম রুগীর বিছানায় তো ছিল কাঁথাখানা, জলকাচা ক'রে রোদে দিই—কাল আর পারি নি—আজ সকালে ধুয়ে আলনায় দিয়ে গেলাম—তা এসো—আমাদের বাড়ি—ওসব শুনবে না—মুখ শুকনো—হবিষ্যি হয় নি? এসো—

নিরুপমার আগে আগে সে কলের পুতুলের মত তাদের বাড়ি গেল। সরকার মহাশয় কাছে ডাকিয়া বসাইয়া অনেক সান্ত্বনার কথা বলিলেন।

নিরুদি কি করিয়া মুখ দেখিয়া বুঝিল খাওয়া হয় নাই। নান্থও তো ছিল—কৈ কোনও কথা তো বলে নাই?

সন্ধ্যার পর নিরুপমা একখানা রেকাবীতে আখ ও ফলমূল কাটিয়া আনিল। একটা কাঁসার বাটিতে কাঁচামুগের ডাল-ভিজা, কলা ও আখের গুড় নিয়া নিজে একসঙ্গে মাখিয়া আনিয়াছে। অপু কারুর হাতে চটকানো জিনিস খায় না, ঘেন্না ঘেন্না করে··· প্রথমটা মুখে তুলিতে একটুখানি গা-কেমন করিতেছিল। তারপর দুই-এক গ্রাস খাইয়া মনে হইল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক আস্বাদই তো! ···নিজের হাতে বা মায়ের হাতে মাখিলে যা হইত—তাই। পরদিন হবিষ্যির সময় নিরুপমা গোয়ালে সব যোগাড়যন্ত্র করিয়া অপুকে ডাক দিল। উনুনে ফুঁ পাড়িয়া কাঠ ধরাইয়া দিল। ফুটিয়া উঠিলে বলিল—এইবার নামিয়ে ফ্যালো, ভাই।

অপু বলিল—আর একটু না—নিরুদি?

নিরুপমা বলিল—নামাও দেখি, ও হয়ে গিয়েছে। ডালবাটাটা জুড়োতে দাও—

সব মিটিয়া গেলে সে কলিকাতায় ফিরিবার উদ্যোগ করিল। সর্বজয়ার জাঁতিখানা, সর্বজয়ার হাতে সই-করা খানদুই মনিঅর্ডারের

রসিদ চালের বাতায় গোঁজা ছিল—সেগুলি, সর্বজয়ার নথ কাটিবার নরুণটা পুঁটলির মধ্যে বাঁধিয়া লইল। দোরের পাশে ঘরের কোণে সেই তাকটা—আসিবার সময় সেদিকে নজর পড়িল। আচারভরা ভাঁড়, আমসত্বের হাঁড়িটা, কুলচুর, মায়ের গঙ্গাজলের পিতলের ঘটি, সবই পড়িয়া আছে···সে যত ইচ্ছা খুশী খাইতে পারে, যাহা খুশী ছুঁইতে পারে, কেহ বকিবার নাই, বাধা দিবার নাই। তাহার প্রাণ ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সে মুক্তি চায় না···অবাধ অধিকার চায় না—তুমি এসে শাসন করো, এসব ছুঁতে দিও না—হাত দিতে দিও না—ফিরো এসো মা···ফিরে এসো—

সংসারজীবনে অপু   ছয়

সর্বজয়া মারা যাইবার পর হইতেই অপুর জীবনে দ্রুত অনেক ঘটনা ঘটিয়া গেল। বিভিন্ন কারণে তাহার বি. এ. পরীক্ষা দেওয়া হইল না। বহুদিন কষ্টদুঃখের সহিত ঘোর সংগ্রামের পব যে কোন একটি সংবাদপত্রের অফিসে চাকুরী পাইল। এই অবস্থায় একদিন তাহার কলেজের প্রিয় বন্ধু প্রণবের সহিত দেখা হইয়া গেল। অপু প্রণবকে লইয়া রেস্তোর'ায় ঢুকিল গল্প করিতে। চা খাইতে খাইতে প্রণব বলিল তাহার গ্রামের বাড়িতে কিছুদিনের মধ্যেই তাহার মামাতো বোনের বিবাহ হইবে। সে যাইতেছে। অপু তো গ্রাম দেখিতে ভালবাসে, অপু কি তাহার সঙ্গে যাইবে বিবাহ দেখিতে?

অপু রাজী হইল। বিবাহের রাত্রে ঘটিল এক আশ্চর্য ঘটনা। অনেক রাত্রে যখন নৌকাযোগে পাত্র আসিয়া পৌঁছিল, দেখা গেল সে বদ্ধ পাগল। প্রণবের মামীমা কিছুতেই উন্মাদের হাতে কন্যাদানে সম্মত হইলেন না। প্রভাত হইলে আর মেয়েটির কখনও বিবাহ দেওয়া যাইবে না। ফলে সন্তানের একান্ত অনুরোধে সেই রাত্রেই অপু প্রণবের মামাতো বোন অপর্ণাকে বিবাহ করিল।

প্রথমে কিছুদিন বাপের বাড়িতে রাখিবার পরে অপু অপর্ণাকে কলিকাতার বাসায় লইয়া আসিল। ছোট বাসা, কিন্তু অপর্ণা তাহাকে সুন্দর করিয়া সাজাইয়া সংসার পাতিয়া বসিল। দিন বেশ কাটিতেছিল। নতুন সংসার করিয়া অপুও খুশী। কিন্তু কিছুদিনের

মধ্যেই আবার এক দুর্ঘটনা ঘটিল। সন্তান হইবার জন্য বাপের বাড়ি গিয়া অপর্ণা মারা গেল। তাহার শিশু পুত্রটি মামাবাড়িতে মানুষ হইতে লাগিল। অপুও অপর্ণার শোকে কেমন যেন হইয়া গেল। দু'একবার নিজের পুত্র কাজলকে দেখিতে গিয়াছিল বটে, কিন্তু লইয়া আসে নাই। কাজল দাদামশায়ের কাছেই রহিল।

অপু ছয়-সাত বৎসর সমস্ত ভারতে ঘুরিল, মধ্যপ্রদেশের অরণ্যে কাজ করিল। এরই ফাঁকে ফাঁকে যে নিজের অপূর্ব মায়াময় শৈশব ও তাহার জীবন লইয়াএকটি উপন্যাস লিখিল। উপন্যাসটি ছাপাইবার ব্যবস্থা করা দরকার, ছেলেকেও খুব দেখিতে ইচ্ছা করে। ছেলেকে এবার সে নিজের কাছে আনিয়া রাখিবে। অপু কলিকাতায় ফিরিল।

ভাদ্রমাসের শেষের দিক। দাদামশায়ের বৈকালিক মিছরির পানা খাওয়ার শ্বেত পাথরের গেলাসটা তাহার বড় মামীমা মাজিয়া ধুইয়া উপরের ঘরের বাসনের জলচৌকিতে রাখিতে তাহার হাতে দিল। সিঁড়িতে উঠিবার সময় কেমন করিয়া গেলাস হাত হইতে পড়িয়া চুরমার হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। কাজলের মুখ ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল, তাহার ক্ষুদ্র হৃৎপিণ্ডের গতি যেন মিনিটখানেকের জন্য বন্ধ হইয়া গেল, যাঃ, সর্বনাশ! দাদামশায়ের মিছরিপানার গেলাসটা যে! সে দিশেহারা অবস্থায় টুকরাগুলো তাড়াতাড়ি খুঁটিয়া খুঁটিয়া তুলিল; পরে অন্য জায়গায় ফেলিলে পাছে কেহ টের পায়, তাই তাড়াতাড়ি আরব্য উপন্যাস যাহার মধ্যে আছে সেই বড় কাঠের সিন্দুকটার পিছনে গোপনে রাখিয়া দিল। এখন সে কি করে! কাল যখন গেলাসের খোঁজ পড়িবে বিকালবেলা, তখন সে কি জবাব দিবে?

কাহারও কাছে কথা বলিল না, বাকি দিনটুকু ভাবিয়া কিছু ঠিক করিতেও পারিল না। এক জায়গায় বসিতে পারে না, উদ্বিগ্ন মুখে ছট্‌ফট্‌ করিয়া বেড়ায়।ঐ-রকমএকটা গেলাস আর কোথাও পাওয়া যায় না? একবার সে এক খেলুড়ে বন্ধুকে চুপি চুপি বলল, —ভাই তো-তোদের বাড়ি একটা পাথরের গে-গেলাস আছে?

কোথায় সে এখন পায় একটা শ্বেত পাথরের গেলাস? রাত্রে একবার তাহার মনে হইল সে বাড়ি ছাড়িয়া পালাইয়া যাইবে। কলিকাতা কোন দিকে? সে বাবার কাছে চলিয়া যাইবে কলিকাতায়—কাল বৈকালের পূর্বেই।

কিন্তু রাত্রে পালানো হইল না। নানা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া সে সকালে ঘুম ভাঙিয়া উঠিল, দুই-তিন বার কাঠের সিন্দুকটার পিছনে সন্তর্পণে উঁকি মারিয়া দেখিল, গেলাসের টুকরাগুলা সেখান হইতে কেহ বাহির করিয়াছে কিনা। বড় মামীমার সামনে আর যায় না, পাছে গেলাসটা কোথায় জিজ্ঞাসা করিয়া বসে। দুপুরের কিছু পর বাড়ির রাস্তা দিয়া কে একজন সাইকেল চড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া সে নাট-মন্দিরের বেড়ার কাছে ছুটিয়া দেখিতে গেল—কিন্তু সাইকেল দেখা তাহার হইল না, নদীর বাঁধাঘাটে একখানা কাহাদের ডিঙি-নৌকা লাগিয়াছে, একজন ফর্সা চেহারার লোক একটি ছড়ি ও ব্যাগ হাতে ডিঙি হইতে নামিয়া ঘাটের সিঁড়িতে পা দিয়া মাঝির সঙ্গে কথা কহিতেছে—কাজল অবাক্ হইয়া ভাবিতেছে, লোকটা কে, এমন সময় লোকটা মাঝির সঙ্গে কথা শেষ করিয়া এদিকে মুখ ফিরাইল। সঙ্গে সঙ্গে কাজল অল্পক্ষণের জন্য চোখে যেন ধোঁয়া দেখিল, পরক্ষণেই সে নাটমন্দিরের বেড়া গলাইয়া বাহিরের নদীর ধারের রাস্তাটা বাহিয়া বাঁধাঘাটের দিকে ছুটিল। যদিও অনেক বছর পরে দেখা তবুও কাজল চিনিয়াছে লোকটিকে—তাহার বাবা।

অপু খুলনার স্টীমার ফেল করিয়াছে। নতুবা সে কাল রাত্রেই এখানে পৌঁছিত। সে মাঝিদের জিজ্ঞাসা করিতেছিল, পরশু ভোরে নৌকা এখানে আসিয়া তাহাকে বরিশালের স্টীমার ধরাইয়া দিতে পারিবে কিনা। কথা শেষ করিয়াই ফিরিয়া চাহিয়া সে দেখিল একটি ছোট সুশ্রী বালক ঘাটের দিকে দৌড়িয়া আসিতেছে। পরক্ষণেই সে চিনিল। আজ সারা পথ, নৌকায় সে ছেলের কথা ভাবিয়াছে, না জানি সে কত বড় হইয়াছে, কেমন দেখিতে হইয়াছে, তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছে, না মনে রাখিয়াছে! ছেলের আগেকার

চেহারা তাহার মনে ছিল না। এই সুন্দর বালকটিকে দেখিয়া সে যুগপৎ প্রীত ও বিস্মিত হইল—তাহার সেই তিন বছরের ছোট্ট খোকা এমন সুদর্শন লাবণ্যভরা বালকে পরিণত হইল কবে?

সে হাসিমুখে—বলিল—কি রে খোকা, চিনিতে পারিস্?—

কাজল ততক্ষণে আসিয়া অসীম নির্ভরতার সহিত তাহার কোমর জড়াইয়া ধরিয়াছে—ফুলের মত মুখটি উঁচু করিয়া হাসি-ভরা চোখে বাবার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—না বৈকি? আমি বেড়ার ধার থেকে দেখেই ছুট্ দিইছি—এতদিন আসনি কে-কেন বাবা?

একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিল। এতদিন তো ভুলিয়া ছিল, কিন্তু আজ এইমাত্র—হঠাৎ দেখিবামাত্রই—অপুর বুকের মধ্যে একটা গভীর স্নেহসমুদ্র উদ্বেল হইয়া উঠিল। কি আশ্চর্য, এই ক্ষুদ্র বালকটি তাহারই ছেলে, জগতে নিতান্ত অসহায় হাত-পা হারা অবোধ—জগতে সে ছাড়া ওর আর কেউ তো নাই! কি করিয়া এতদিন সে ভুলিয়া ছিল।

কাজল বলিল—ব্যাগে কি বাবা?

—দেখবি? চল দেখাব এখন। তোর জন্যে কেমন পিস্তল আছে; এক সঙ্গে দুম্ দুম্ আওয়াজ হয়, ছবির বই আছে দু'খানা। কেমন একটা রবারের বেলুন—

—তো-তো-তোমাকে একটা কথা বলব বাবা? তো-তোমার কাছে একটা পাথরের গে-গেলাস আছে?

—পাথরের গেলাস? কেন রে, পাথরের গেলাস কি হবে?

কাজল চুপি চুপি বাবাকে গেলাস ভাঙার কথা সব বলিল। বাবার কাছে কোন ভয় হয় না। অপু হাসিয়া ছেলের গায়ে হাত বুলাইয়া বলিল—আচ্ছা চল্, কোন ভয় নেই। সঙ্গে সঙ্গে কাজলের সব ভয়টা কাটিয়া গেল, একজন অসীম শক্তিধর বজ্রপাণি দেবতা যেন হঠাৎ বাহুদ্বয় মেলিয়া তাহাকে অভয়দান করিয়াছে—মাভৈঃ।

রাত্রে কাজল বলিল—আমি তোমার সঙ্গে যাব বাবা!

অপুর অনিচ্ছা ছিল না, কিন্তু কলিকাতায় এখন নিজেরই অচল। সে ভুলাইবার জন্য বলিল—আচ্ছা হবে, হবে। শোন্ একটা গল্প বলি খোকা। কাজল চুপ করিয়া গল্প শুনিল। বলিল—নিয়ে যাবে তো বাবা? এখানে সবাই বকে, মারে বাবা। তুমি নিয়ে চল, তোমার কত কাজ করে দেব।

অপু হাসিয়া বলে, কাজ করে দিবি? কি কাজ করে দিবি রে খোকা।

তারপর সে ছেলেকে গল্প শোনায়, একবার চাহিয়া দেখে, কখন সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। খানিক রাত্রি পর্যন্ত সে একখানা বই পড়িল, পরে আলো নিভাইবার পূর্বে ছেলেকে ভাল করিয়া শোয়াইতে গেল। ঘুমন্ত অবস্থায় বালককে কি অদ্ভুত ধরনের অবোধ, অসহায়, দুর্বল ও পরাধীন মনে হইল অপুর। কি অসহায় ও পরাধীন। সে ভাবে এই যে ছেলে, পৃথিবীতে এ তো কোথাও ছিল না, যাচিয়াও তো আসে নাই—অপর্ণাও সে, দু'জনে যে উহাকে কোন্ অনন্ত হইতে সৃষ্টি করিয়াছে—তাহার পর সংসারে আনিয়া অবোধ নিষ্পাপ বালককে একা এভাবে সংসারে ছাড়িয়া দিয়া পালানো কি অপর্ণাই সহ্য করিবে? কিন্তু এখন কোথায়ই বা লইয়া যায়?

প্রাচীন গ্রীসের এক সমাধির উপর সেই যে স্মৃতিফলকটির কথা সে পড়িয়াছিল ফ্রেডারিক হ্যারিসনের বই-এ—

This child of ten years
Philip, his father laid here
His great hope, Nikoteles.

সে দূর কালের ছোট্ট বালকটির সুন্দর মুখ, সুন্দর রং, দেব-শিশুর মত সুন্দর দশ বৎসরের বালক নিকোটিলিস্‌কে আজ রাত্রে সে যেন নির্জন প্রান্তরে খেলা করিতে দেখিতে পাইতেছে—সোনালী চুল, ডাগর ডাগর চোখ। তাহার স্নেহস্মৃতি গ্রীসের নির্জন প্রান্তরের সমাধিক্ষেত্রের বুকে অমর হইয়া আছে। শত শতাব্দী পূর্বে সেই বিরহী পিতৃ-হৃদয়ের সঙ্গে সে যেন আজ নিজের বাড়ির যোগ অনুভব

কাজলের কোনো অসুবিধা নাই—সে রাস্তার ধারের জানালাটায় দাঁড়াইয়া পথের লোকজন দেখিতেছে—না হয়, বাবার বইগুলো নাড়িয়া চাড়িয়াছবি দেখিতেছে—মোটের উপর বেশ আনন্দেই আছে।

এই বিরাট নগরীর জীবনস্রোত কাজলের কাছে অজানা দুর্বোধ্য! কিন্তু তাহার নবীন মন ও নবীন চক্ষু যে-সকল জিনিস দেখে ও দেখিয়া আনন্দ পায়—বয়স্ক লোকের ক্লান্ত দৃষ্টিতে তাহা অতি তুচ্ছ। হয়তো আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলে—দ্যাখো বাবা, ওই চিলটা একটা কিসের ডাল মুখে ক'রে নিয়ে যাচ্ছিল, সামনের ছাদের আলসেতে লেগে ডালটা—ওই দ্যাখো বাবা রাস্তায় পড়ে গিয়েছে—

বাবার সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হইয়া এত ট্রাম, মোটর, লোক-জনের ভিড়ের মাঝখানে কোথায় একটা কাক ফুটপাতের ধারে ড্রেনের জলে স্নান করিতেছে তাই দেখিয়া তাহার মহা আনন্দ—তাহা আবার বাবাকে না দেখাইলে কাজলের মনে তৃপ্তি হইবে না। সব বিষয়েই বাবাকে আনন্দের ভাগ না দিতে পারিলে, কাজলের যেন আনন্দ পূর্ণ হয় না। খাইতে খাইতে বেগুনিটা, কি তেলে-ভাজা কচুরিখানা এক কামড় খাইয়া ভাল লাগিলে বাকী আধখানা বাবার মুখে গুঁজিয়া দিবে—অপু তাহা তখনি খাইয়া ফেলে—ছিঃ আমার মুখে দিতে নেই—একথা বলিতে তার প্রাণ কেমন করে—কাজেই পিতৃত্বের গাম্ভীর্যভরা ব্যবধান অকারণে গড়িয়া উঠিয়া পিতা-পুত্রের সহজ সরল মৈত্রীকে বাধাদান করে নাই, কাজল জীবনে বাবার মত সহচর পায় নাই—এবং অপুর বোধ হয় কাজলের মত বিশ্বস্ত ও একান্ত নির্ভরশীল তরুণ বন্ধু খুব বেশী পায় নাই জীবনে।

আর কি সরলতা?...পথে হয়ত দু'জনে বেড়াতে বাহির হইয়াছে, কাজল বলিল—শোনো বাবা একটা কথা—শোনো, চুপি চুপি বলব—পরে পথের এদিক ওদিক চাহিয়া লাজুক মুখে কানে কানে বলে—ঠাকুর বড় ছুটোখানি ভাত দ্যায় হোটেলে—আমার খেয়ে পেট ভরে না—তুমি বলবে বাবা? বললে আর দুটো দেবে না?

দিনকতক গলির একটা হোটেলে পিতাপুত্রে দু'জনে খায়—হোটেলের ঠাকুর হয়ত শহরের ছেলের হিসেবে ভাত দেয় কাজলকে—কিন্তু পাড়াগাঁয়ের ছেলে কাজল বয়সের অনুপাতে দুটি বেশী ভাতই খাইয়া থাকে।

অপু মনে মনে হাসিয়া ভাবে—এই কথা আবার কানে কানে বলা !···রাস্তার মধ্যে ওকে চেনেই বা কে আর শুনছেই বা কে !···ছেলেটা বেজায় বোকা।

একদিন কাজল লাজুক মুখে বলিল—বাবা একটা কথা বলব ?···

—কি ?

—নাঃ বাবা—বলব না—

—বল্ না কি ?

কাজল সরিয়া আসিয়া চুপি চুপি লাজুক স্বরে বলিল—তুমি মদ খাও বাবা ?···

অপু বিস্মিত হইয়া বলিল—মদ···কে বলেছে তোকে ?

—সেই যে সেদিন খেলে ! সেই রাস্তার মোড়ে একটা দোকান থেকে ? পান কিনলে আর সেই যে—

অপু প্রথমটা অবাক্ হইয়া গিয়াছিল—পরে বুঝিয়া হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল—দূর বোকা—সে হলো লেমনেড্—সেই পানের দোকানে তো ?···তোর ঠাণ্ডা লেগেছিল বলে তোকে দিই নি।···খাওয়াব তোকে একদিন, ও একরকম মিষ্টি শরবৎ। দূর—

কাজলের কাছে অনেক ব্যাপার পরিষ্কার হইয়া গেল। কলিকাতায় আসিয়া সে দেখিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছিল যে এখানে মোড়ে মোড়ে মদের দোকান—পান ও মদ এক সঙ্গে বিক্রয় হয় প্রায় সর্বত্র। সোডা লেমনেড্ সে কখনো দেখে নাই ইহার আগে, জানিত না—কি করিয়া সে ধরিয়া লইয়াছে বোতলে ওগুলো মদ। তাই তো সেদিন বাবাকে খাইতে দেখিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছে—এত দিন লজ্জায় বলে নাই। সেই দিনই অপু তাহাকে লেমনেড্ খাওয়াইয়া তাহার ভ্রম ঘুচাইয়া দিল।

কাজল এই কয়মাসেই বেশ লেখাপড়া শিখিয়াছে। বাড়িতেই পড়ে অনেক সময় নিজের বই রাখিয়া বাবার বইগুলির পাতা উল্টাইয়া দেখে। আজকাল বাবা কি কাজে সর্বদাই বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ায়, এইজন্য বাবার কাজও সে অনেক করে।

এই সময়ে অপুর হঠাৎ অসুখ হইল। সকালে অন্য দিনের মত আর বিছানা হইতে উঠিতেই পারিল না—বাবা সকালে উঠিয়া মাদুর পাতিয়া বসিয়া তামাক খায় কাজলের মনে হয় সব ঠিক আছে —কিন্তু আজ বেলা দশটা বাজিল, বাবা এখনও শুইয়া—জগৎটা আর যে স্থিতিশীল নয়, নিত্য নয়—সব কি যেন হইয়া গিয়াছে। সেই রোদ উঠিয়াছে, কিন্তু রোদের চেহারা অন্য রকম, গলিটার চেহারা অন্য রকম, কিছু ভাল লাগে না, বাবার অসুখ এই প্রথম, বাবাকে আর কখনো সে অসুস্থ দেখে নাই—কাজলের ক্ষুদ্র জগতে সব যেন ওলট-পালট হইয়া গেল। সারা দিনটা কাটিল, বাবার সাড়া নাই, সংজ্ঞা নাই, জ্বরে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া। কাজল পাউরুটি কিনিয়া আনিয়া খাইল। সন্ধ্যা কাটিয়া গেল। কাজল পরমানন্দ পানওয়ালার দোকান হইতে তেল পুরিয়া আনিয়া লণ্ঠন জ্বালিল। বাবা তখনও সেই রকমই শুইয়া। কাজল অস্থির হইয়া উঠিল—তাহার কোনও অভিজ্ঞতা নাই কি এখন সে করে? দু-একবার বাবার কাছে গিয়া ডাকিল, জ্বরের ঘোরে বাবা একবার বলিয়া উঠিল—স্টোভটা নিয়ে আয়, ধরাই খোকা—স্টোভটা—

অর্থাৎ সে স্টোভটা ধরাইয়া কাজলকে রাঁধিয়া দিবে।

কাজল ভাবিল, বাবাও তো সারাদিন কিছু খায় নাই—স্টোভ ধরাইয়া বাবাকে সাবু তৈরী করিয়া দিবে। কিন্তু স্টোভ সে ধরাইতে জানে না, কি করে এখন? স্টোভটা ঘরের মেঝেতে লইয়া দেখিল তেল নাই। আবার পরমানন্দের দোকানে গেল। পরমানন্দকে সব কথা খুলিয়া বলিল। পাশেই একজন নতুন পাশকরা হোমিও-প্যাথিক ডাক্তারের ডিস্‌পেনসারী। ডাক্তারটি একেবারে নতুন, একা

ডাক্তারখানার বসিয়া কড়ি-বড়গা গুণিতেছিলেন, তিনি তাহাদের সঙ্গে বাসায় আসিলেন, অপুকে ডাকিয়া তাহার হাত ও বুক দেখিলেন, কাজলকে ঔষধ লইবার জন্য ডাক্তারখানায় আসিতে বলিলেন। অপু তখন একটু ভাল—সে ব্যস্তসমস্ত হইয়া ক্ষীণস্বরে বলিল ও পারবে না, রাত্তিরে এখন থাক্, ছেলেমানুষ, এখন থাক্—

এই সবের জন্য বাবার উপরে রাগ হয় কাজলের। কোথায় সে ছেলেমানুষ, সে বড় হইয়াছে। কোথায় সে না যাইতে পারে, বাবা পাঠাইয়া দেখুক দিকি সে কেমন পারে না? বিশেষতঃ অপরের সামনে তাহাকে কচি বলিলে, ছেলেমানুষ বলিলে, আদর করিলে বাবার উপর তাহার ভারী রাগ হয়।

বাবার সামনে স্টোভ ধরাইতে গেলে কাজল জানে বাবা বারণ করিবে, বলিবে—উঁহু করিস নে খোকা, হাত পুড়িয়ে ফেলবি। সে সরু বারান্দাটার এক কোণে স্টোভটা লইয়া গিয়া কয়েকবার চেষ্টা করিয়াও সেটা জ্বালিতে পারিল না। অপু একবার বলিল কি কচ্ছিস্ ও খোকা, কোথায় গেলি ও খোকা? আঃ বাবার জ্বালায় অস্থির। ঘরে আসিয়া বলিল বাবা কি খাবে? মিছরি আর বিস্কুট কিনে আনবো? অপু বলিল—না না, সে তুই পারবি নে? আমি খাবো না কিছু। লক্ষ্মী বাবা, কোথাও যেও না ঘর ছেড়ে, রাত্তিরে কি কোথাও যায়? হারিয়ে যাবি—

হ্যাঁ, সে হারাইয়া যাইবে! ছাড়িয়া দিলে সে সব জায়গায় যাইতে পারে, পৃথিবীর সর্বত্র একা যাইতে পারে, বাবার কথা শুনিলে তাহার হাসি পায়।

মাসদেড় হইল অপু সারিয়া উঠিয়াছে। হাসপাতালে যাইতে হয় নাই, এই গলিরই মধ্যে বাঁড়ুয্যেরা বেশ সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ, তাঁহাদের এক ছেলে ভাল ডাক্তার। তিনি অপুর বাড়িওয়ালার মুখে সব শুনিয়া নিজে দেখিতে আসিলেন, ইনজেক্‌শনের ব্যবস্থা করিলেন, শুশ্রূষার লোক দিলেন, কাজলকে নিজের বাড়ি হইতে খাওয়াইয়া আনিলেন। উহাদের বাড়ির সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ আলাপ হইয়া গিয়াছে।

চৈত্রের প্রথম। চাকুরি অনেক খুঁজিয়া মিলিল না। তবে আজকাল লিখিয়া কিছু আয় হয়।

সকালে একদিন অপু মেঝেতে মাদুর পাতিয়া বসিয়া বসিয়া কাজলকে পড়াইতেছিল, একজন কুড়ি-বাইশ বছরের চোখে-চশমা ছেলে দোরের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আজ্ঞে আসতে পারি? আপনারই নাম অপূর্ববাবু? নমস্কার।

—আসুন, বসুন বসুন। কোথেকে আসছেন?

—আজ্ঞে, আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়ি। আপনার বই পড়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলুম। আমার অনেক বন্ধুবান্ধব সবাই এত মুগ্ধ হয়েছে, তাই আপনার ঠিকানা নিয়ে—

অপু খুব খুশী হইল—বই পড়িয়া এত ভাল লাগিয়াছে যে, বাড়ি খুঁজিয়া দেখা করিতে আসিয়াছে একজন শিক্ষিত তরুণ যুবক। এ তার জীবনে এই প্রথম। ছেলেটি চারিদিকে চাহিয়া বলিল—আজ্ঞে ইয়ে, এই ঘরটাতে আপনি থাকেন বুঝি?

অপু একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল, ঘরের আসবাবপত্র অতি হীন, ছেঁড়া মাদুরে পিতাপুত্রে বসিয়া পড়িতেছে। খানিকটা আগে কাজল ও সে দু'জনে মুড়ি খাইয়াছে, মেঝের খানিকটাতে তার চিহ্ন। সে ছেলের ঘাড়ে সব দোষটা চাপাইয়া দিয়া সলজ্জ স্বরে বলিল—তুই এমন দুষ্টু হয়ে উঠছিস খোকা, রোজ রোজ তোকে বলি খেয়ে অমন করে ছড়াবিনে—তা তোর—আর বাটিটা অমন দোরের গোড়ায়—

কাজল এ অকারণ তিরস্কারের হেতু না বুঝিয়া কাঁদ কাঁদ মুখে বলিল—আমি কই বাবা, তুমিই তো বাটিটাতে মুড়ি—

—আচ্ছা, আচ্ছা, থাম্, লেখ, বানানগুলো লিখে ফেল।

যুবকটি বলিল—আমাদের মধ্যে আপনার বই নিয়ে খুব আলোচনা—আজ্ঞে হ্যাঁ। ওবেলা বাড়িতে থাকবেন? 'বিভাবরী' কাগজের এডিটার শ্যামাচরণবাবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন, আমি—আরও তিন-চার জন সেই সঙ্গে আসব।—তিনটে? আচ্ছা, তিনটেতেই ভাল। আরও খানিক কথাবার্তার পর যুবক

বিদায় লইলে অপু ছেলের দিকে চাহিয়া বলিল,—উস্-স্-স্-স খোকা।

ছেলে ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল—আমি আর তোমার সঙ্গে কথা কব না বাবা—

—না বাপ আমার, লক্ষ্মী আমার, রাগ ক'রো না। কিন্তু কি করা যায় বল তো?—কি বাবা?

—তুই এক্ষুণি ওঠ, পড়া থাক এবেলা, এই ঘরটা ঝেড়ে বেশ ভাল ক'রে সাজাতে হবে—আর ওই তোর ছেঁড়া জামাটা তক্তপোশের নিচে লুকিয়ে রাখ দিকি। ওবেলা 'বিভাবরী'র সম্পাদক আসবে—

—'বিভাবরী' কি বাবা?

'বিভাবরী' কাগজ রে পাগল, কাগজ—দৌড়ে যা তো পাশের বাসা থেকে বালতিটা চেয়ে নিয়ে আয় তো।

বৈকালের দিকে ঘরটা এক রকম মন্দ দাঁড়াইল না, তিনটার পরে সবাই আসিলেন। শ্যামাচরণবাবু বলিলেন—আপনার বইটার কথা আমার কাগজে যাবে আসছে মাসে। ওটাকে আমিই আবিষ্কার করেছি মশাই। আপনার লেখা গল্পটল্প? দিন না।

পরের মাসে 'বিভাবরী' কাগজে তাহার সম্বন্ধে এক নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ বাহির হইল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার গল্পটাও বাহির হইল। শ্যামাচরণবাবু ভদ্রতা করিয়া পঁচিশটি টাকা গল্পের মূল্যস্বরূপ লোক মারফৎ পাঠাইয়া দিয়া আর একটা গল্প চাহিয়া পাঠাইলেন।

অপু ছেলেকে প্রবন্ধটি পড়িতে দিয়া নিজে চোখ বুজিয়া বিছানায় শুইয়া শুনিতে লাগিল। কাজল খানিকটা পড়িয়া বলিল—বাবা এতে তোমার নাম লিখেছে যে। অপু হাসিয়া বলিল—দেখেছিস খোকা, লোকে কত ভাল বলেছে আমাকে? তোকেও একদিন ওই রকম বলবে, পড়াশুনো করবি ভাল করে, বুঝলি?

দোকানে গিয়া শুনিল 'বিভারী'তে প্রবন্ধ বাহির হইবার পরে খুব বই কাটিতেছে—তাহা ছাড়া বিভিন্ন স্থান হইতে তিনখানি পত্র আসিয়াছে। বইখানার অজস্র প্রশংসা।

একদিন কাজল বসিয়া পড়িতেছে, সে ঘরে ঢুকিয়া হাত দু'খানা পিছনের দিকে লুকাইয়া বলিল,—খোকা বল তো হাতে কি?... কথাটা বলিয়াই মনে পড়িয়া গেল, শৈশবে একদিন তাহার বাবা— সেও এমনি বৈকাল বেলাটা—তাহার বাবা এইভাবেই, ঠিক এই কথা বলিয়াই খবরের কাগজের মোড়কটা তাহার হাতে দিয়াছিল। জীবনের চক্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া কি অদ্ভুত ভাবেই আবর্তিত হইতেছে, চিরযুগ ধরিয়া। কাজল ছুটিয়া গিয়া বলিল,—কি বাবা দেখি?— পরে বাবার হাত হইতে জিনিসটা লইয়া দেখিয়া বিস্মিত ও পুলকিত হইয়া উঠিল। অজস্র ছবিওয়ালা আরব্য উপন্যাস। দাদামশায়ের বইয়ে তো এত রঙীন ছবি ছিল না? নাকের কাছে ধরিয়া দেখিল কিন্তু তেমন পুরানো গন্ধ নাই, সেই এক অভাব।

অনেকদিন পরে হাতে পয়সা হওয়াতে সে নিজের জন্য একরাশ বই ও ইংরেজী ম্যাগাজিন কিনিয়া আনিয়াছে।

পরদিন সে বৈকালে তাহার এক সাহেব বন্ধুর নিকট হইতে একখানা চিঠি পাইয়া গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলে তাহার সঙ্গে দেখা করিতে গেল। সাহেবের বাড়ি কানাডায়, চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বয়স, নাম এ্যাশবার্টন। হিমালয়ের জঙ্গলে গাছপালা খুঁজিতে আসিয়াছে, ছবিও আঁকে। ভারতবর্ষে এই দুইবার আসিল। স্টেট্‌স্‌ম্যানে তাঁহার লেখা হিমালয়ের উচ্ছ্বসিত বর্ণনা পড়িয়া অপু হোটেলে গিয়া মাস-দুই পূর্বে লোকটির সঙ্গে আলাপ করে। এই দু-মাসের মধ্যে দু-জনের বন্ধুত্ব খুব জমিয়া উঠিয়াছে।

সাহেব তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। ফ্লানেলের ঢিলা স্যুট পরা, মুখে পাইপ, খুব দীর্ঘাকার, সুশ্রী মুখ, নীল চোখ, কপালের উপরের দিকের চুল খানিকটা উঠিয়া গিয়াছে। অপুকে দেখিয়া হাসিমুখে আগাইয়া আসিল, বলিল—দেখ, কাল একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছিল। ও-রকম কোনদিন হয় নি। কাল একজন বন্ধুর সঙ্গে মোটরে কলকাতার বাইরে বেড়াতে গিয়েছিলুম। একটা জায়গায় গিয়ে বসেছি, কাছে একটা পুকুর, ও-পারে একটা মন্দির,

এক সার বাঁশগাছ, আর তালগাছ, এমন সময়ে চাঁদ উঠল, আলো আর ছায়ার কি খেলা। দেখে আর চোখ ফেরাতে পারিনে। মনে হল, Ah this is the East!...the eternal East, অমন দেখি নি কখনও। এ্যাশবার্টন তারপর বলিল,—শোন আমি কাশী যাচ্ছি, তোমাকে না নিয়ে আমি যাব না কিন্তু। আসছে হপ্তাহেই যাওয়া যাক্ চলো।

কাশী! সেখানে সে কেমন করিয়া যাইবে। কাশীর মাটিতে সে পা দিতে পারিবে না। শত-সহস্র স্মৃতি-জড়ানো কাশী, জীবনের ভাণ্ডারের অক্ষয় সঞ্চয়—ও কি যখন তখন গিয়া নষ্ট করা যায়।... সেবার পশ্চিম যাইবার সময় মোগলসরাই দিয়া গেল, কাশী যাইবার অত ইচ্ছা সত্বেও যাইতে পারিল না কেন?...কেন, তাহা অপরকে সে কি করিয়া বুঝায়!...

বন্ধু বলিল, তুমি জাভায় এসো না আমার সঙ্গে?...বারোবুদরের স্কেচ্ আঁকব, তা ছাড়া মাউণ্ট শ্যালাকের বনে যাব। ওয়েস্ট জাভাতে বৃষ্টি কম বলে ট্রপিক্যাল ফরেস্ট তত জমকালো নয়, কিন্তু ইস্ট জাভার বন দেখলে তুমি মুগ্ধ হবে, তুমি তো বন ভালবাস, এস না।...

কাশী হইতে ফিরিবার সপ্তাহ খানেকের মধ্যে অপু 'বিভাবরী' ও 'বঙ্গ সুহৃদ' দু'খানা পত্রিকার তরফ হইতে উপন্যাস লিখিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছিল। দু'খানাই প্রসিদ্ধ মাসিক পত্র, দু'খানারই গ্রাহক সারা বাংলা জুড়িয়া এবং পৃথিবীর যেখানে যেখানে বাঙালী আছে, সর্বত্র। 'বিভাবরী' তাহাকে সম্প্রতি আগাম কিছু টাকা দিল—'বঙ্গ সুহৃৎ'-এর নিজেদের বড় প্রেস আছে—তাহারা নিজের খরচে অপুর একখানা ছোট গল্পের বই ছাপাইতে রাজী হইল। অপুর বইখানির বিক্রয়ও হঠাৎ বাড়িয়া গেল, আগে যে সব দোকানে তাহাকে পুছিতও না—সে সব দোকান হইতে বই চাহিয়া পাঠাইতে লাগিল। এই সময়ে একটি বিখ্যাত পুস্তক-প্রকাশক ফার্মের নিকট হইতে একখানা পত্র পাইল, অপু যেন একবার গিয়া দেখা করে।

অপু বৈকালের দিকে দোকানে গেল। তাহারা বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণ নিজেদের খরচে ছাপাইতে ইচ্ছুক—অপু কি চায়? অপু ভাবিয়া দেখিল। প্রথম সংস্করণ হু-হু কাটিতেছে—অপর্ণার গহনা বিক্রয় করিয়া বই ছাপাইয়াছিল, লাভটা তার সবই নিজের। ইহাদের দিলে লাভ কমিয়া যাইবে বটে, কিন্তু দোকানে দোকানে ছুটাছুটি, তাগাদা—এসব হাঙ্গামাও কমিবে। তা ছাড়া নগদ টাকার একটা মোহ আছে, সাতপাঁচ ভাবিয়া সে রাজী হইল। ফার্মের কর্তা তখনই একটা লেখাপড়া করিয়া লইলেন—আপাততঃ ছশো টাকায় কথাবার্তা মিটিল, শ'-দুই সে নগদ পাইল।

দু'শো টাকা খুচরা ও নোটে। এক গাদা টাকা হাতে ধরে না। কি করা যায় এত টাকায়? পুরানো দিন হইলে সে ট্যাক্সি করিয়া খানিকটা বেড়াইত, রেস্টুরেণ্টে খাইত, বায়োস্কোপ দেখিত। কিন্তু আজকাল আগেই খোকার কথা মনে হয়। খোকাকে কি আনন্দ দেওয়া যায় এ টাকায়? মনে হয় লীলার কথা। লীলা কত আনন্দ করিত আজ।

একটা ছোট গলি দিয়া যাইতে যাইতে একটা শরবৎ-এর দোকান। দোকানটাতে পান বিড়ি বিস্কুট বিক্রি হয়, আবার গোটা দুই তিন সিরাপের বোতলও রহিয়াছে। দিনটা খুব গরম, অপু শরবৎ খাওয়ার জন্য দোকানটাতে দাঁড়াইল। অপুর একটু পরেই দু'টি ছেলেমেয়ে সেখানে কি কিনিতে আসিল। গলিরই কোন গরিব ভাড়াটে গৃহস্থ ঘরের ছোট ছেলে মেয়ে—মেয়েটি বছর সাত, ছেলেটি একটু বড়। মেয়েটি আঙ্গুল দিয়া সিরাপের বোতল দেখাইয়া বলিল—ওই ছাখ দাদা সবুজ—বেশ ভালো, না? ছেলেটি বলিল—সব মিশিয়ে ছায়। বরফ আছে, ওই যে—

—ক' পয়সা নেয়?—চার পয়সা।

অপুর জন্য দোকানী শরবৎ মিশাইতেছে, বরফ ভাঙ্গিতেছে, ছেলেমেয়ে দুটি মুগ্ধনেত্রে দেখিতে লাগিল। মেয়েটি অপুর দিকে চাহিয়া বলিল—আপনাকে ওই সবুজ বোতল থেকে দেবে না?

যেন সবুজ বোতলের মধ্যে সচীদেবীর পায়স পোরা আছে।

অপুর মন করুণার্দ্র হইল। ভাবিল—এরা বোধ হয় কখনও কিছু দেখেনি এই রং করা টক চিনির রসকে কি ভাবছে, ভালো সিরাপ কি জানে না। বলিল—খুকী, খোকা খাবে? খাও না—ওদের ছু'গ্লাস শরবৎ দাও তো—

প্রথমটা তারা খাইতে রাজী হয় না, অনেক করিয়া অপু তাহাদের লজ্জা ভাঙ্গিল। অপু বলিল—ভালো সিরাপ তোমার আছে? থাকে তো দাও, আমি দাম দোব। কোন জায়গা থেকে এনে দিতে পার না?

বোতলে যাহা আছে তাহার অপেক্ষা ভাল সিরাপ এ অঞ্চলে নাকি কুত্রাপি মেলা সম্ভব নয়। অবশেষে এই শরবৎই এক এক বড় গ্লাস ছুই ভাই-বোন মহাতৃপ্তি ও আনন্দের সহিত খাইয়া ফেলিল, সবুজ বোতলের সেই টক চিনির রসই।

অপু তাহাদের বিস্কুট ও এক পয়সা মোড়কের বাক্সে চকলেট কিনিয়া দিল—দোকানটাতে ভালো কিছু যদি পাওয়া যায় ছাই। তবুও অপুর মনে হইল পয়সা তার সার্থক হইয়াছে আজ।

বাসায় ফিরিয়া তাহার মনে হইল বড় সাহিত্যের প্রেরণার মূলে এই মানব-বেদনা। ১৮৬৩ সাল পর্যন্ত রাশিয়ার প্রজাস্বত্ব আইন 'সার্ফ' নীতি; জার-শাসিত রাশিয়ার সাইবেরিয়া, শীত, অত্যাচার, কুসংস্কার, দারিদ্র্য—গোগোল, ডস্টয়ভস্কি গোর্কি, টলস্টয় ও চেকভের সাহিত্য সম্ভব করিয়াছে। সে বেশ কল্পনা করিতে পারে, দাস-ব্যবসায়ের ছুর্দিনে, আফ্রিকার এক মরুবেষ্টিত পল্লী-কুটির হইতে কোমলবয়স্ক এক নিগ্রো বালক পিতামাতার স্নেহকোল হইতে নিষ্ঠুরভাবে বিচ্যুত হইয়া বহু দূর বিদেশের দাসের হাটে ক্রীতদাসরূপে বিক্রীত হইল, বহুকাল আর সে বাপ-মাকে দেখিল না, ভাই-বোনেদের দেখিল না—দেশে দেশে তাহার অভিনব জীবনধারার দৈন্য, অত্যাচার ও গোপন অশ্রুজলের কাহিনী, তাহার জীবনের সে অপূর্ব ভাবানুভূতির অভিজ্ঞতা সে যদি লিখিয়া রাখিয়া যাইতে পারিত। আফ্রিকার নীরব নৈশ আকাশ তাহাকে প্রেরণা

দিত, তাম্রবর্ণ মরুদিগন্তের স্বপ্নমায়া তাহার চোখের অঞ্জন মাখাইয়া দিত; কিন্তু বিশ্বসাহিত্যের দুর্ভাগ্য, তাহারা নীরবে অত্যাচার সহ্য করিয়া বিশ্ব হইতে বিদায় লইল।

রাত্রিতে অপুর মনে হইল সে একটা বড় অন্যায় করিতেছে, কাজলের প্রতি একটা গুরুতর অবিচার করিতেছে। ওরও তো সেই শৈশব। কাজলের এই অমূল্য শৈশবের দিনগুলিতে সে তাহাকে এই ইট, কংক্রিট, সিমেন্ট ও বার্ডকোম্পানীর পেটেন্ট স্টোনে বাঁধানো কারাগারে আবদ্ধ রাখিয়া তাহার কাঁচা, উৎসুক, স্বপ্নপ্রবণ শিশুমন তুচ্ছ বৈচিত্র্যহীন অনুভূতিতে ভরাইয়া তুলিতেছে—তাহার জীবনে বন-বনানী নাই, নদীর মর্মর নাই, পাখির কলস্বর, মাঠ, জ্যোৎস্না, সঙ্গী-সাথীদের সুখদুঃখ—এসব কিছুই নাই, অথচ কাজল অতি সুন্দর ভাবপ্রবণ বালক—তাহার পরিচয় সে অনেক বার পাইয়াছে।

কাজল দুঃখ জানুক, জানিয়া মানুষ হউক। দুঃখ তার শৈশবে গল্পে পড়া সেই সোনা-করা যাদুকর। ছেঁড়া-খোঁড়া কাপড় ঝুলি ঘাড়ে বেড়ায়, এই চাপ-দাড়ি, বোনে-বাঁদাড়ে ফেরে, কারুর সঙ্গে কথা কয় না, কেউ পোছে না, সকলে পাগল বলে দূর দূর করে, রাতদিন হাপর জ্বালায়, রাতদিন হাপর জ্বালায়।

পেতল থেকে, রাং থেকে, সীসে থেকে ও লোক কিন্তু সোনা করতে জানে, করিয়াও থাকে।

এই দিনটিতে বসিয়া ভাবিতে ভাবিতে সর্বপ্রথম এতকাল পরে একটা চিন্তা মনে উদয় হইল। নিশ্চিন্দিপুব একবারটি ফিরিলে কেমন হয়? সেখানে আর কেউ না থাক, শৈশব-সঙ্গিনী রাণুদিদি তো আছে। সে যদি বিদেশে চলিয়া যায়, তার আগে খোকাকে তার পিতামহের ভিটাটা দেখাইয়া আনাও তো একটা কর্তব্য?

পরদিনই সে কাশীতে লীলাদিকে পঁচিশটা টাকা পাঠাইয়া লিখিল, সে খোকাকে লইয়া নিশ্চিন্দিপুর যাইতেছে, খোকাকে পিতামহের গ্রামটা দেখাইয়া আনিবে। পত্রপাঠ যেন লীলাদি তার দেওরকে সঙ্গে লইয়া সোজা নিশ্চিন্দিপুরে চলিয়া যায়।

নিশ্চিন্দিপুরে কাজলকে নিয়ে অপু

সাত

ট্রেনে উঠিয়াও যেন অপুর বিশ্বাস হইতেছিল না, সে সত্যই নিশ্চিন্দিপুরের মাটিতে আবার পা দিতে পারিবে—নিশ্চিন্দিপুর, সে তো শৈশবের স্বপ্নলোক। সে তো মুছিয়া গিয়াছে, মিলাইয়া গিয়াছে, সে শুধু একটা অনতিস্পষ্ট সুখস্মৃতি মাত্র, কখনও ছিল না, নাই-ও।

মাঝের পাড়া স্টেশনে ট্রেণ আসিল বেলা একটার সময়। খোকা লাফ দিয়া নামিল, কারণ প্লাটফর্ম খুব নিচু। অনেক পরিবর্তন হইয়াছে স্টেশনটার, প্লাটফর্মের মাঝখানে জাহাজের মাস্তুলের মত উঁচু যে সিগন্যালটা ছেলেবেলায় তাহাকে তাক লাগাইয়া দিয়াছিল সেটা আর এখন নাই। স্টেশনের বাহিরে পথের উপর একটা বড় জাম গাছ, অপুর মনে আছে, এটা আগে ছিল না। ওই সেই বড় মাদার গাছটা, যেটার তলায় অনেককাল আগে তাহাদের এদেশ ছাড়িবার দিনটাতে মা খিচুড়ি রাঁধিয়াছিলেন। গাছের তলায় দু'খানা মোটরবাস যাত্রীর প্রত্যাশায় দাঁড়াইয়া, অপুরা থাকিতে থাকিতে দু'খানা পুরনো ফোর্ড ট্যাক্সিও আসিয়া জুটিল। আজকাল নাকি নবাবগঞ্জ পর্যন্ত বাস ও ট্যাক্সি হইয়াছে, জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল—জিনিসটা অপুর কেমন যেন ভাল লাগিল না। কাজল নবীন যুগের মানুষ, সাগ্রহে বলিল—মোটর কারে ক'রে যাব বাবা? অপু ছেলেকে জিনিসপত্রসমেত ট্যাক্সিতে উঠাইয়া দিল, বটের ঝুরি

দোলানো, স্নিগ্ধ ছায়াভরা সেই প্রাচীন দিনের পথটা দিয়া সে নিজে মোটরে চড়িয়া যাইতে পারিবে না কখনই। এদেশের সঙ্গে পেট্রোল গ্যাসের গন্ধ কি খাপ খায়?

রাণুদিদির সঙ্গে দেখা হইল পরদিন বৈকালে। সাক্ষাতের পূর্ব-ইতিহাসটা কৌতুকপূর্ণ, কথাটা রানীর মুখেই শুনিল।

রানী অপু আসিবার কথা শুনে নাই, নদীর ঘাট হইতে বৈকালে ফিরিতেছে, বাঁশবনের পথে কাজল দাঁড়াইয়া আছে, সে একা গ্রামে বেড়াইতে বাহির হইয়াছে।

রানী প্রথমত থতমত খাইয়া গেল—অনেককাল আগেকার একটা ছবি অস্পষ্ট মনে পড়িল—ছেলেবেলায় ওই ঘাটের ধারের জঙ্গলে-ভিটাটাতে হরিকাকারা বাস করিত, কোথায় যেন তাহারা উঠিয়া গিয়াছিল তারপরে। তাদের বাড়ির সেই অপু না?···ছেলেবেলায় সেই অপু? পরক্ষণেই সামলাইয়া লইয়া সে কাছে গিয়া ছেলেটির মুখের দিকে চাহিল—অপুও বটে, নাও বটে। যে বয়সে সে গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল তার সে সময়ের চেহারাখানা রানীর মনে আঁকা আছে, কখনও ভুলিবে না—সেই বয়স, সেই চেহারা, অবিকল। রানী বলিল—তুমি কাদের বাড়ি এসেছ খোকা?

কাজল বলিল—গাঙ্গুলীদের বাড়ি গাঙ্গুলীরা বড়লোক, কলিকাতা হইতে কেহ কুটুম্ব আসিয়া থাকিবে, তাদেরই ছেলে। কিন্তু মানুষের মতও মানুষ হয়? বুকের ভিতরটা ছাঁত করিয়া উঠিয়াছিল একেবারে। গাঙ্গুলী বাড়ির বড় মেয়ের নাম করিয়া বলিল—তুমি বুঝি কাদু-পিসির নাতি?

কাজল লাজুক চোখে চাহিয়া বলিল—কাদুপিসি কে জানি নে তো? আমার ঠাকুরদাদার এই গাঁয়ে বাড়ি ছিল—তাঁর নাম ঈশ্বর হরিহর রায়—আমার নাম শ্রীঅমিতাভ রায়।

বিস্ময়ে ও আনন্দে রানীর মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না অনেকক্ষণ। সঙ্গে সঙ্গে একটা অজানা ভয়ও হইল। রুদ্ধনিশ্বাসে বলিল—তোমার বাবা—খোকা?···

কাজল বলিল—বাবার সঙ্গেই তো কাল এলাম। গাঙ্গুলীবাড়িতে এসে উঠলাম রাত্রে। বাবা ওদের বাইরের ঘরে বসে গল্প করচে। মেলা লোক দেখা করতে এসেচে কিনা তাই।...

রানী দুই হাতের তালুর মধ্যে কাজলের সুন্দর মুখখানা লইয়া আদরের সুরে বলিল—খোকন, খোকন ঠিক বাবার মত দেখতে—চোখ দুটি অবিকল। তোমার বাবাকে এ পাড়ায় ডেকে নিয়ে এসো খোকন। বলগে রাণুপিসি ডাকচে।

সন্ধ্যার আগেই ছেলের হাত ধরিয়া অপু রানীদের বাড়ি ঢুকিয়া বলিল কোথায় গেলে রাণুদি, চিনতে পার?...রাণু ঘরের ভিতর হইতে ছুটিয়া আসিল, অবাক্ হইয়া খানিকক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, বলিল, মনে করে যে এলি এতকাল পরে? তা ও-পাড়ায় গিয়ে উঠলি কেন? গাঙ্গুলীরা আপনার লোক হ'ল তোর?...পরে লীলাদির মত সেও কাঁদিয়া ফেলিল।

দূর গ্রামের জাওয়া-বাঁশের বন অস্ত-আকাশের রাঙা পটে অতিকায় লায়ার পাখির পুচ্ছের মত খাড়া হইয়া আছে, একধারে খুব উঁচু পাড়ে সারিবাঁধা গাঙশালিকের গর্ত, কি অপূর্ব শ্যামলতা, কি সান্ধ্য-শ্রী।

কাজল বলিল—বেশ দেশ বাবা—না?

—তুই এখানে থাক্ খোকা—আমি যদি রেখে যাই এখানে, থাকতে পারবি নে? তোর পিসিমার কাছে থাকবি, কেমন তো?

কাজল বলিল—হ্যাঁ, ফেলে রেখে যাবে বৈ কি? আমি তোমার সঙ্গে যাব বাবা। অপু ভাবিতেছিল শৈশবে এই ইছামতী ছিল তার কাছে কি অপূর্ব কল্পনায় ভরা। গ্রামের মধ্যের বর্ষাদিনের জলকাদা-ভরা পথঘাট, বাঁশপাতাপচা আঁটাল মাটির গন্ধ থেকে নিষ্কৃতি পাইয়া সে মুক্ত আকাশের তলে নদীর ধারটিতে আসিয়া বসিত। কত বড় নৌকা ওর ওপর দিয়া দূর দেশে চলিয়া যাইত। কোথায় ঝালকাটি

কোথায় বরিশাল, কোথায় রায়মঙ্গল—অজানা দেশের অজানা কল্পনায় মুগ্ধ মনে কতদিন সে না ভাবিয়াছে, সেও একদিন ওই রকম নেপাল মাঝির বড় ডিঙিটা করিয়া নিরুদ্দেশ বাণিজ্যযাত্রায় বাহির হইয়া যাইবে।

ইছামতী ছিল পাড়াগাঁয়েরের গরীব ঘরের মা। তার তীরের আকাশে-বাতাসের সঙ্গীত মায়ের মুখের ঘুম-পাড়ানি গানের মত শত স্নেহে তার নবমুকুলিত কচি মনকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছিল, তার তীরে সে সময়ের কত আকাঙ্ক্ষা, বৈচিত্র্য, রোমান্স, তার তীর ছিল দূরের অদেখা বিদেশ, বর্ষার দিনে এই ইছামতী কূলে-কূলে ভরা ঢলঢল গৈরিক রূপে সে অজানা মহাসমুদ্রের তীরহীন অসীমতার স্বপ্ন দেখিত। ইংরাজি বই-এ পড়া Cape Nun-এর ওদিকের দেশটা—যে দেশ হইতে লোক আর ফেরে না ; He who passes Cape Nun, will either return or not ; মুগ্ধচোখে কূল-ছাপানো ইছামতী দেখিয়া তখন সে ভাবিত—ওঃ, কত বড় আমাদের এই গাঙটা !

এখন সে আর বালক নাই, কত বড় নদীর দু'কূল-ছাপানোর লীলা দেখিয়াছে—গঙ্গা, শোণ, বড়দল, নর্মদা—তাদের অপূর্ব সন্ধ্যা, অপূর্ব বর্ণসম্ভার দেখিয়াছে—সে বৈচিত্র্য, সে প্রখরতা ইছামতীর নাই, এখন তার চোখে ইছামতী ছোট নদী। এখন সে বুঝিয়াছে তার গরীব ঘরের মা উৎসব দিনের যে বেশভূশায় তার শৈশব-কল্পনাকে মুগ্ধ করিয়া দিত, এসব বনেদী ঘরে মেয়েদের হীরামুক্তার ঘটা, বারানসী শাড়ির রংঢং-এর কাছে তার মায়ের সেই কাচের চুড়ি শাঁখা কিছুই নয়।

কিন্তু তা বলিয়া ইছামতীকে সে কি কখনো ভুলিবে ?

নদীতে গা ধুইতে গিয়া নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় এই সব কথাই সে ভাবিতেছিল। সারাদিনটা আজ গুমট গরম, প্রতিপদ তিথি—কাল গিয়াছে পূর্ণিমা। আজ এখনি জ্যোৎস্না উঠিবে। এই নদীতে ছেলেবেলায় যে-সব বধূরা জল লইতে আসিত, তারা এখন প্রৌঢ়া,

যে-সব কোকিল সেই ছেলেবেলাকার রামনবমী দিনের পুলক মুহূর্তগুলি ভরাইয়া দুপুরে কু কু ডাক দিত, কচিপাতা-ওঠা বাঁশবনে তাদের ছেলেমেয়েরা আবার তেমনি গায়।

শুধু তাহার দিদি শুইয়া আছে। রায়পাড়ার ঘাটের ওধারে ওই প্রাচীন ছাতিম গাছটার তলায় তাহাদের গ্রামের শ্মশান। সে-দিদির বয়স আর বাড়ে নাই, মুখের তারুণ্য বিলুপ্ত হয় নাই—তার কাচের চুড়ি, নাটাফলের পুঁটুলি অক্ষয় হইয়া আছে এখনও। প্রাণের গোপন অন্তরে যেখানে অপুর শৈশবকালের কাঁচা শিশুমনটি প্রবুদ্ধ জীবনের শত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, উচ্চাশা ও কর্মস্তূপের নিচে চাপা পড়িয়া মরিয়া আছে—সেখানে সে চিরবালিকা, শৈশব জীবনের সে সমাধিতে জনহীন অন্ধকার রাত্রে সে-ই আসিয়া নীরবে চোখের জল ফেলে—শিশু প্রাণের সাথীকে আবার খুঁজিয়া ফেরে।

আজ চব্বিশ বৎসর ধরিয়া সাঁঝ-সকালে আশ্রয়স্থানটিতে সোনার সূর্যকিরণ পড়ে। বর্ষাকালের নিশীথে মেঘ ঝর ঝর জল ঢালে, ফাগুন দিনে ঘেঁটু ফুল, হেমন্ত দিনে ছাতিম ফুল ফোটে। জ্যোৎস্না উঠে। কত পাখি গান গায়। সে এ সবই ভালবাসিত। এ সব ছাড়িয়া যাইতে পারে নাই কোথাও।

অপু তাহাদের ঘাটের ধারে, আসিল। ওইখানটিতে এমন এক সন্ধ্যার অন্ধকারে বনদেবী বিশালাক্ষী স্বরূপ চক্রবর্তীকে দেখা দিয়াছিলেন কতকাল আগে।

আজ যদি আবার তাহাকে দেখা দেন!

—তুমি কে?—আমি অপু।

—তুমি বড় ভাল ছেলে। তুমি কি বর চাও?

—অন্য কিছুই চাইনে, এ গাঁয়ের বনঝোপ, নদী, মাঠ, বাঁশ-বাগানের ছায়ায় অবোধ, উদ্‌গ্রীব, স্বপ্নময় আমার সেই যে দশ বৎসর বয়সের শৈশবটি—তাকে আর একটিবার ফিরিয়ে দেবে দেবী?—

"You enter it by the Ancient way
Through Ivory Gate and Golden"

প্রবাসের পথে অপু আট
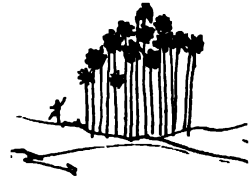
ঠিক দুপুর বেলা।

রানী কাজলকে আটকাইয়া রাখিতে পারে না—বেজায় চঞ্চল। এই আছে, কোথা দিয়া যে কখন বাহির হইয়া গিয়াছে—কেহ বলিতে পারে না। সে রোজ জিজ্ঞাসা করে—পিসিমা, বাবা কবে আসবে? কতদিন দেরী হবে?—

অপু যাইবার সময় বলিয়া গিয়াছিল—রাণুদি, খোকাকে তোমার হাতে দিয়ে যাচ্ছি, এখানে রাখবে; ওকে ব'লো না আমি কোথা যাচ্ছি। যদি আমার জন্য কাঁদে, ভুলিয়ে রেখো—তুমি ছাড়া ওকাজ আর কেউ পারবে না।

রাণু চোখ মুছিয়া বলিয়াছিল—ওকে এ-রকম ফাঁকি দিতে তোর মন সরছে? বোকা ছেলে তাই বুঝিয়ে গেলি—যদি চালাক হ'ত?

অপু বলিয়াছিল, দেখ আর একটা কথা বলি। ওই বাঁশবনের জায়গাটা তোমায় চল দেখিয়ে রাখি—একটা সোনার কৌটা মাটিতে পোঁতা আছে আজ অনেকদিন—মাটি খুঁড়লেই পাবে। আর যদি না ফিরি আর খোকা যদি বাঁচে—বৌমাকে কৌটোটা দিও সিঁদুর রাখতে। খোকাও কষ্ট পেয়ে মানুষ হোক—এত তাড়াতাড়ি স্কুলে ভর্তি করার দরকার নেই। যেখানে যায় যেতে দিও—কেবল যখন ঘাটে যাবে, তুমি নিজে নাইতে নিয়ে যেও—সাঁতার জানে না, ছেলেমানুষ ডুবে যাবে। ও একটু ভীতু আছে, কিন্তু সে ভয় এর নেই তা-নেই বলে ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা ক'রো না—কি আছে কি নেই তা

বলতে কেউ পারে না রাণুদি। কোনো দিকেই গোঁড়ামি ভাল নয়—তা ওর ওপর চাপাতে যাওয়ার দরকার নেই। যা বোঝে বুঝুক, সেই ভাল।

অপু জানিত, কাজল শুধু যার কল্পনা-প্রবণতার জন্য ভীতু। এই কাল্পনিক ভয় সকল আনন্দ রোমান্স ও অজানা কল্পনা উৎস মুখ। মুক্ত প্রকৃতির তলায় খোকার মনে সব বৈকাল রাত্রিগুলি অপূর্ব রহস্যে রঙীন হয়ে উঠুক—মনে প্রাণে এই তাহার আশীর্বাদ।

ভবঘুরে অপু আবার কোথায় চলিয়া গিয়াছে। হয়ত লীলার মুখের শেষ অনুরোধ রাখিতে কোন পোর্তো প্লাতার ডুবো জাহাজের সোনার সন্ধানেই বা বাহির হইয়াছে। গিয়াছেও ছ'সাত মাস হইল।

সতুও অপুর ছেলেকে ভালবাসে। সে ছেলেবয়সের সেই দুষ্টু সতু আর নাই, এখন সংসারের কাছে ঠেকিয়া সম্পূর্ণ বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। এখন সে আবার খুব হরিভক্ত। গলায় মালা, মাথায় লম্বা চুল। দোকান হইতে ফিরিয়া হাত মুখ ধুইয়া রোয়াকে বসিয়া খোল লইয়া কীর্তন গায়। নীলমণি রায়ের দরুন জমার বাগাম বিক্রয় করিয়া অপুর কাছে সত্তর টাকা পাইয়াছিল—তাহা ছাড়া কাটিহা'র তামাকের চালান আনিবার জন্য অপুর নিকট আরও পঞ্চাশটি টাকা ধার স্বরূপ লইয়াছিল। এটা রানীকে লুকাইয়া—কারণ রানী জানিতে পারিলে মহা অনর্থ বাধাইত—কখনও টাকা লইতে দিত না।

কাজলের ঝোঁক পাখির উপর। এত পাখি সে কখনও দেখে নাই—তাহার মামার বাড়ির দেশে ঘিঞ্জি বসতি, এত বড় বন, মাঠ নাই—এখানে আসিয়া সে অবাক হইয়া গিয়াছে। রাত্রে শুইয়া শুইয়া মনে হয় পিছনের সমস্ত মাঠ, বন রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে দৈত্যদানো ভূত ও শিয়ালের ভিড়ে ভরিয়া গিয়াছে—পিসিমার কাছে আরও ঘেঁষিয়া শোয়। কিন্তু দিনমানে আর ভয় থাকে না, তখন পাখির ডিম ও বাসা খুঁজিয়া বেড়াইবার খুব সুযোগ। রাণু বারণ করিয়াছে—পাড়ের ধারের পাখির গর্তে হাত দিও না কাজল, সাপ থাকে

শোনো না, সেদিনও গিয়াছিল পিসিমাকে লুকাইয়া কিন্তু অন্ধকার হইয়া গেলেই তার যত ভয়।

দুপুরে সেদিন পিসিমাদের বাড়ির পিছনে বাঁশবনে পাখির বাসা খুঁজিতে বাহির হইয়াছিল। সবে শীতকাল শেষ হইয়া রৌদ্র বেজায় চড়িয়াছে আকাশে বাতাস বনে কেমন গন্ধ। বাবা তাহাকে কত বনের গাছ, পাখি চিনাইয়া দিয়া গিয়াছে, তাই সে জানে কোথায় বনমরিচার লতায় থোকা থোকা সুগন্ধ-ফুল ধরিয়াছে, কেলেকোঁড়ার লতার কচি ডগা ঝোপের মাথায় মাথায় সাপের মত দুলিতেছে।

কখনও সে ঠাকুরদাদার পোঁড়ো ভিটাটাতে ঢোকে নাই। বাহির হইতে তাহার বাবা তাহাকে দেখিয়াছিল, বোধ হয় ঘন বন বলিয়া ভিতরে লইয়া যায় নাই। একবার ঢুকিয়া দেখিতে কৌতূহল হইল।

জায়গাটা খুব উঁচু ঢিবিমত। কাজল এদিকে ওদিকে চাহিয়া ঢিবিটার উপরে উঠিল—তারপর ঘন কুঁচকাঁটা ও শ্যাওড়া বনের বেড়া ঠেলিয়া নিচের উঠানে নামিল। চারিধারে ইট, বাঁশের কঞ্চি, ঝোপঝাপ। পাখি নাই এখানে? এখানে তো কেউ আসে না—কত পাখির বাসা আছে হয়ত—কে বা খোঁজ রাখে?

বসন্তবৌরী ডাকে—টুকৃলি, টুকলি—তাহার বাবা চিনাইয়াছিল, কোথায় বাসাটা? না, এমনি ডালে বসিয়া ডাকিতেছে?

মুখ উঁচু করিয়া খোকা ঝিকুড়ে গাছের ঘন ডালপালার দিকে উৎসুক চোখে দেখিতে লাগিল।

এক ঝলক হাওয়া যেন পাশের পোড়ো ঢিবিটার দিক হইতে অভিনন্দন বহন করিয়া আনিল—সঙ্গে সঙ্গে ভিটার মালিক ব্রজ চক্রবর্তী, ঠ্যাঙাড়ে বীরু রায়, ঠাকুরদাদা হরিহর রায়, ঠাকুরমা সর্বজয়া, পিসিমা দুর্গা—জানা অজানা সমস্ত পূর্বপুরুষ দিবসের প্রসন্ন হাসিতে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল—এই যে তুমি—আমাদের হয়ে ফিরে এসেছ, আমাদের সকলের প্রতিনিধি যে আজ তুমি আমাদের আশীর্বাদ নাও, বংশের উপযুক্ত হও।

আরও বাহির হইল। সোঁদালি বনের ছায়া হইতে জল আহরণরত সহদেব, ঠাকুমাদের বেলতলা হইতে শরশয্যাশায়িত ভীষ্ম, এ ঝোপের ও ঝোপের তলা হইতে বীর কর্ণ, গাণ্ডীবধারী অর্জুন, অভাগিনী ভানুমতী, কপিধ্বজ রথে সারথি শ্রীকৃষ্ণ, পরাজিত রাজপুত্র দুর্যোধন, তমসাতীরের পর্ণ কুটিরে প্রীতিমতী তাপসবধূবেষ্টিতা অশ্রুমুখী ভগবতী দেবী জানকী, স্বয়ংবর সভায় বরমাল্যহস্তে ভ্রাম্যমাণা আনতবদনা সুন্দরী সুভদ্রা, মধ্যাহ্নের খররৌদ্রে মাঠে মাঠে গোচারণ-রত সহায়-সম্পদহীন দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পুত্র ত্রিজট—হাতছানি দিয়া হাসিমুখে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল—এই যে তুমি, এই যে আবার ফিরে এসেছ। চেন না আমাদের? কত দুপুরে ভাঙা জানালাটায় বসে বসে আমাদের সঙ্গে মুখোমুখি যে কত পরিচয়। এসো···এসো···এসো····

সঙ্গে সঙ্গে রাণুর গলা শোনা গেল—ও খোকা, ওরে দুষ্টু ছেলে, এই এক গলা বনের মধ্যে ঢুকে তোমার কি হচ্ছে জিজ্ঞেস করি—বেরিয়ে আয় বলছি। খোকা হাসিমুখে বাহির হইয়া আসিল। সে পিসিমাকে মোটেই ভয় করে না। সে জানে পিসিমা তাকে খুব ভালবাসে—দিদিমার পরে এক বাবা ছাড়া তাকে এমন ভাল আর কেউ বাসে নাই।

হঠাৎ সেই সময় রাণুর মনে হইল অপু ঠিক এমনি দুষ্টু মুখের ভঙ্গি করিত ছেলেবেলায়—ঠিক এমনটি।

যুগে যুগে অপরাজিত জীবন-রহস্য কি অপূর্ব মহিমাতেই আবার আত্ম-প্রকাশ করে!

খোকার বাবা একটু ভুল করিয়াছিল।

চব্বিশ বৎসরের অনুপস্থিতির পর অবোধ বালক অপু আবার নিশ্চিন্দিপুর ফিরিয়া আসিয়াছে।

সমাপ্ত

নিশ্চিন্দিপুরে কাজল এক

শীত শেষ হইয়া বসন্তের বাতাস বহিতে শুরু করিয়াছে। পুরাতন পাতা ঝরিয়া গিয়া গাছে গাছে নতুন কচিপাতার সমারোহ। এই দিনগুলোতে কাজলের বেশিক্ষণ বাড়িতে মন বসে না—বিশেষতঃ বৈকালের দিকে। সূর্য বাঁশবাগানের মাথা ছাড়াইয়া একটু নামিলেই রোদটা কেমন রাঙা আর আরামদায়ক হইয়া আসে। রাণুপিসিদের গাইটা অলস মধ্যাহ্নে জঙ্গলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঘাসলতা খায়। কাজল উত্তরের জানালায় বসিয়া লক্ষ্য করে। কিছুক্ষণ পরে তাহার আর মন টেঁকে না—বাহিরে যাইবার জন্য ছটফট করিতে থাকে। বন্য লতাপাতার যে বিশেষ ঘ্রাণটা বাতাসে বহিয়া আসে—সেটাই যেন তাহাকে আরও চঞ্চল করিয়া তোলে। গন্ধটার সহিত এই বাহিরে যাইবার ইচ্ছার যে কি সম্পর্ক—তাহা সে বুঝিতে পারে না, কেমন যেন রহস্যময় ভাব হয় মনে।

সন্তর্পণে দরজার খিল খুলিতে গেলে অসাবধানে আওয়াজ হয়। রাণু জাগিয়া বলে—ছেলের বুঝি আবার বেরুনো হচ্ছে?

কাজল একটু অপ্রতিভ হয় বটে, কিন্তু ভয় পায় না। খিলটা হাতে ধরিয়াই দুষ্টামির হাসি হাসিতে থাকে।

বাহির হইতে দিতে রাণুর আপত্তি নাই। শুধু সাবধান করিয়া দেয়—খবরদার নদীতে নামবি নে, নৌকোয় উঠবি নে কিন্তু—বল, উঠবি নে?

কাজল প্রতিজ্ঞা করিয়া তবে বাহিরে যাইবার অনুমতি পায়।

অপু বলিয়া গিয়াছিল—দেখো রাণুদি, নদীতে যেন একলা না যায়। চান করবার সময় তুমি সঙ্গে নিয়ে যাবে। ছেলেমানুষ,

সাঁতার জানে না—ডুবে যেতে পারে। কাজলও রাণুপিসির কথার অবাধ্য হয় না—ইছামতীর ঘাটে জেলেদের মাছধরা নৌকোগুলি বাঁধা থাকে। এপাড়ার ওপাড়ার কিছু ছেলে জমা হইয়া তাহার উপর উঠিয়া খেলা করে। কাজলের পাড়ে বসিয়া খেলা ছাড়া গত্যন্তর নাই। পিসি বারণ করিয়াছে যে।

বাড়ি হইতে বাহির হইয়া কাজল বাবার নতুন কেনা আমবাগানের দিকে হাঁটিতে থাকে। বাগানের প্রান্তে কাহাদের একটা বাঁশঝাড়। সতুকাকা সেদিন বলিতেছিল বাঁশগাছ নাকি খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে। রাতারাতি নাকি বাঁশের কোঁড় একহাত লম্বা হইতে দেখা গিয়াছে। কথাটা শুনিয়া কাজলের মনে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা জাগিয়া উঠিল। তাই এ জায়গাকে সে উপযুক্ত স্থান হিসাবে নির্বাচিত করিয়াছে। বাগানের শেষ গাছটার নীচে একখানি বাঁশের কোঁড় হইয়াছে। হাত দিয়া মাপিয়া আমগাছের গুঁড়িতে সমান উচ্চতায় কাজল ঝামা ঘসিয়া একটা দাগ দিয়া রাখে প্রত্যেক দিন। পরের দিন গিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখে, গাছ কতখানি বাড়িল। গাছটার কাছে পৌঁছিয়া কাজল ভাল একটা ঝামা খুঁজিতে লাগিল। কাছাকাছি পাওয়া গেল না। কাজলকে ঢুকিতে হইল বাঁশবনের মধ্যে। বাঁশবনের ভিতরকার আগাছা কেহ কোনদিন পরিষ্কার করে না—মালিকের দায় পড়ে নাই। নির্দিষ্ট সময়ের শেষে কয়েক গাড়ি বাঁশ কাটিয়া চালান দিয়া সিন্দুকে পয়সা তুলিলেই তাহার কাজ শেষ। বাঁশতো বিনা যত্নেই বাড়ে। তাহার জন্য আবার কে—

কাজল একবার থামিতেই পায়ের নীচের শুকনা বাঁশপাতার মচমচ শব্দও থামিয়া যায়। সংগে সংগে কোথায় লুকানো পাখীটার কুব্‌কুব্‌ ডাক স্পষ্ট হইয়া ওঠে। বাঁশপাতা হইতে কেমন একটা গন্ধ ওঠে—কাজলের মন-কেমনকরা ভাবটা বাড়িয়া যায়। উপর-নীচে কোনদিকেই পাখীটাকে দেখা যায় না। রাণুপিসি ডাকটা চিনাইয়া দিয়া বলিয়াছিল—কুবো পাখী। কাজলের হাসি পাইয়াছিল নামটা শুনিয়া। কেমন নাম ছাখো—বলে কিনা কুবো পাখী—

খোকার মধু-ঝরা হাসি দেখিয়া রাণীর কি-একটা পুরানো কথা মনে পড়ে। এক পলকের জন্য সে অন্যমনস্ক হইয়া যায়। পর মুহূর্তেই হাসিয়া বলে—পাগল একটা, এত হাসবার হলো কি নাম শুনে?

কাজলের একবার মনে হয় ডাক বাঁদিকের ঝোপ হইতে আসিতেছে। সেদিকেই বনটা বেশী ঘন। কিছুদিন আগেও বুনোরা এই জঙ্গল হইতে কি একটা জন্তু শিকার করিয়া গিয়াছে। কাজেই একেবারেই যে গা ছমছম করে না এমন নহে। কিন্তু পাখীটাকে দেখিবার কৌতূহলও কম নহে। রাণুপিসি বলিয়াছে লাল-লাল চোখ—সে দেখিবে কেমন লাল চোখ। কিন্তু বিশেষ সুবিধা করা যায় না। কিছুটা বাঁদিকে হাঁটিলে মনে হয় ডানদিক হইতে আওয়াজটা পিছনে ঘুরিয়া যায়। খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরিয়া পরে কাজল হাল ছাড়িয়া দেয়।

ভারী তো পাখী—পরে দেখা যাইবে। আরও একটু সন্ধান করিলে কি দেখা হইত না—নিশ্চয় হইত। নেহাত কাজ আছে বলিয়াই তাহাকে অন্যত্র যাইতে হইতেছে।

সন্ধ্যায় সতুকাকার দু'একজন বন্ধুবান্ধব এপাড়া-ওপাড়া হইতে আসিয়া জোটে। মোটা কালোমত একজন লোক—গলায় কণ্ঠি, ঠুকিয়া ঠুকিয়া খোলটাকে ঠিক-সুরে বাঁধে। পরে সবাই মিলিয়া কীর্তন শুরু করে। একদিন কাজলের খুব মজা লাগিয়াছিল। গানের মাঝামাঝি—যেখানে 'কোথা যাও প্রভু নগর ছাড়িয়া' পদটা আছে সেখানে সবাই এমন হাঁ করিয়া দীর্ঘ টান দিয়াছিল যে কাজল হাসি চাপিতে পারে নাই। এতগুলি বয়স্ক মানুষকে এক সারিতে হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিলে কাহার না হাসি পায়?

কীর্তন তাহার খুব একটা ভাল লাগে নাই। গানের যে স্থানটিতে তাহার আমোদ হয়, সে স্থানটিতে উহারা উঠিয়া পরস্পরের গলা জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুবিসর্জন করিতে থাকে। ব্যাপার দেখিয়া প্রথম দিন সে অবাক হইয়া গিয়াছিল। রাণী তাহাকে খাওয়াইয়া

বিছানায় শোওয়াইয়া আসার পরেও এক একদিন অনেক রাত্রি পর্যন্ত গান হয় শুনিতে শুনিতেই সে ঘুমাইয়া পড়ে। কখনো কখনো বিনা কারণে মাঝরাত্রে ঘুম ভাঙিয়া যায়—দেখে জানালা দিয়া সুন্দর জ্যোৎস্না আসিয়া বিছানায় পড়িয়াছে। বাহিরের আতাগাছটা—ভূতো-বোম্বাই আমগাছটা—উঠানটা অপূর্ব জ্যোৎস্নায় ভাসিয়া যাইতেছে। ঘুম-ঘুম চোখে সেদিকে তাকাইয়া থাকিলে বেশ লাগে। মনে হয় ; কেহ যেন ঐ জঙ্গল হইতে উঠানের জ্যোৎস্নায় আসিয়া দাঁড়াইবে। তাহার গায়ে রূপকথার দেশের পরিচ্ছদ ; মৃদু চন্দ্রালোকে সে একবার কাজলের দিকে তাকাইয়া হাসিবে—পরে ইশারায় ডাকিয়া আনিবে সঙ্গীদের। একদল পরীর দেশের লোকে উঠান ভরিয়া যাইবে। তাহাদের ভাষা বোঝা যায় না—কিন্তু তাহা সঙ্গীতময়! উঠানের ধূলায় চাঁদের আলোয় ছায়া সৃষ্টি করিয়া তাহারা লীলায়িত ভঙ্গীতে নৃত্য করিবে। মাঝে মাঝে কাজল নিজে অবাক হইয়া যায় তাহার চিন্তায় গতি দেখিয়া।

এই সময় বাবার কথা মনে পড়ে খুব। রাণুপিসি পাশে ঘুমাইতেছে। পিসির নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাইতেছে। জানালার বাহিরে উঠানে সেই অপার্থিব চাঁদের আলোর দেশ। এ সময় বাবা থাকিলে বেশ হইত। মনের যে ভাবই হোকনা না কেন, বাবাকে বুঝাইয়া বলিবার দরকার পড়ে না—বাবা নিজেই কেমন সব বুঝিয়া লয়। বাবা হয়তো বলিতে পারিত, কেন সে এমন অদ্ভুত চিন্তা করে। শুধু এ সব কারণেই নহে—অন্য কারণও আছে। হ্যাঁ, সে লুকাইবে না—বাবাকে দেখিতে ইচ্ছা করে, বাবার জন্য তাহার মন কেমন করিতেছে।

পরের দিন দুপুরে ললিতমোহন বাড়ুজ্যের ছেলে চনু আসিয়া তাহাকে এক্কা-দোক্কা খেলিতে ডাকে। চড়কতলার মাঠে খেলা জমিয়া ওঠে। অবশ্য কাজল খেলায় খুব পটু নহে। তাহার তাকও প্রশংসার অযোগ্য। তিন নম্বর ঘর টিপ করিয়া ঘুটি ছুঁড়িলে সেটা পাঁচ নম্বর ঘরে পড়িবেই। অবশ্য প্রত্যেকবারই কাজল এমন ভান

করিয়া থাকে যেন ওটা পাঁচ নম্বর ঘরেই ফেলিবার চেষ্টা করিতেছিল। খেলা সমাপ্ত হইলে সন্ধ্যার আঁধারে বাড়ি ফিরিবার সময় কাজল চনুকে প্রশ্নটা করিয়াই ফেলে—তুই জানালার পাশে শুয়ে ঘুমোস?

চনু বাক্যালাপের গতি কোনদিকে বুঝিতে না পারিয়া সংক্ষেপে বলে—হুঁ।

—রাত্তিরে জাগিসনে কখনো? চাঁদনী রাত্তিরে?

—কত।

—কিছু দেখিস? মানে, ভাবিস কিছু?

—ভাবব আবার কি? দাদা গায়ে পা তুলে দেয় বলেই না ঘুম ভাঙে। পা-টা নামিয়ে দিয়েই আবার ঘুমিয়ে পড়ি। কেন রে?

—মনে হয় না কিছু? এই, কোন অদ্ভুত দেশের কথা, কি গল্পে পড়া কোন লোকের কথা?

গল্প বলিতে—চনু পড়িয়াছে কথামালার 'ব্যাঘ্র ও পালিত কুকুর'। তাহা চাঁদনী রাত্রে স্বপ্ন দেখিবার জন্য খুব আদর্শ উপাদান নহে। কাজলটা কি পাগল নাকি? সন্ধ্যাবেলা যত উদ্ভট কথা। না, চন্দ্রালোকিত রাত্রে অগ্রজের পদ-তাড়নায় জাগিয়া তাহার বিশেষ কিছু মনে হয় না।

কাজলও যে বিশেষ কিছু দেখিতে পায়, তাহা নহে। কিন্তু এক ফালি চাঁদের আলো—একটি পাতা খসিয়া পড়া হইতে সে অনেক কিছু কল্পনা করিয়া লইতে পারে। নিজের বৈশিষ্ট্য বুঝিবার বয়স তাহার হয় নাই—তবুও তাহার সঙ্গীদের সহিত একটা চিন্তাগত পার্থক্য সে অনুভব করিতে পারে। যেমন দুর্গা-পিসির কথা। বাবা ও রাণুপিসির কাছে গল্প শুনিয়া সে দুর্গার চেহারা ও স্বভাব কিছুটা কল্পনা করিয়া লইয়াছে, নির্জনে বসিয়া ভাবিতে চেষ্টা করিয়াছে, পিসি সামনে দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছে। এই একটা ফল কুড়াইয়া লইল কোন গাছতলা হইতে, এই আধখানা ভাঙিয়া তাহাকে দিল খাইতে। অপু ও রাণী দুর্গার শৈশবের গল্পই করিয়াছে—এখন থাকিলে পিসির যে অনেক বয়স হইত, তাহা কাজলের কখনও মনে

হয় নাই। শুধু এইটুকু সে বোঝে, পিসি বাঁচিয়া থাকিলে তাহাকে খুব ভালবাসিত।

নিশ্চিন্দিপুরের সহিত কাজলের একটা নিবিড় সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল। অথচ কোথায় ছিল সে এক বৎসর আগে! দাদামশায়ের ভয়ে জুজু হইয়া থাকিতে হইত! প্রকৃত ভালবাসার স্বাদ সে দাদামশায়ের কাছ হইতে পায় নাই কখনো—তাড়নাই—জুটিত বেশি। কেবল দিদিমার কথা মনে পড়ে। বাবা যে তাহাকে মামাবাড়ি হইতে নিজের বাড়িতে লইয়া আসিল—দিদিমা তাহা দেখিতে পাইল না। দিদিমাই যা-একটু বাবার গল্প করিত। আর কাহারও জন্য মন খারাপ করে না তত। এখানে সে ভালই আছে। বাবা নাই বটে—কিন্তু বাবা তো আসিবে। পিসি তাহাকে ভালবাসে। সবার উপর তাহাকে আকর্ষণ করে গ্রামের একটা নীরব ভাষা। কেহ সঙ্গে থাকিলে অনেক সময় ভাল লাগে না। মাঝে মাঝে যখন সে নিজেদের পুরাতন ভিটায় যায়—অন্ততঃ তখন তো নয়ই। সম্পত্তির স্বত্ববোধ তাহার মধ্যে এখনও জন্মে নাই কিন্তু নিজের পিতৃপুরুষের ভিটায় বসিয়া চিন্তা করার মধ্যে যে একটা রোমাঞ্চকর অনুভূতি আছে—তাহা মনকে দোলা দেয়। দুপুরে গিয়া জঙ্গল ঠেলিয়া চুপিচুপি সে উঠানে বসিয়া থাকে। চুপি চুপি বসিবার বিশেষ কারণ আছে। এদিকে বিশেষ লোকজন আসে না—আসিবেই বা কি প্রয়োজনে? একমাত্র আকর্ষণ—সজিনাগাছটাও বুড়া হইয়া গিয়াছে, ফল ভাল হয় না তত। কাজেই সে জন্য সতর্ক হইবার প্রয়োজন নাই। আসলে এই জায়গায় উদ্দামতা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করে না একেবারে। অন্য জায়গা হইলে কাজল বটের ঝুরি ধরিয়া ঝুলিয়া, এখানে ওখানে লাফাইয়া এক তাণ্ডব বাধাইয়া তুলিত। কিন্তু এ ভিটায় আসিয়া বসিলে কে যেন তাহার ছোট্ট মনটাকে শান্ত করস্পর্শে স্নিগ্ধ করিয়া দেয়। এখানে তাহার ঠাকুমা রান্না করিয়াছে—পিসি পুতুল খেলিয়াছে—বাবা রাজা সাজিয়াছে আরসির সামনে—ঠাকুরদা বসিয়া বালিকাগজে পালা লিখিয়াছে। তাহাদের

পুণ্যস্মৃতিমণ্ডিত স্থানে কি প্রগল্‌ভ হওয়া যায়! কেহ তাহাকে বলিয়া দেয় নাই। সে আপনি চুপ হইয়া থাকে।

দুপুর গড়াইয়া বিকাল হইয়া যায়। কেমন একটা অদ্ভুত ছায়া নামিয়া আসিতে থাকে কাজলের মনে হয়, এই বুঝি কেহ পিছন হইতে কথা বলিয়া উঠিবে। যেন সে আমলটা শেষ হইয়া যায় নাই। সে মিথ্যা বলিবে না—ভূতপেত্নীতে তাহার একটু ভয় আছে। কিন্তু এই সময় যদি তাহার ঠাকুমা কি পিসি আসিয়া তাহার সহিত কথা বলে তবে সে একটুও ভয় পাইবে না। সে তো তাহাদের একান্ত আপনার; কাহারও—নাতি কাহারও ভাইপো। কত আদর করিত সবাই বাঁচিয়া থাকিলে। একটু আগের রাঙা বাসন্তী রোদটার মতই তাহারা কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে।

সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরিবার সময় গাছের মাথায় সপ্তর্ষিমণ্ডল জ্বল জ্বল করিতে থাকে। বাবা তাহাকে চিনাইয়া দিয়াছিল সব। কালপুরুষ ঝুঁকিয়া থাকে পশ্চিম দিগন্তের কাছাকাছি। বাবা একবার বলিয়াছিল কালপুরুষের ছোরাটা যে তিনটি নক্ষত্র দিয়া তৈয়ারী—তাহার মধ্যে একটা নক্ষত্র বলিয়া মনে হইলেও আসলে নীহারিকা। সে একটা দুরবীন পাইলে দেখিবার চেষ্টা করিত। যাহা হউক, আপাততঃ আমবাগানটা তাড়াতাড়ি পার হইয়া যাওয়া ভাল। সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে।

বাড়ি ঢুকিলে রাণী বলে—এতক্ষণ ছিলি কোথায়, হাঁরে—ও খোকন? এই রাতবিরেতে কি বাইরে বেড়াতে আছে বাবা? কোথায় ছিলি?

কাজল আরক্ত মুখে আমতা আমতা করিয়া বলে—এই একটু ঐ পুরানো ভিটেয়—

রাণী আর প্রশ্ন করে না। তাহার হঠাৎ সমস্ত ব্যাপারটা কেমন সুন্দর লাগিতে থাকে। খোকন চিনিয়া লইয়াছে আপনার সঠিক স্থান। রক্তের ভিতরকার অমোঘ আকর্ষণ তাহাকে টানিয়া লইয়া গিয়াছে পবিত্র তীর্থে। ঐতিহ্যের ধারায় গতি ধীর—কিন্তু

অনিবার্য। এ ভিটাকে ফেলিয়া তাহারা কেহ কোথাও থাকিতে পারে নাই। অপু গিয়াছিল চলিয়া—সে-ও কি বেশীদিন পারিল দূরে থাকিতে? বংশের সন্তানের হাত ধরিয়া আবার তো সেই ফিরিয়া আসিতে হইল। কি যে টান রহিয়া যায়, তাহা রাণী ব্যাখ্যা করিতে পারে না। হয়তো এতদিনে মণিকর্ণিকার ঘাট হইতে হরিহরের দেহাবশেষ বাতাসে ভাসিয়া অন্ধসংস্কারে ফিরিয়া আসিয়াছে নিশ্চিন্দিপুরে। সর্বজয়ার অদৃশ্য উপস্থিতি হয়তো এখনও ভিটার অণুতে অণুতে। গোবৎস যেমন জন্মগ্রহণ করিয়াই ঠিক মাতৃস্তন্য খুঁজিয়া লয়—তাহাকে চিনাইয়া দিতে হয় না, কাজলও তেমনি কোন নির্দেশ দিতে হয় নাই। সমস্ত বিশ্বজগৎটা একটা নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িয়া গিয়াছে। কাহাকেও কিছু বলিতে হয় না—করাইয়া দিতে হয় না। সব ঠিক ঠিক চলে।

মাস দুই পরের কথা। গরম বেশ পড়িয়াছে। আজ আহার করিতে একটু বেলা হইয়াছিল। রাণী এখনও কাজলকে বাহির হইতে দেয় নাই, বিশ্রামের জন্য নিজের কাছে শোয়াইয়া রাখিয়াছে। কাজল কাত হইয়া শুইয়া পা দুইটা পিসির গায়ে তুলিয়া দিয়া গল্প শুনিতেছিল। এমন সময় বাহির হইতে কে ডাকিল—শ্রীমান অমিতাভ রায়, চিঠি আছে। কাজল প্রথমটা বিশ্বাস করে নাই—নিশ্চয়ই—ভুল শুনিয়াছে। তাহাকে চিঠি লিখিবে কে!

দৌড়াইয়া চিঠিটা নিতে গেল সে। বেশ মোটা কাগজে রঙীন খামের চিঠি। রাণীও উঠিয়া আসিয়াছিল কাগজের পিছু পিছু। সে বলিল—খোল্ তো খোকন, কার চিঠি—। রাণীর বুক ঢিব ঢিব করিতেছিল। হয়তো তাহারই চিঠি—কতদিন আর ভুলিয়া থাকিতে পারে? কাজল খাম খুলিয়া চিঠিটা বাহির করিয়া প্রথমে যেন চোখে ধোঁয়া দেখিল। কিছু বুঝিতে পারিল না প্রথমটা। খুব চেনা, খুব পরিচিত হস্তাক্ষর, এ নিশ্চয়ই—। পরক্ষণেই রাণীর হৃৎস্পন্দনকে দ্রুতায়িত করিয়া মুখ তুলিয়া সে বলিল—বাবা দিয়েচে বাবার চিঠি পিসি। এই ছাখো বাবার হাতের লেখা।

উত্তেজনায় সে হাঁপাইতেছিল।

অপু রাণীকে লিখিয়াছে—

'ফিজি থেকে আফ্রিকায় এসেছি। কখন কোথায় ঘুরছি কিছু ঠিক নেই। ফিজিতে একটা মিশনারী স্কুলে মাস্টারী করলাম কিছুদিন। এ্যাশবার্টন সাহেবই সব ঠিক করে দিয়েছিল। জীবনটাকে যেমন করে দেখতে চেয়েছিলাম—ঠিক তেমনি করেই দেখছি রাণুদি। কোথাও ধাক্কা পেলাম না। আশ্চর্য একটা অসীমত্বের সন্ধান পেয়ে গেছি। মনে হয় যেন সময় অফুরন্ত—তা ফুরিয়ে যাবে না কোনদিন? জীবনও তাই বাঁধনহারা, অসীম। মহাকাল এত বিশাল—তার আঁচলটুকুই এত বড় যে সেই বিশালতাকে অনুভব করা বহু দূরের কথা, ধারণাটাকে কল্পনায় আনতেই মানুষের যুগযুগান্ত কেটে যাবে। এই জীবনকে—ত্রিকালকে বুকের পাঁজরে পাঁজরে ব্যথায়-বেদনায়, আনন্দে-উল্লাসে, স্বপ্নে-জাগরণে প্রতিক্ষণে অনুভব করছি। আমার আর ভয় কি রাণুদি? এখন মনে হচ্ছে, ভক্তিভাবটা শুধু মেয়েদেরই একচেটে নয়—আমার মনেও একটা ভক্তির ভাব জেগে উঠছে। এ কিন্তু ঠিক ঈশ্বরে ভক্তি নয়। বর্তমানের ক্ষুদ্র গণ্ডী পেরিয়ে অতীত ও ভবিষ্যতে রহস্যের প্রদোষালোকে আলোকিত পরিসরে বিস্তৃত যে মহাজীবন—তার প্রতি ভক্তি। এ যেন কিছুটা নিজেরই প্রতি ভক্তি। নিজেকে, বিশেষ করে নিজের জীবনকে জানবার অদম্য স্পৃহায় ঘুরে বেড়াচ্চি। এখন মনে হচ্ছে যেন তা ছাড়িয়ে আরও বেশী কিছু জেনে ফেলেচি। কিন্তু সে কথা প্রকাশ করা যায় না রাণুদি—সে বোধ ভাষার অতীত। সে সকল জানার জানা—এক অনির্বচনীয় পরম-পাওয়া।'

কাজলকে লিখিয়াছে—

'তোমার জন্যই হয়তো আমাকে ফিরে আসতে হবে। কতদিন ফিজিতে সমুদ্রের তীরে বসে আশ্চর্য সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে তোমার কথা ভেবেছি। তুমি আমার প্রাণের অংশ দিয়ে তৈরী স্বপ্ন, বাবা। চেষ্টা করছি তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে। তুমি পিসির কথা শুনে চলো

তো? বেশি রাতে বেরুবে না। নদীর ধারে বেশি যেও না। আমার বাক্সে যে ফার্স্ট বুকটা আছে—সেটা মনোযোগ দিয়ে পড়বে। এখানে অনেক মজার মজার জিনিস দেখছি—ফিরে তোমাকে গল্প বলবো। তোমাকে বড় দেখতে ইচ্ছে করে। আমার জন্য তোমার মন খারাপ হয় না?'

বাবার জন্য তাহার মন খারাপ হয় কি না! এমন দিন কবে গিয়াছে যে সকাল হইতে রাত্রির মধ্যে বাবার কথা ভাবে নাই? বরং বাবাই তো তাহাকে ফেলিয়া বেশ থাকিতে পারিতেছে। বাবা ফিরিয়া আসিলে সে বাঁচে।

দুপুরে অপুর রাখিয়া-যাওয়া সুটকেশ হইতে ডায়েরীখানা বাহির করিয়া সে পড়িতে বসে। ইহা সে মধ্যে মধ্যেই পড়িয়া থাকে। এক বৎসরের ঠাসবুনোট লেখায় ভর্তি ডায়েরী। পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে এক জায়গায় তাহার দৃষ্টি আটকাইয়া গেল। কাশীর কথা লেখা আছে কয়েক পাতা। বাবা তাহাকে রাখিয়া একবার কাশী গিয়াছিল বটে। কাজল পড়িয়া ফেলে পাতা কয়টা। এ কাহার কথা লেখা! লীলা কে? তাহার মেয়ের সহিত বাবা তাহার বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে যে। বিবাহ! এ তো বড় মজার কথা হইল। কলিকাতায় থাকিতে গলির ওপারে একটা বাড়িতে সে বিবাহের উৎসব দেখিয়াছিল। বর মোটরগাড়ি করিয়া মালা-চন্দন পরিয়া আসে। পরে গাড়ী হইতে নামিলে একজন মেয়ে কুলোর ওপর কি-সব সাজাইয়া তাহাকে বরণ করে ও অন্যান্যরা জোরে হাতপাখা নাড়িয়া বাতাস করিতে থাকে। ওপাড়ার চনুর দিদিরও তো বিবাহের কথা চলিতেছে। চনু বলিতেছিল, দিদি কালো বলিয়া নাকি পাত্রপক্ষ এক হাজার টাকা পণ চাহিয়াছে। বেশ মজা তো! বিবাহ করিলে সেও টাকা পাইবে তাহা হইলে। কিন্তু বাবা তো লিখিতেছে লীলার (এ কে?) মেয়ে ফর্সা। ফর্সা মেয়েকে বিবাহ করলে টাকা দিবে তো? টাকা পাইলে সে সব টাকা বাবাকে দিয়া দিবে। আচ্ছা, কত বৎসর বয়স হইলে বিবাহ হইয়া থাকে?
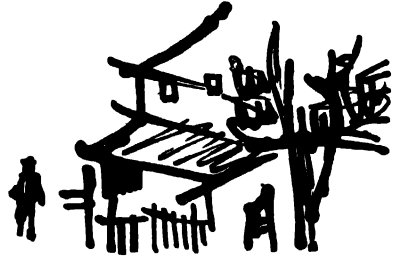
অপুর সঙ্গে কাজল দুই

সেদিন সকাল হইতে মেঘ করিয়াছিল—কিন্তু বৃষ্টি হয় নাই। সুন্দর একটা ছায়াঘন আমেজে গ্রামটা ঝিমাইতেছিল। পাখীর ডাক শোনা যাইতেছিল কম। কেবল বহু উঁচুতে প্রায় মেঘের গায়ে কয়েকটা চিল উড়িতেছিল। কাদেব মিঞার ক্ষেতের পাশে কাজল একবার থামিল। কাদেব তাহাব শালার সহিত পিড়ান দিতেছে ক্ষেত। কাজলকে দেখিয়া কাদেরেব শালা বলিল—বাড়ি চলে যাও কর্তাবাবা—বিষ্টি হতে পারে। কাদেব আপত্তি করিয়া বলিল—পানি হবে না মোটে—দেখছো না চিল উড়ছে ওপরে। ডানায় পানি পলি নামি আসত নীচপানে। আবহাওয়া-তত্ত্ব সম্বন্ধে তাহাদের আলাপ করিতে দিয়া কাজল হাঁটিতে লাগিল মেঠোপথ ধরিয়া। ঐ পথটা গিয়াছে আষাঢ়ু—এই পথটা ঘুরিয়া গিয়াছে নদীর দিকে। একটা বড় গাছ রহিয়াছে দুইটা পথের সঙ্গমস্থলে। জায়গাটা কাজলের বড় ভাল লাগে। গ্রামের যাবতীয় লোক এই পথ দিয়া আষাঢ়ুর হাটে গিয়া থাকে। অচেনা লোকও যায় কত। ভিন-গাঁ হইতে মালপত্র কাঁধে করিয়া আলের পথ মাঠের পথ ধরিয়া এখানে আসে। এখান হইতে কাঁচা পথ ধরিয়া চলিয়া যায় হাটে। পণ্যাদি কাঁধে হাটমুখী জনস্রোত দেখিতে কাজলের বেশ লাগে।

খানিকক্ষণ সেখানে বসিয়া কাজল একবার নদীর পথে কিছুদূর হাঁটিয়া আসিল। ফিরিয়া আসিতে আসিতে দেখিল একজন লোক আষাঢ়ুর পথ হইতে নামিয়া গ্রামের দিকে চলিয়া গেল। বুকটা

তাহার একবার কেমন করিয়া উঠিল। দৌড়াইয়া আগাইয়া গেল সে—এইবার লোকটার পিছনে আসিয়া পড়িয়াছে। বহুদিনের অনভ্যাসের ফলে শব্দটা যেন জিভ দিয়া আর বাহির হইতেছে না। মাথার মধ্যে কেমন করিতেছে। পথের পাশে জঙ্গল হইতে বাতাস অজস্র বন্যপুষ্পের গন্ধ বহিয়া আনিতেছে। একটা ধাক্কা দিয়া কাজল শব্দটা বাহির করিল—বাবা!

অপু বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় ফিরিয়া তাকাইল। এই ডাকটার জন্য সে ছুটিয়া আসিতেছে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে। সমুদ্রের ফেনোচ্ছল উর্মিমালা, বিষুবমণ্ডলীর দেশের তারকাখচিত তমিস্র রাত্রির আকর্ষণ, উষ্ণ বালুকায় শুইয়া উপরে নারিকেল-পাতায় বাতাসের মর্মরধ্বনি শুনিবার অদ্ভুত অনুভূতি—সব সে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে এই ডাকটা শুনিবার লোভেই তো। সে থাকিতে পারে নাই।

অপুর হাত হইতে ব্যাগ আর বাক্স পড়িয়া গেল ধূলায়। পথের মধ্যে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া সে দুই হাত সামনে বাড়াইয়া দিয়া চোখ বুজিল। পরক্ষণেই কাজল ঝাঁপাইয়া পড়িল অপুর বাহুবন্ধনে।

চিলগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া নামিয়া আসিতেছিল নীচে। এইবার বৃষ্টি নামিবে।

সন্ধ্যায় রাণীর রান্নাঘরের দরজায় পিঁড়ি পাতিয়া বসিয়া অপু মনের আনন্দে গল্প করিতেছিল।

—আর পারলাম থাকতে রাণুদি। সে কি টান, তা যদি একবার বুঝতে। যা দেখি যা করি, সবই যেন কেমন ফাঁকা আর অর্থহীন লাগে। সেই বাড়িতে এনে তবে ছাড়ল।

রাণী হাসিয়া বলে—আর আমরা বুঝি কেউ নই?

—কে বলেছে একথা রাণুদি? তোমরা সবাই মিলে আমার জীবন সার্থক করে তুলেছ। কোথায় যেত আজ কাজল—তুমি না থাকলে? তোমার দান কি ভোলবার? মায়ের স্নেহ দিয়ে আমাদের দুজনকেই ঘিরে রেখেচ তুমি।

রাণীর গলার কাছে হঠাৎ একটা কি কুণ্ডলী পাকাইয়া ওঠে! এত সুখের দিনও ভগবান তাহার কপালে লিখিয়াছিলেন! পরে সামলাইয়া বলে—এই নে, এ দুটো পরোটা আগে খা, তারপর গরম গরম ভেজে দিচ্ছি—

রাত্রে ছেলেকে লইয়া শোয় অপু। অনেক রাত্রি পর্যন্ত কাহারও ঘুম আসে না। বৈকালে একবার খুব ঝড় হইয়া বৃষ্টি নামিয়াছিল। তাই গরম নাই তত। জানালার পাশে শুইয়া আকাশে নক্ষত্রগুলি দেখা যায় স্পষ্ট। মধ্যপ্রদেশ হইতে ফিরিয়া একই নক্ষত্র কলিকাতার আকাশে দেখিয়া তাহার কেমন অবাক লাগিয়াছিল। আবার ফিজি ঘুরিয়া আসিয়া এই নক্ষত্রগুলিকে কেমন চেনা-চেনা অথচ অনেক দূরের বলিয়া মনে হইতেছে। বিদেশে ইহারাই ছিল তাহার সঙ্গী—এই নক্ষত্র, মুক্ত উদার আকাশ প্রান্তরের বুকেব উপর দিয়া বহিয়া-যাওয়া ভবঘুরে বাতাস। সেও সুন্দর-জীবন—সে যে জীবন চাহিয়াছিল, সেই জীবন। কিন্তু এখন কাজলের পাশে শুইয়া তাহার উদ্দাম জীবনের গতিবেগ কিছুটা প্রশমিত করিতে ইচ্ছা করিল। কোথায় ফেলিয়া যাইবে একে? একবার গিয়া তো মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছে নাড়ির টান। শৈশবে বাবা অনেকদিন বাড়ি না আসিলে তাহার রাগ হইত—অভিমান হইত। বাড়ি ফিরিয়া অনেক চেষ্টা করিয়া হরিহরকে অপুর রাগ ভাঙাইতে হইত। এখন বড় মমতা হয় হরিহরের প্রতি! বাবা কি আর ইচ্ছা করিয়া আসিত না। সংসার চালাইবার দুরূহ প্রয়াসে বাবাকে কোথায় না ঘুরিতে হইয়াছে—কি না করিতে হইয়াছে। বেচারী বাবা—তাহারও কত ইচ্ছা করিত অপুকে দেখিতে; আসিতে পারিত না শুধু কাজের চাপে! বই-খাতা বগলে তালি-মারা ছাতা হাতে স্থান হইতে স্থানান্তরে বেড়াইত কাজের সন্ধানে। আজ অপু লেখক হইয়াছে—বই বাজারে কাটিতেছে মন্দ নয়, তাহার চাইতে বেশি মিলিতেছে প্রশংসা। কত বৎসর পরে তাহাদের বাড়ির লোক আজ সচ্ছলতার মুখ দেখিতেছে। কিন্তু বাবাকে

দেখানো গেল না এই সব দিন—বাবা বাঁচিয়া থাকিলে বৃদ্ধ হইয়া যাইত, তাহাকে অপু শিশুর মত পরিচর্যা করিত। থাক— কাজলের মধ্য দিয়া সে তাহার শৈশবে হারাইয়া-যাওয়া পিতাকে খুঁজিয়া পাইয়াছে। তাহাকে মনের মত করিয়া মানুষ করিতে হইবে—ঠিক যেমন করিয়া সে চায়, তেমনি করিয়া। ভাবিয়াছিল, গ্রামে না রাখিয়া কাজলের প্রতি সে অন্যায় করিতেছে। গ্রামে হয়তো কাজলের শিশুমন পূর্ণভাবে বিকশিত হইয়া উঠিবার সুযোগ পাইবে। তাই ছেলেকে কলিকাতার অসুন্দর পরিবেশ হইতে আনিয়া একেবারে প্রকৃতির মধ্যে ছাড়িয়া দিয়াছিল। এখন ভাবিল, এইভাবে রাখিলে উহার পড়াশুনা কিছুই হইবে না। বরং কোন-একটা ছোট শহরে লইয়া যাই। মাঝে মাঝে গ্রামে লইয়া আসিবে— মাঝে মাঝে বেড়াইতে লইয়া যাইবে দূরে। তাহাতে উহার চোখ ভার্ল করিয়া ফুটিবে। সব দিক দিয়াই ছেলেকে চৌকস করিয়া তোলা প্রয়োজন।

একটু পরে বারান্দায় বসিয়া সরবতে প্রথম চুমুক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ছেলেবেলাটা ফিরিয়া আসিল। অপু চোখ বুঁজিয়া আমপোড়ার সোদা গন্ধ উপভোগ করিতেছিল। এই গন্ধটা কেমন পুরাতন দিনগুলোকে মনে পড়াইয়া দেয়। সেই দাওয়ায় চাটাই পাতিয়া বসিয়া তালের বড়া খাওয়া সেই মাটির দোয়াত হাতে প্রসন্ন গুরুমশায়ের কাছে পড়িতে যাওয়া। কত কথা মনে পড়ে। রাত্রে প্রদীপের আলোয় বসিয়া পড়িতে পড়িতে কানে আসিত মায়ের খুন্তি নাড়িবার শব্দ। বিদেশ হইতে বাবা আসিলে অপুর অত্যন্ত আনন্দ হইত। রাত্রে বিছানা শুইয়া অনেক রাত্রি পর্যন্ত শুনিত, বারান্দায় বসিয়া বাবা গান করিতেছে।

আর একজনের কথা মনে পড়ে।

বাংলা দেশ হইতে বহুদূরে তারকাখচিত আকাশের নিচে সমুদ্রবেলায় শুইয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ একসময় তাহার তন্দ্রার ঘোরে মনে হইয়াছে, সে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে বদলায় নাই।

তাহার বয়স বাড়ে নাই। তাহার চোখের দৃষ্টির পরিবর্তন হয় নাই। তাহার আঁচলে বাঁধা নাটাফলগুলির সংখ্যা একটিও কমে নাই। সে অপুর সামনে দাঁড়াইয়া হাসিয়াছে।

তন্দ্রা ছুটিয়া গেলে অপু অবাক হইয়া আকাশের দিকে চাহিত। সমস্ত দুঃখের দিনে উদার আকাশ তাহাকে শান্ত করিয়াছে। দেখিত, বাংলার আকাশের সহিত বিদেশের আকাশের কোন প্রভেদ নাই। দেখিত, তাহার দিদির দৃষ্টি যেন ক্রমশঃ আনীহারিকা-সৌরচরাচরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে এইমাত্র এইখানে ছিল—তাহার ঘুম ভাঙিতে দেখিয়া দূরে সরিয়া গিয়াছে।

বেড়াতে যাবে না বাবা?

ছেলেকে কাছে টানিয়া লইয়া অপু বলিল—চলো বাবা, যাই।

পথে বাহির হইয়া বলিল, আমরা যদি এখান থেকে চলে গিয়ে অন্য জায়গায় থাকি, তবে তোর মন খারাপ হবে—না রে?

কাজল প্রথমে অবাক হইয়া গেল। চলিয়া যাইবার কথা উঠিতেছে কেন? অবশ্য বাবা যেখানে আছে, এমন জায়গায় থাকিতে তাহার খারাপ লাগিবে না, কিন্তু পিসিকে ছাড়িয়া থাকা বড়ো কষ্টের।

—কোথায় যাবো বাবা?

কোথায় যাওয়া হইবে তাহা অপুও কিছু ভাবে নাই। গ্রাম ছাড়িয়া বেশিদূর যাওয়া হইবে না, আবার কলিকাতাও কাছে হইবে—এমন স্থানের সন্ধান সে মনে মনে করিতেছিল। ছেলের প্রশ্নের জবাবে সংক্ষেপে বলিল—আমিও তাই ভাবছি রে।

গ্রাম ছাড়িয়া বেশীদূর যাওয়া ঘটিবে না—সে যাইতে পারিবে না। বারবার তাহাকে ভিক্ষুকের মতো ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে নিশ্চিন্দি-পুরে। এ গ্রামের প্রকৃতি তাহার কাছে জীবনধারণের জন্য বাতাসের মতো প্রয়োজনীয়। তবুও ছেলের কল্যাণের জন্য যাইতেই হইবে বাহিরে। ভাল স্কুলে না পড়িলে কাজলের চোখ ফুটিবে না। দেওয়ানপুর স্কুলের মিঃ দত্ত-র কাছে সে নিজে ঋণী। বৃহত্তর জীবনে

প্রবেশের মুখে তিনি তাহাকে প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। কাজলকে সে নিজে তৈয়ারী করিয়া দিবে।

অনেক ভাবিয়া অপু মালতীনগরে যাওয়া স্থির করিয়াছিল। মালতীনগর জায়গাটা এখনও পুরা শহর হইয়া উঠিতে পারে নাই, তবে শহরের সুবিধা মোটামুটি প্রায় সমস্ত পাওয়া যায়। অনেক বাড়ি-ঘর, মানুষ-জন ও হাট-বাজারের মধ্যে গ্রাম হইতে শহরের স্পর্শই বেশী। নিশ্চিন্দিপুর হইতে অবশ্য খুব কাছে হইল না। কিন্তু কি আর করা যায়। সব সুবিধা দেখিতে গেলে চলে না। কিছুদিন আগে অপু মালতীনগর স্কুলে গিয়া হেডমাস্টার মহাশয়ের সঙ্গে কথা বলিয়া আসিয়াছিল। সেখানকার ব্যবস্থা তাহার পছন্দ হইয়াছে। ভর্তি করাইবার যাবতীয় ব্যবস্থা করিয়া ফিরিতে ফিরিতে হঠাৎ একটা কথা ভাবিয়া তাহার খুব অবাক লাগিল। সে আজ ছেলেকে ভর্তি করাইবার জন্য ঘুরিতেছে, ছেলেব ভবিষ্যতের কথা ভাবিতেছে। আশ্চর্য, এই কিছুদিন আগে তাহার কথাই তাহার মা-বাবা চিন্তা করিয়াছে। সত্যই সে অনেক বড় হইয়া গিয়াছে। অথচ সন্তানের পিতার যতটা গম্ভীর ও রাশভারী হওয়া উচিত, তাহা সে বিস্তর চেষ্টা করিয়াও হইতে পারিতেছে না। রাশভারী মুখ করিবার চেষ্টা করিল, হইল না। খানিক পরে নিজেরই হাসি পাইল। আসলে সে বৃদ্ধ হয় নাই, তাহার পক্ষে বৃদ্ধ হওয়া সম্ভব নহে।

বিদায় লইবার পালা বেশ কয়েকদিন ধরিয়া চলিল। রাণী ভালমন্দ রান্না করিতে লাগিল, পাড়ার মানুষ এবং গল্পপিপাসুরা দল বাঁধিয়া আসিয়া বিদায় লইয়া গেল। কড়ার রহিল, অপুকে প্রায়ই আসিতে হইবে। কাজল সকাল বিকালে একবার করিয়া বন্ধুদের নিকট হইতে বিদায় লইতে লাগিল।

সময়কে যাইতে দিব না বলিলে সময় অধিকতর তাড়াতাড়ি চলিয়া যায়। ক্রমশঃ যাইবার দিন আসিয়া গেল। অপু মালতীনগরে একখানি বাসা ভাড়া করিয়াছে। সামান্য কিছু প্রয়োজনীয় আসবাব কিনিয়া সেখানে রাখা আছে। একসঙ্গে সমস্ত কেনা গেল না।

দৈনন্দিন কাজে প্রয়োজন দেখা দিলে ক্রমশঃ কেনা হইবে। বহুকাল বাদে অপু সংসার পাতিতেছে—একা। কি কি জিনিস লাগিবে, তাহা রাণীর সহিত পরামর্শ করিয়া কেনা হইয়াছে। অপুর একার উপর ভার থাকিলে হয়তো নূতন বাড়ি গিয়া প্রথম দিন উপবাস করিতে হইত।

যাইবার গোলমাল, বাক্স গোছানো, নানাবিধ উপদেশ এবং উত্তেজনায় কাজল কিছুটা দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছিল, নতুবা রওনা হইবার সময় সে নিশ্চয় একবার কাঁদিয়া ফেলিত। পরে তাহার মনে হইয়াছিল—পিসি অত কাঁদলে আর আমি দিব্যি চলে এলাম। পিসি হয়তো ভাবলে ছেড়ে আসতে আমার মন খারাপ হয়নি।

মন খারাপ তাহার অবশ্যই হইয়াছে, কিন্তু সেই গোলমালে তাহার কান্না আসে নাই।

অপুর মনটা কেমন ঝিমাইয়া পড়িয়াছিল। রাণীর কাছে কাজলকে রাখিয়া তাহার যে সহজ নিশ্চিন্ততা ছিল, তাহা সে ফিরিয়া পাইতেছিল না। অনেক প্রতিজ্ঞা, অনেক পত্র লিখিবার প্রতিশ্রুতি, অনেক চোখের জলের মধ্য দিয়া তাহারা মাঝেরপাড়া স্টেশনে পৌঁছিয়া গেল।

ট্রেনে উঠিয়া কাজল বলিল—একটা কথা বলব বাবা?

—কি?

—আমরা মালতীনগরে যাচ্ছি, না?

—হ্যাঁ।

—সেখানে থাকতে কেমন লাগবে বাবা?

কঠিন প্রশ্ন। অপু জানালা দিয়া বাহিরে তাকাইয়া রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তর দেখিতে দেখিতে উত্তর খুঁজিতে লাগিল।
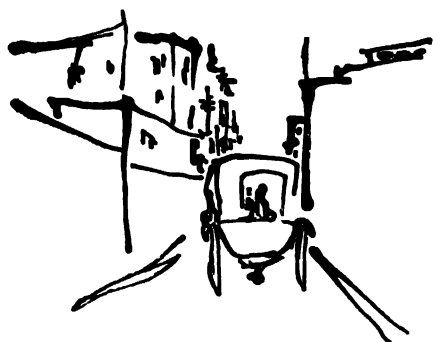
মালতীনগরে কাজল তিন

মালতীনগর জায়গাটা কাজলের খুব খারাপ লাগিল না। ঘনবসতি সে ভালবাসে না, মালতীনগরে তাহা নাই। বাবা যে বাসা ভাড়া লইয়াছে সেটা শহরের অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জায়গায়। জানালায় দাঁড়াইলে অনেক দূর দেখা যায়, দৃষ্টির কোন প্রতিবন্ধক নাই। একটা জানালা আর মুক্ত আদর্শ কাজলের অত্যন্ত প্রয়োজন। দুপুরের আকাশে চিল ওড়া দেখিয়া সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দিতে পারে। তাই জানালা একটা অবশ্যই দরকার প্রান্তরের দিকে। সে যে শুধু চিল দেখিবার জন্যই দাঁড়াইয়া থাকে এমন নহে। আসলে চিলগুলো উঠিতে উঠিতে যখন বিন্দুবৎ হইয়া আসে তখন কাজলের মনটা হঠাৎ বিপুল একটা প্রসারলাভ করে। মনে মনে রোজ ভাবে—বাব্বাঃ,—কোথায় উঠে গিয়েছে চিলগুলো, এই এতটুকু দেখাচ্ছে একেবারে! আচ্ছা, ওখান থেকে না-জানি পৃথিবীটা কেমন দেখায়। সুদূরের কল্পনা তাহার শিশুমনে স্বপ্নের রঙ বুলাইয়া দেয়। আরও কি-একটা মনের মধ্যে হয়, সেটা সে ঠিক বুঝাইয়া উঠিতে পারে না, সেটা বুঝাইবার উপযুক্ত ভাষা তার আয়ত্তে নাই। দূরের কথা ভাবিলে দুপুরের জানালায় বসিয়া মেঘস্পর্শী পাখী দেখিলে তাহার বুকের গভীরে কি-একটা কথা গুমরাইয়া উঠে, সে তাহা ভাষায় অনুবাদ করিতে পারে না।

একদিন অপু বাহির হইতে আসিয়া কাজলকে জানালায় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—কি রে, কি দেখছিস হাঁ করে?

কি দেখিতেছিল তাহা সে বাবাকে মোটেই বুঝাইয়া উঠিতে পারে নাই, প্রকাশের চেষ্টায় তাহার মুখ লাল হইয়া গিয়াছিল। চিলগুলি নহে, অগ্নিবর্ষী আকাশটা নহে, মাঠ-প্রান্তর নহে, মেঘ নহে, অথচ এই সবগুলি মিলিয়া যে গভীর ঐকতান সাধারণ মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার বাহিরে সর্বদাই বাজিতেছে, তাহা সে কেমন করিয়া শুনিয়া ফেলিয়াছে। অপু একেবারে অবাক হইয়া গিয়াছিল। তাহার নিজের শৈশবের চিন্তা হুবহু কাজলের মনে প্রতিফলিত হইয়াছে—হুবহু। ছোটবেলায় সে-ও রোয়াকে বসিয়া গ্রীষ্মের দুপুরে অবাক হইয়া আকাশ দেখিত। প্রকৃতির আশ্চর্য নিয়মগুলির কাছে শ্রদ্ধায় তাহার মাথা নত হইয়া আসে। মানুষের মতামত, ইতিহাসের গতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া প্রকৃতি কঠোর হাতে পৃথিবী শাসন করিতেছে। প্রকৃতি স্পষ্ট, জড়তাশূন্য অথচ রহস্যময়। প্রকৃতির রহস্যময়তার প্রতি আকর্ষণ কাজলের রক্তেও সঞ্চারিত। আর মুক্তি নাই—সে মুক্তি পায় নাই, কাজলও পাইবে না।

রান্নাবান্না কোন রকমে হইতেছিল। সৌভাগ্যের কথা এই যে কাজলের মুখে অপুর রান্না মোটামুটি খারাপ লাগে না।

কিন্তু এইভাবে বেশীদিন চলিবে না, তাহা অপু বুঝিতে পারিয়া একটি বুড়ীকে রান্নার জন্য ধরিয়া আনিল। খুব বুড়ী নয়, দুইজনের রান্নার কাজ চালাইয়া লইতে পারে। বুড়ীরও কোথাও আশ্রয় মিলিতেছিল না, বলিবামাত্র পোঁটলা হাতে করিয়া আসিয়া পড়িল। তাহার ব্যস্ততা দেখিয়া অপু মনে মনে ভাবিল—আহা, বুড়ী মানুষ, কোথাও কেউ নাই। একে তাড়াব না, রেখে দেব যতদিন থাকে। মুখে বলিল—তোমাকে কি বলে ডাকব বলো দেখি? তোমার ছেলের নাম তো গোপাল? তাহলে গোপালের মা বলে ডাকব, কেমন?

মালতীনগরে আসিবার পরদিন অপু কাজলকেই লইয়া বেড়াইতে বাহির হইল। যে পথটা বাজারের মধ্য দিয়া গিয়া রেললাইন পার

হইয়াছে, সে পথ ধরিয়া দু'জনে কিছুক্ষণ হাঁটিল। বাজার ছাড়াইবার পর বাঁদিকে একটি দোকান হইতে অপু একটা সিগারেট কিনিল। লুঙি-পরা একজন মানুষ হাত-পা নাড়িয়া বলিতেছে—বেরিয়েছে কি এখন। এসেই দুপুরের আগে একবার জাবনা খেয়ে বেরিয়েছে। তা কোথাও খুঁজে পাচ্চি নে, কি করি বলো দেখি হরিধন? দুধেল গাই—কোথাও বেঁধে রেখে দুধ-টুধ দুয়ে নিচ্চে না তো?

হরিধন, দোকানের মালিক, অপুকে পয়সা ফেরত দিতে দিতে বলিল—খুঁজে দেখ পাবে'খন। এখনও তো সন্ধ্যে লাগে নি। তুমি বড় বেশী ভাবো কামাল!

কামাল একটা বিড়ি ধরাইয়া বসিল।

বাজার ছাড়াইয়া কাজল বলিল—বাবা, শোনো।

—কি রে।

—আমায় আর একবার কোলকাতায় নিয়ে যাবে?

—কেন রে? শহর বুঝি খুব ভাল লাগে। বায়োস্কোপ দেখবি?

—না।

—তবে?

একটু চুপ করিয়া কাজল বলিল—যাদুঘর আবার দেখব।

অপু অবাক হইল, আনন্দিতও হইল।

—নিশ্চয় নিয়ে যাবো। আমারও দু'চার দিনের মধ্যে একবার কোলকাতায় যেতে হবে। তোকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবো'খন।

পথটা এখন নির্জন—ফাঁকা। শহরের এদিকে লোকবসতি কম। কাজল চারিদিকে তাকাইতে তাকাইতে চলিয়াছিল; সারাদিন রৌদ্রে পুড়িবার পর সন্ধ্যায় মাটি হইতে কেমন চমৎকার একটা গন্ধ বাহির হয়। গন্ধটার সহিত গরমকালের একটা যোগাযোগ আছে। শীত-কালেও তো রৌদ্র ওঠে—কিন্তু তখন এমন গন্ধ বাহির হয় না। এক জায়গায় পথের ধারে অনেকগুলি রাধাচূড়া গাছ—হল্‌দে ফুল ফুটিয়া আছে। অপু ছেলেকে চিনাইয়া দিল—ঐ দেখ্, ঐ হচ্ছে রাধাচূড়া ফুল। কালকেই নাম করেছিলাম, মনে আছে?

বেশ শান্ত সুন্দর সন্ধ্যা। এইবার একটি একটি করিয়া নক্ষত্র উঠিবে। অপুর হঠাৎ মনে হইল—বেশ হতো, যদি বাড়ি গিয়ে দেখতাম অপর্ণা জলখাবার তৈরী করে বসে আছে। কাজলের হাত-মুখ ধুইয়ে খাবার খাইয়ে পড়াতে বসাতো। আমায় লুচি আর বেগুনভাজা এনে দিয়ে চা চড়াতে যেতো। মন্দ হয় না যদি সত্যিই—

অনেক দূর আসা হইয়াছে। সামনেই রেললাইন।

ফিরিবার জন্য অপু ছেলের হাত ধরিয়া টানিবে, এমন সময় কাজল মুখে একটা শব্দ করিয়া দাঁড়াইয়া গেল।

অপু সবিস্ময়ে তাকাইয়া দেখিল কাজল রেললাইনের ধারে ঢালু জমিটার দিকে চাহিয়া ভয়ে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

রেললাইনের পাশে একটা গরু পড়িয়া রহিয়াছে—মৃত। ট্রেনের ধাক্কায় নিশ্চয় মারা গিয়াছে। শিং দুইটা ভাঙিয়া কোথায় গিয়াছে কে জানে, মেরুদণ্ড ভাঙিয়া শরীরটাকে প্রায় একটা মাংসপিণ্ডে পরিণত করিয়াছে। পিঠের কাছে চামড়া ফুটা হইয়া এক টুকরা রক্তাক্ত মেরুদণ্ডের হাড় বাহির হইয়া আছে। ঘাড় ভাঙা, মুখের কোণে রক্তমাখা ফেনা।

—বাবা!

কাজল যেন কেমন হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে উবু হইয়া বসিয়া পড়িল, তাহার মুখের ভাব দেখিয়া অপু ভয় পাইয়া গেল।

—কি রে? ভয় কি? ওঠো বাবা, মাণিক আমার। কোন ভয় নেই।

কাজল রক্তশূন্য মুখে বলিল—সেই লোকটার গরু। একেবারে মরে গেছে বাবা? আমার খারাপ লাগছে।

বাড়ি আসিবার পথে কাজল কাঁদিয়া অস্থির। জোরে কাঁদে নাই, ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে। অপু অনুভব করিতেছিল, তাহার হাতের ভিতর কাজলের হাত বরফের মতো ঠাণ্ডা! অপুর নিজেরও খারাপ লাগিতেছিল। বীভৎস দৃশ্যটা! কেন যে ওই পথে গেল তাহারা।

—তুই অত ভয় পেলি কেন? হ্যাঁ রে?

কাজল জবাব দিতে পারিল না। তাহার মনের মধ্যে ঘুরিতেছিল ঈষৎ ফাঁক-হওয়া রক্তফেনা মাখা মুখ, ভাঙা মেরুদণ্ডের বাহির হইয়া-থাকা হাড়টা আর মৃত গরুর পড়িয়া থাকিবার অস্বাভাবিক ভঙ্গি।

অসুন্দর জিনিসের সহিত তাহার পরিচয় কম, সুন্দর সন্ধ্যায় বেড়াইতে বাহির হইয়া এই প্রথম সরাসরি অসুন্দরের সহিত পরিচয় হইয়া গেল।

এ দিনটা কাজল ভুলিতে পারে নাই।

মালতীনগরে যে স্কুলে কাজল ভর্তি হইয়াছে, সেটা অপুর বাসা হইতে খুব একটা দূরে নহে। তবু অপু কাজলকে স্কুলে পৌঁছাইয়া দিয়া আসে। আবার ছুটি হইলে লইয়া আসে। বাদবাকি সময় তাহার একার, নিজস্ব। এই সময় সে একটি নূতন উপন্যাস লিখিয়া থাকে। প্রথম উপন্যাসের সাফল্য তাহাকে সাহসী করিয়াছে। এক উপন্যাসেই তাহার বলিবার কথা শেষ হইয়া যায় নাই। অনেক বাকী রহিয়াছে। এই উপন্যাসে তাহা লিখিবে।

আশেপাশের দুই একজন প্রতিবেশী অপুর কাছে যাতায়াত করিয়া থাকেন। ইহারা জানিয়া গিয়াছেন, অপু লেখক। অপুর উপন্যাস এঁরা পড়েন নাই, কিন্তু লেখকের উপর এঁদের অবিচল ভক্তি। ফলে, শহরে সাহিত্যিকের আগমন সংবাদ রটিতে বিশেষ বিলম্ব হইল না। তাহার বাসায় কয়েকটি ছোকরা যাতায়াত শুরু করিল। ইহাদের রচনা অপুকে মনোযোগ দিয়া শুনিতে হইত—দরকার হইলে কলম চালাইয়া ঠিক করিয়া দিতে হইত। অপুর উপন্যাস ইহারা পড়িয়াছে। অপু অবাক হইয়া লক্ষ্য করিল, তাহার নাম বেশ ছড়াইয়াছে। এত দ্রুত খ্যাতি আসিবে, ইহা তাহার কল্পনার বাহিরে ছিল। একদিক দিয়া ভালই হইয়াছে। একা থাকিতে হয়। এ ধরনের কিছু তরুণের সহিত আলাপ থাকা ভালো।

কাজলকে প্রতিবেশীর বাড়িতে রাখিয়া মাঝে মাঝে সে একদিনের জন্য কলিকাতায় যায়। বই হইতে আয় হইতেছে মন্দ নহে। প্রকাশকের কাছে গিয়া অপু টাকা লইয়া যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি মালতীনগরে ফেরে। কাজলকে ছাড়িয়া সে বেশীক্ষণ থাকিতে পারে না। আজকাল তাহার এই ভাবিয়া অবাক লাগে যে কাজলকে ফেলিয়া কি ভাবে এত দিন সে বাহিরে পড়িয়াছিল? হৌক ফিজি সুন্দর স্থান, কাজল সুন্দরতর।

কলিকাতায় একদিন তাহাকে প্রকাশকের দ্বারে দ্বারে পাণ্ডুলিপি লইয়া ফিবিতে হইয়াছে। নূতন লেখকের উপন্যাস কেহ ছাপিতে রাজী হয় নাই। এখন পরিস্থিতি কিছুটা অন্যরকম। প্রকাশক খাতির করিতেছে যত্ন করিতেছে। পূর্বের সে হেনস্থার দিন আর নাই।

একদিন প্রকাশকের দোকানে ঢুকিতেই প্রকাশক হাসিয়া বলিলেন, আসুন অপূর্ববাবু, বহুদিন বাঁচবেন। এইমাত্র আপনার কথাই হচ্ছিল। ইনি হচ্ছেন 'শবরী' কাগজের সম্পাদক আপনার একটা উপন্যাস চান। তাই ঠিকানা চাইছিলেন। তা আপনার নাম করতে করতে আপনি এসে হাজির।

পরে পার্শ্বস্থ স্থূলকায় ব্যক্তিটির দিকে ফিরিয়া বলিলেন—নিন, আর ঠিকানা দিতে হল না, একেবারে লেখক মশাইকে ধরে দিলাম।

কথাবার্তা ঠিক হইয়া গেল। আগামী সংখ্যা হইতে অপু লিখিবে। একটা বিজ্ঞাপন দেওয়া হইতেছে। সম্পাদক ভদ্রলোক অপুব লেখার অত্যন্ত প্রশংসা করিলেন।

অগ্রিম টাকা পকেটে লইয়া অপু পুবাতন দিনের মত খেয়ালে কিছুক্ষণ রাস্তায় রাস্তায় বেড়াইল। এখন সে হোটেলে ঢুকিয়া যাহা ইচ্ছা এবং যত ইচ্ছা খাইতে পারে। ইচ্ছা করিলে নোটগুলি একটা একটা করিয়া হাওয়ায় উড়াইয়া দিতে পারে। আজ হইতে অনেকদিন আগে, অবশ্য খুব বেশী দিন আর কি, তাহাকে অভুক্ত অবস্থায় রাস্তায় বেড়াইতে হইয়াছে শুকনো মুখে। কেহ ভালবাসিয়া বলে নাই, আহা, তোমার বুঝি খাওয়া হয় নি? এসো, যা হয় দুটো

ডাল-ভাত—না, সেরূপ কেহ বলে নাই। বরং তেওয়ারী-বধূ বেশ ভাল ছিল, তাহার স্নেহ ছিল না। জীবনের পথে তেওয়ারী-বধূর মত কয়েক জনের নিকট হইতে স্নেহস্পর্শ পাইয়াই তো কষ্টের মধ্যেও মানুষ সম্বন্ধে সে হতাশ হইয়া পড়ে নাই। আজ টাকা কয়টা পকেটে করিয়া সে পরিচিত স্থানগুলিতে একবার করিয়া গেল। মনে মনে ভাবিল, মানুষ যেখানে কষ্ট পায়, ভগবান সেখানেই আবার তাকে সুখ দেন। আমার সেই পুরানো মেসের সামনেই পকেটে আজ একগাদা টাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। কথাটা ভাবিয়া তাহার কেমন অদ্ভুত লাগিল। মনে হইল, রাস্তার ওপারের ঐ দোকানে বসিয়া-থাকা ধূমপানরত মানুষটিকে ডাকিয়া বলে—শুনুন, আমি ঐ গলিতে থাকতাম অনেকদিন আগে। খেতে পেতাম না, কলেজের মাইনে দিতে পারতাম না। মা বাড়িতে কষ্ট পেতেন, টাকা পাঠাতে পারতাম না। আর এখন আমার পকেটে এই দেখুন, অনেক টাকা—অনেক। এ দিয়ে আমি কি করি বলুন তো?

কিছুদিনের মধ্যেই অপু আরও একটি পত্রিকায় ধারাবাহিক উপন্যাস লিখিতে শুরু করিল। বাজারে তাহার বেশ নাম। বিশেষ করিয়া তরুণদের কাছে তাহার নূতন দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত আদর পাইতেছে। মালতীনগরের সেই তরুণ বাহিনী রোজ তাহার দুর্গ আক্রমণ করে, সে মাঝে মাঝে বিরক্ত হইলেও মুখে কিছু বলিতে পারে না। ছেলেগুলোকে সে পছন্দ করে, কিন্তু বড় বেশী বক বক করে তাহারা। অপুর মাথা ধরিয়া যায়।

অপু প্রতি মাসে একগাদা পত্রিকা ও বই কিনিয়া থাকে। ছেলের জন্য ভালো শিশুসাহিত্য আনে। এমন বই আনে, যাহা কাজলের মনের গভীরে ঘুমন্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে জাগাইয়া তোলে। কূপমণ্ডুক হইয়া বাঁচিয়া থাকিবার কোন অর্থ নাই, ছেলেকে সে মধ্যবিত্ত মনের অধিকারী করিয়া গড়িবে না। অপু নিজে ওয়াইড-ওয়ার্লড ম্যাগাজিন পড়িতে ভালবাসে। সে পড়ে ও ভাল গল্প পাইলে তৎক্ষণাৎ ছেলেকে ডাকিয়া শোনায়। এই ভাবে অপু ছেলের মনে

একটা পিপাসা জাগায়। কাজলের বিশেষ বন্ধু কেহ নাই, স্কুলে নাই, পাড়াতেও নাই। সে সমবয়সীদের মত দৌড়ঝাঁপ করিতে পারে না—যে সব খেলায় শারীরিক কসরতের প্রয়োজন, সেগুলি কাজল সভয়ে এড়াইয়া চলে। চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছে, সে পারে না। এইতো সেদিন বেণু আর শ্রীশ আম পাড়বার জন্য মুখুয্যেদের বাগানে পাঁচিল ডিঙাইয়া ঢুকিতেছিল। আম খাইতে কাজলের আপত্তি নাই, কিন্তু মধ্যে প্রাচীররূপী বড় একটা বাধা রহিয়াছে। অত উঁচু পাঁচিল তাহার পার হইবার সাধ্য নাই। বেণু আর শ্রীশ অদ্ভুত কৌশলে তর তর করিয়া পাঁচিলের মাথায় উঠিয়া গেল। শ্রীশ মিটিমিটি হাসিয়া বলিল—কি রে, পারবি নে?

তাহাদের উঠিবার কায়দা দেখিয়া কাজলের মনে হইতেছিল, ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি তাহারা এই কার্যের অনুশীলন করিয়াছে। মনে মনে নিজের অক্ষমতা বুঝিয়া কাজল ম্রিয়মাণ হইয়া বলিল—না ভাই আমার ডান পায়ে ব্যথা। একটা ফেলে দে না ভাই, খাই।

শ্রীশ এবং বেণুরা দয়া কবিয়া একটা দুইটা আম তাহাকে খাইতে দেয়। উপায় কি। নিজে উঠিয়া পাড়িবার সাধ্য তাহার নাই।

বাহিরের দুনিয়ায় লাফালাফি করিয়া বেড়াইবার সামর্থ্য নাই বলিয়া সে ঘরের ভিতরে অধিকাংশ সময় কাটায়। মাঝে মাঝে কাজল বাবার ওয়াইড-ওয়ার্লড ম্যাগাজিনগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে। গল্পগুলির আকর্ষণ তীব্র। ছবি দেখিয়া তাহার গায়ের লোম কাঁটা দিয়া উঠে—যে ছবিটায় খুব রহস্যজনক ঘটনার আভাস পাওয়া যায়, বাবাকে বলিয়া গল্পটা কাজল শুনিয়া লয়।

অপু বুঝিতে পারে, কাজলের মানসিক বৃদ্ধি শুরু হইয়াছে। ঠিক এই একই জিনিস সেও করিত দেওয়ানপুরের স্কুলে। কঠিন ইংরেজী বুঝিতে না পারিলে ছবি দেখিয়া কিছুটা আভাস পাইবার চেষ্টা করিত, অনেক সময় রমাপতিদাকে ধরিয়া গল্পটা বুঝিয়া লইত। সেই একই জিনিস আবার ঘটিতেছে! রক্তের ভিতর অদৃশ্য বীজ রহিয়াছে—তাহাই এ সব সম্ভব করিতেছে।

ধারাবাহিক উপন্যাস তুইখানি শুরু করিবার কিছুদিন পরে বিকালে বসিয়া ছেলের সঙ্গে জলখাবার খাইতেছিল। গোপালের মা পরোটা ভাজিয়া দিয়া রাস্তার দোকানে দোক্তা আনিতে গিয়াছে। এমন সময় বসিবার ঘরের দরজার মুখে আসিয়া দাঁড়াইল একটি মেয়ে। কিশোরী বলাই অধিক সঙ্গত, মেয়েটির বয়স কোন মতেই পনেরো--ষোলর বেশী নহে। অপু অবশিষ্ট পরোটাসুদ্ধ থালাখানা তাড়াতাড়ি খাটের নীচে লুকাইবার চেষ্টা করিল।

আশ্চর্যের উপর আশ্চর্য! মেয়েটি একা আসে নাই, তাহার পিছনে আরও একটি মেয়ে আসিয়াছে। এ মেয়েটি হয়ত প্রথমটির চেয়ে বৎসর তুই-তিনের বড় হইবে।

অপু উঠিয়া কোচা দিয়া খাটটা পরিষ্কার করিয়া মেয়ে তুটিকে বসিতে দিল। কাজল অবাক হইয়া ব্যাপারটা দেখিতেছে। অপেক্ষাকৃত কম বয়সী মেয়েটি লজ্জিত স্বরে বলিল—আপনিই তো অপূর্বকুমার রায়, লেখক ?

অপুর মনে ভারী আনন্দ হইল। সে লেখক বলিয়া মেয়ে তু'টি দেখা করিতে আসিয়াছে। এ অভিজ্ঞতার স্বাদ তাহার নিকট একেবারে নূতন প্রশংসা সে আগে পাইয়াছে, কিন্তু মেয়েদের নিকট হইতে তাহা পাওয়ার একটা আলাদা আনন্দ রহিয়াছে।

মেয়ে তুটি মালতীনগরেই থাকে। ছোট মেয়েটির নাম হৈমন্তী, বড়টি তাহার দিদি, নাম—সরযূ। হৈমন্তীর সাহিত্যে গভীর অনুরাগ আছে, সে অপুর লেখা পড়িয়া অবাক হইয়াছে তাহার ক্ষমতায়। অপু কি তাহাকে একটা অটোগ্রাফ দিবে ?

অপু সত্যাই অবাক হইল। মফঃস্বলে মেয়েরা একা বেড়াইতেছে, ইহা বেশ নূতন দৃশ্য। তাহা ব্যতীত কলিকাতায় অটোগ্রাফ চাহিলে ততটা অবাক হইবার কারণ থাকে না, কিন্তু মালতীনগরে অটোগ্রাফ। নাঃ, মেয়ে তুটি দেখা যাইতেছে বেশ আলোকপ্রাপ্তা।

অটোগ্রাফ দেওয়ার পর অপু তাহাদের চা খাইতে অনুরোধ

করিল। তাহারা লেখকের সহিত কথা বলিতেই আসিয়াছিল, অতএব বিশেষ আপত্তি করিল না।

কথায় কথায় প্রকাশ পাইল, হৈমন্তী গল্প লিখিয়া থাকে। অপু বলিল—সেটা আগে বলেন নি কেন? বাঃ, খুব ভাল কথা। একদিন নিয়ে আসুন, পড়া যাক।

দিদি কথাটা প্রকাশ করিয়াছিল। হৈমন্তী সরযুব দিকে কটমট কবিয়া তাকাইল, অপুর মজা লাগিতেছিল। হৈমন্তীর ছেলেমানুষি তাহার মনের আনন্দকে হঠাৎ ডাকিয়া তুলিল। নারীর স্পর্শ না থাকিলে জীবনটা পানসে লাগে, নারীর কল্যাণহস্তই জীবনের রূপ পালটাইয়া দেয়।

হৈমন্তী একখানা চাঁপাফুল-রঙের শাড়ী পরিয়া আসিয়াছিল, শাড়ীর আঁচল হাতে জড়াইতে জড়াইতে লজ্জিত মুখে বলিল—দিদির যেমন কাণ্ড। লেখাটেখা কিছু নয়, ও এমনি--

সরযু বাধা দিয়া বলিল--না অপূর্ববাবু। বিশ্বাস করবেন না ওর কথা। এই সেদিনও ওর লেখা বেরিয়েছে কাগজে।

সরযু যে পত্রিকার নাম করিল, সেটা শুনিয়া অপু সত্যিই বিস্মিত হইল। বাংলা দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাসিকপত্রে যদি এই দুগ্ধপোষ্য বালিকার রচনা ছাপা হইয়া থাকে তবে তাহা অবশ্যই একবার পড়িয়া দেখিতে হইতেছে।

অপু বলিল—কোন আপত্তি শুনছি নে, কবে লেখা আনবেন বলুন। ফাঁকি দিলে চলবে না।

সরযু বলিল—বাবাও শুনেছেন আপনি এখানে থাকেন। উনি বলছিলেন একদিন আপনাকে দুপুরে খাবার কথা বলতে। না, আপনারও কোন আপত্তি শোনা হবে না। কবে যাবেন বলুন—যেদিন যাবেন, সেইদিন হৈমন্তী আপনাকে লেখা শোনাবে।

অপু বিশেষ আপত্তি করিল না। রবিবারে নিমন্ত্রণ রহিল। কাজলও সঙ্গে যাইবে। হৈমন্তী এবং সরযু দুইজনে কাজলকে অনেক আদর করিয়া বিদায় লইল। ঠিকানাটা অপু রাখিয়া দিল।

মেয়ে দুটি বিদায় লইলে অপু বিছানার কাছে আসিয়া বসিতে যাইবে, চাদরের উপর নজর পড়িল কয়েকটা বেলফুল। তখনও বেশ তাজা, বেশীক্ষণ তোলা হয় নাই। অপু মনে মনে ভাবিল—এখানটায় হৈমন্তী বসেছিল। ও-ই নিয়ে এসেছিল ফুলগুলো। ভুলে ফেলে গেছে, আচ্ছা মেয়ে যা হোক—

অপু ফুলগুলো তুলিয়া একবার গভীর ঘ্রাণ লইল।

রবিবারে ছেলেকে লইয়া অপু নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গেল। নিজে একটু বিলাসিতা করিতে ছাড়ে নাই, একটা শান্তিপুরী ধুতি পরিয়াছে। কিন্তু সে তুলনায় জামাটা ভাল হইল না—ময়লা মতো। অথচ এই ধুতিটা পরিয়া নিমন্ত্রণ খাইতে যাইবার তাহার বড় শখ। ফলে বিসদৃশ জামাকাপড় পরিহিত অপু নিমন্ত্রণ খাইতে গেল।

বাড়িতে পা দিতে হৈমন্তীব বাবা আসিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। ভদ্রলোক সরকারী কাজ করেন—বদলির চাকরী। তিনি অপুব উপন্যাসটি পড়িয়াছেন। সম্প্রতি যে পত্রিকা দুইটিতে অপু উপন্যাস লিখিতেছে, সেগুলিও তাঁহার বাড়িতে রাখা হয়।

অপু অবাক হইয়া দেখিল, বাড়িময় সাহিত্যের আবহাওয়া। বাবা, ভাই বোন সবাই বেশ শিক্ষিত ও উদার। বসিবার ঘরে প্রচুর বই রহিয়াছে—অগোছালো ভাবে খাটের উপর ও টেবিলের উপর ছড়ানো। অপু নিজের অভিজ্ঞতা হইতে দেখিয়াছে, যে বাড়িতে বই সাজানো থাকে, সে বাড়ি পাঠক কম। পড়ুয়াদের বই কখনো গোছানো থাকিতে পারে না। যাহারা শখের আসবাবের মতো বই দিয়া ঘর সাজাইয়া সুরুচির পরিচয় দিতে চায়--তাহাদের বই সাজানো থাকিতে পারে। হৈমন্তীদের পরিবার সম্বন্ধে অপুর বেশ একটা শ্রদ্ধা জন্মিল। তাহার মনে বদ্ধমূল ধারণা আছে—যাহারা বই পড়িতে ভালবাসে তাহারা কখনো খারাপ মানুষ হইতে পারে

না। অনেকদিন পরে এই বাড়িতে আসিয়া অপুর মনে হইল, বেশ সহজ পছন্দসই আবেষ্টনীর মধ্যে আসিয়াছে। কাজল আসিবামাত্রই বই-এর কাছে গিয়া বসিয়াছে, বই পাইলে সে আর কিছু চায় না। অপু কিছুক্ষণ বাদে বলিল—তা এবার লেখাগুলো পড়লে হতো না?

হৈমন্তী কিছুটা সংকোচের সহিত খান দুই পত্রিকা আনিয়া অপুর হাতে দিল। অপু ব্যগ্রতার সহিত একটি হইতে সূচীপত্র দেখিয়া গল্প খুঁজিয়া পড়িতে শুরু করিল।

একটু তাচ্ছিল্যের সহিত পড়িতে শুরু করিয়াছিল বলিয়াই বোধ হয় ধাক্কাটা জোরে লাগিল। সাধারণ ন্যাকা-ন্যাকা ভাষায় লেখা নহে। একটি মেয়ে গল্প লিখিতে ভালবাসিত। বিবাহ হইয়া পতিগৃহে অজস্র সাংসারিক কাজের ভিড়ে তাহার লেখিকা-সত্তা গেল চাপা পড়িয়া। একদিন বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় মেয়েটি অবসর পাইয়া টিনের তোরঙ্গ খুলিয়া তাহার লেখার খাতা বাহির করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ভিজা বাতাসের সহিত তাহার কুমারী-জীবনের স্মৃতি যেন হু হু করিয়া ঢুকিয়া পড়িল ঘরের ভিতর। এই গল্প। ভাষার উপর লেখিকার দখলের কথা সহজেই বোঝা যায়। অপু অবাক হইল। গল্প পড়িয়া মামুলী ধরনে কি প্রশংসা করিবে তাহা ঠিক ছিল, এখন গল্পটা সত্য সত্যই ভাল হইয়া পড়ায় সে কিছু বলিতে পারিল না।

খাইতে বসিয়া অপু বলিল- সত্যিই খুব ভালা লেখা আপনার। এতটা ভাল, মিথ্যে বলবো না, আমি আশা করতে পারি নি।

হৈমন্তী বলিল—আমাকে আর আপনি বলছেন কেন, তুমি বলুন।

—তোমার গল্প সত্যিই ভাল লাগল হৈমন্তী। এত সাধারণ প্লট নিয়ে এত চমৎকার করে তা ফুটিয়ে তোলা—না, তোমার মধ্যে শিল্পিমন লুকিয়ে আছে।

হৈমন্তীর বাবা হাসিয়া বলিলেন—অত প্রশংসা করবেন না অপূর্ববাবু, মাথা বিগড়ে যাবে ওর। তবে হ্যাঁ, এ মেয়েটি আমার সত্যিই—পড়াশুনোতেও বড় ভালো ছিল। বরাবর ক্লাসে ফার্স্ট হতো। বড় অসুখে পড়েছিল বলে বছর-খানেক পড়া বন্ধ আছে।

খাওয়া হইলে হৈমন্তী অপুর জন্য মশলা আনিল। মশলা লইতে লইতে অপু জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা, সেদিন তুমি আমার খাটের ওপরে বেলফুল ফেলে এসেছিলে, না? তুমি যাবার পর দেখি পড়ে আছে। আমার অবশ্য ভালোই হয়েছিল, সারা সন্ধ্যে গন্ধ শুঁকে শুঁকে বেশ কবিত্ব করা গেল।

হৈমন্তীদের বাড়িতে অপু প্রায়ই যাতায়াত করে আজকাল। হৈমন্তীর বাবা-মা তাহাকে পাইলে সত্যই খুশী হন। সে গিয়া গল্পগুজব করিয়া জলখাবার খাইয়া বাড়ি ফেরে। কাজলও সঙ্গে যায়। মাঝে মাঝে গানের আসর বসে, হৈমন্তী আগে হইতে নিমন্ত্রণ করিয়া যায়। সাংস্কৃতিক আবহাওয়া অপু পছন্দ করে, ফলে এ বাড়ির সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা গড়িয়া উঠিতে বেশি দেরী হয় নাই।

অপু অনেক ভাবিয়া দেখিয়াছে একা সারাজীবন কাটানো তাহার পক্ষে সম্ভবপর নহে। অপর্ণার কথা ভাবিয়াই সে অন্তর হইতে সায় পাইতেছিল না। কিন্তু পরে চিন্তা করিয়া দেখিল, অপর্ণার স্মৃতি তাহার মনের যে গোপন কন্দরে স্থায়ী রঙে আঁকা হইয়া গিয়াছে—সেখানে আর কাহারও স্থান নাই। কিন্তু হৈমন্তীকে সে অস্বীকার করিতে পারিবে না।

একমাত্র ভয় ছিল কাজলকে লইয়া। কিন্তু কাজল ও হৈমন্তী পরস্পরকে নিকট-বন্ধনে বাঁধিয়াছে। সেদিক দিয়া চিন্তার আর কারণ নাই।

একদিন অপু কথাটা হৈমন্তীর বাবার কাছে পড়িল। ভদ্রলোক আপত্তি করিলেন না। অপু সজ্জন, সুপুরুষ, বাজারে নামডাক হইয়াছে। সম্প্রতি বই লিখিয়া ভাল উপার্জন করিতেছে। এমন পাত্রের সহিত বিবাহ না দিবার কোনো কারণ নাই। তিনি নিজেও বুদ্ধিমান এবং সাহিত্যরসিক। অপুর ব্যক্তিত্ব এবং রচনা-ক্ষমতা তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তিনি মত দিলেন।

দিনস্থির করিবার জন্য ভিতর-বাড়ি হইতে পঞ্জিকা আনানো হইল।

বিবাহের পর মাস তিনেক কাটিয়াছে। বৃষ্টি তেমন হইতেছে না। আকাশের রঙ কটা, তামার মত। গরমে দেশসুদ্ধ লোক হাঁপাইয়া উঠিয়াছে। মাটিতে বড় বড় ফাটল, বৃষ্টির জন্য আকাশের দিকে মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে। গরমে কাকদের স্বরভঙ্গ হইয়াছে, ডাকিলে তীব্র কা-কা শব্দের বদলে একটা ফ্যাস-ফ্যাস শব্দ বাহির হইতেছে মাত্র। লোকে প্রতি দণ্ডে একবার আকাশের দিকে তাকাইয়া মেঘ আসিল কিনা দেখিতেছে।

অপু স্ত্রীপুত্রকে মালতীনগরে রাখিয়া নিশ্চিন্দিপুরে গেল। হৈমন্তীকে সে দেশে রাখিবে। মালতীনগর ভাল জায়গা হইতে পারে, কিন্তু মালতীনগরের সহিত তাহার আত্মিক যোগাযোগ নাই। যদি গৃহী হইতে হয়, নিশ্চিন্দিপুরে সে গৃহী হইবে।

রাধারমণ চাটুজ্যের কাছে খোঁজ করিতে বাড়ির সন্ধান পাওয়া গেল। তাহাদের পুরানো ভিটার কাছেই ছোট পাকাবাড়ী, মন্দ নহে। দামও অপুর কাছে সস্তা বলিয়া বোধ হইল। নিজেদের ভিটায় নূতন করিয়া বাড়ি তুলিতে গেলে যা খরচ পড়ে, তাহা এখন অপুর পক্ষে যোগাড় করা মুস্কিল। বাড়ি একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে —তাহার উপর বাড়ি তোলা অনেক ঝামেলার কাজ। ফলে অপু এই বাড়ি কেনাই মনস্থ করিল।

হৈমন্তীকে লইয়া নিশ্চিন্দিপুরে আসিলে বেশ বড় রকমের হৈ-চৈ হইল। রাণী আগে হইতেই অপুর কেনা বাড়িতে আসিয়া প্রস্তুত হইয়া ছিল। আরও অনেকে আসিয়া ভিড় জমাইয়াছিল উঠানে। অপুরা আসিতেই রাণী সবার আগে আসিয়া অভ্যর্থনা করিল, হৈমন্তীর পিঠে হাত দিয়া তাহাকে ঘরের ভিতর লইয়া গেল।

গোলমাল মিটিলে অপু বলিল—বৌ কেমন লাগল রাণুদি?

—সুন্দর হয়েচে। চমৎকার বৌ হয়েচে। তুই যে বিয়েথাওয়া করে আবার এসে গ্রামে উঠেছিস, এতে যে কি খুশী হয়েচি তা আর

—এবার মন দিয়ে সংসারধর্ম কর। বড্ড বাউণ্ডুলে হয়ে গিয়েছিলি তুই।

সর্বাপেক্ষা খুশি হইয়াছে কাজল। এই কদিন তাহাকে স্কুলে যাইতে হইতেছে না, পড়া মুখস্থ করিতে হইতেছে না। বাবা বলিয়াছে, গ্রামের কাছেই স্কুলে ভর্তি করিবে। তাহাতে যে দু-একদিন লাগিবে, তাহা বেশ মজায় কাটিয়া যাইবে।

নিশ্চিন্দিপুরে ফিরিবার সময় অপু ছেলের কথা ভাবিয়াছিল। শেষে ভাবিল—কি আর হবে, গ্রামেব স্কুলেই ভর্তি করিয়া দিই। বাদবাকি পড়া আমি নিজে দেখব'খন। আমি নিজেও তো একসময় গ্রাম্য স্কুলে পড়েচি, আমার কি পড়াশুনো কিছুই হয় নি?

প্রতিবেশীরা ফিরিয়া গিয়াছে। কাজল রাণীর সহিত তাহাদের বাড়ি গিয়াছে। দুপুরে অপু ঘরে ঢুকিয়া বলিল—প্রথম দিন আর বেশি কিছু রান্না করতে হবে না। যা-হোক একটা ছেচকি-টেচকি কিছু নামিয়ে ফেলো। এমনিতেই আসার কষ্ট গেছে—রাণুদি ডাল আর তরকারী পাঠিয়ে দেবে বলেছে? বলেছে, নতুন-বৌ এল তাকে খাটালে গাঁয়ের নিন্দে হবে যে।

রাণুপিসি নানা কাজে ব্যস্ত ছিল, তাহাকে বলিয়া কাজল বেড়াইতে বাহির হইল। রাণী বলিয়া দিল—বেশি দেরী করিসনে, দূরে যাস নে।

গ্রামের প্রান্তে যে মাঠ আছে, তাহার আল ধরিয়া পড়ন্ত বেলায় হাঁটিতে কাজলের খুব ভাল লাগে। মাঠেব দূরে দূরে লোক থাকে অধিকাংশ সময়েই মাঠ ফাঁকা। ওয়াইড ওয়ার্লড ম্যাগাজিন হইতে শোনা গল্পগুলির পটভূমি হিসাবে এই ফাঁকা মাঠ ও বন্য ঝোপ তাহার মনে আধিপত্য বিস্তার করে। দক্ষিণ-আফ্রিকার প্রচণ্ড গরমে মরুভূমির ভিতর হীরকসন্ধানী দুইটি দলের মধ্যে যে ভীষণ সংঘর্ষ হইয়াছিল, এই মাঠে সে তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারে। দক্ষিণ আফ্রিকার গরমের সহিত সংগতি রাখিবার জন্য সে হাতের উলটা পিঠ দিয়া শক্ত আলের উপরকার উত্তাপ অনুভব করে। মনে মনে

তাঁহাদের মানসিক ধারা যে-পথ অবলম্বনে চলে অপুর পথ তা নয়—তাঁহাদের মূর্খতা, সংস্কার, সীমাবদ্ধতা ও সর্বরকমের মানসিক দৈন্য অপুকে পীড়া দেয়। খানিকক্ষণ মিষ্টালাপ হয়তো এদের সঙ্গে চলিতে পারে—কিন্তু বেশীক্ষণ আড্ডা দেওয়া অসম্ভব—বরং কারখানার ননী মিস্ত্রী, কি চাঁপদানীব বিশু স্যাকরার আড্ডার লোকজনকে ভালই লাগিত—কারণ তাহারা যে জগৎটাতে বাস করিত—অপুর কাছে সেটা একেবারেই অপরিচিত—তাহাদের মোহ ছিল, সেই অজানা ও অপরিচয়ের মোহ, কাশীর কথকঠাকুর কি অমরকণ্টকের আজবলাল ঝা-কে যে কারণে ভাল লাগিয়াছিল। কিন্তু এরা সে ধবনের অনন্য-সাধারণ নয় নিতান্তই সাধারণ ও নিতান্ত ক্ষুদ্র। কাজেই বেশীক্ষণ থাকিলেই হাঁপ ধরে। অপুর নতুন ঘরটাতে দরজা জানালা কম, দক্ষিণ দিকের ছোট জানালাটা খুলিলে পাশের বাড়ির ইট-বার-করা দেওয়ালটা দেখা যায় মাত্র। ভাবিল—তবুও তো একা থাকতে পারব—লেখাটা হবে।

বাড়ি বদল করার দিনটা জিনিসপত্র সরাইতে ও ঘর গুছাইতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। হাত-পা ধুইয়া ঠাণ্ডা হইয়া বসিল।

আজ রবিবার ছেলে-পড়ানো নাই। বাপ্। নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। সে অতটুকু ঘর, কয়লাব ধোঁয়া আর রাজ্যের প্যাক-বাক্সের টাপিন তেলের মত গন্ধ। আজ কয়েক দিন হইল কাজলের একখানা চিঠি পাইয়াছে, এই প্রথম চিঠি, কাটাকুটি বানান ভুলে ভর্তি। আর একবার পত্রখানা বাহির করিয়া পড়িল—বার-পনেরো হইল এইবার লইয়া। বাবার জন্য তাহার মন কেমন করে, একবার যাইতে লিখিয়াছে, একখানা আরব্য উপন্যাস ও একটা লণ্ঠন লইয়া যাইতে লিখিয়াছে, যেন বেশী দেরী না হয়। অপু ভাবে, ছেলেটা পাগল, লণ্ঠন কি হবে? লণ্ঠন? ছাখ তো কাণ্ড। উঠিয়া ঘরে আলো জ্বালিয়া ছেলের পত্রের জবাব লিখিল। সে আগামী শনিবার তাহাকে দেখিতে যাইতেছে। সোম ও মঙ্গলবার ছুটি, ট্রেনে স্টীমারে

—এবার মন দিয়ে সংসারধর্ম কর। বড্ড বাউণ্ডুলে হয়ে গিয়েছিলি তুই।

সর্বাপেক্ষা খুশি হইয়াছে কাজল। এই কদিন তাহাকে স্কুলে যাইতে হইতেছে না, পড়া মুখস্থ করিতে হইতেছে না। বাবা বলিয়াছে, গ্রামের কাছেই স্কুলে ভর্তি করিবে। তাহাতে যে দু-একদিন লাগিবে, তাহা বেশ মজায় কাটিয়া যাইবে।

নিশ্চিন্দিপুরে ফিরিবার সময় অপু ছেলের কথা ভাবিয়াছিল। শেষে ভাবিল—কি আর হবে, গ্রামেব স্কুলেই ভর্তি করিয়া দিই। বাদবাকি পড়া আমি নিজে দেখব'খন। আমি নিজেও তো একসময় গ্রাম্য স্কুলে পড়েচি, আমার কি পড়াশুনো কিছুই হয় নি?

প্রতিবেশীরা ফিরিয়া গিয়াছে। কাজল রাণীর সহিত তাহাদের বাড়ি গিয়াছে। দুপুরে অপু ঘরে ঢুকিয়া বলিল—প্রথম দিন আর বেশি কিছু রান্না করতে হবে না। যা-হোক একটা ছেঁচকি-টেচকি কিছু নামিয়ে ফেলো। এমনিতেই আসার কষ্ট গেছে—রাণুদি ডাল আর তরকারী পাঠিয়ে দেবে বলেছে? বলেছে, নতুন-বৌ এল তাকে খাটালে গাঁয়ের নিন্দে হবে যে।

রাণুপিসি নানা কাজে ব্যস্ত ছিল, তাহাকে বলিয়া কাজল বেড়াইতে বাহির হইল। রাণী বলিয়া দিল—বেশি দেরী করিসনে, দূরে যাস নে।

গ্রামের প্রান্তে যে মাঠ আছে, তাহার আল ধরিয়া পড়ন্ত বেলায় হাঁটিতে কাজলের খুব ভাল লাগে। মাঠের দূরে দূরে লোক থাকে অধিকাংশ সময়েই মাঠ ফাঁকা। ওয়াইল্ড ওয়ার্লড ম্যাগাজিন হইতে শোনা গল্পগুলির পটভূমি হিসাবে এই ফাঁকা মাঠ ও বন্য ঝোপ তাহার মনে আধিপত্য বিস্তার করে। দক্ষিণ-আফ্রিকার প্রচণ্ড গরমে মরুভূমির ভিতর হীরকসন্ধানী দুইটি দলের মধ্যে যে ভীষণ সংঘর্ষ হইয়াছিল, এই মাঠে সে তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারে। দক্ষিণ আফ্রিকার গরমের সহিত সংগতি রাখিবার জন্য সে হাতের উলটা পিঠ দিয়া শক্ত আলের উপরকার উত্তাপ অনুভব করে। মনে মনে

তাঁহাদের মানসিক ধারা যে-পথ অবলম্বনে চলে অপুর পথ তা নয়—তাঁহাদের মূর্খতা, সংস্কার, সীমাবদ্ধতা ও সর্বরকমের মানসিক দৈন্য অপুকে পীড়া দেয়। খানিকক্ষণ মিষ্টালাপ হয়তো এদের সঙ্গে চলিতে পারে—কিন্তু বেশীক্ষণ আড্ডা দেওয়া অসম্ভব—বরং কারখানার ননী মিস্ত্রী, কি চাঁপদানীর বিশু স্যাকরার আড্ডার লোকজনকে ভালই লাগিত—কারণ তাঁহারা যে জগৎটাতে বাস করিত—অপুর কাছে সেটা একেবারেই অপরিচিত—তাহাদের মোহ ছিল, সেই অজানা ও অপরিচয়ের মোহ, কাশীর কথকঠাকুর কি অমরকণ্টকের আজবলাল ঝা-কে যে কারণে ভাল লাগিয়াছিল। কিন্তু এরা সে ধরনের অনন্য-সাধারণ নয় নিতান্তই সাধারণ ও নিতান্ত ক্ষুদ্র। কাজেই বেশীক্ষণ থাকিলেই হাঁপ ধরে। অপুর নতুন ঘরটাতে দরজা জানালা কম, দক্ষিণ দিকের ছোট জানালাটা খুলিলে পাশের বাড়ির ইট-বার-করা দেওয়ালটা দেখা যায় মাত্র। ভাবিল—তবুও তো একা থাকতে পারব—লেখাটা হবে।

বাড়ি বদল করার দিনটা জিনিসপত্র সরাইতে ও ঘর গুছাইতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। হাত-পা ধুইয়া ঠাণ্ডা হইয়া বসিল।

আজ রবিবার ছেলে-পড়ানো নাই বাপ্! নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। সে অতটুকু ঘর, কয়লার ধোঁয়া আর রাজ্যের প্যাক-বাক্সের টার্পিন তেলের মত গন্ধ। আজ কয়েক দিন হইল কাজলের একখানা চিঠি পাইয়াছে, এই প্রথম চিঠি, কাটাকুটি বানান ভুলে ভর্তি। আর একবার পত্রখানা বাহির করিয়া পড়িল—বার-পনেরো হইল এইবার লইয়া। বাবার জন্য তাহার মন কেমন করে, একবার যাইতে লিখিয়াছে, একখানা আরব্য উপন্যাস ও একটা লণ্ঠন লইয়া যাইতে লিখিয়াছে, যেন বেশী দেরী না হয়। অপু ভাবে, ছেলেটা পাগল, লণ্ঠন কি হবে? লণ্ঠন? ভাখ তো কাণ্ড। উঠিয়া ঘরে আলো জ্বালিয়া ছেলের পত্রের জবাব লিখিল। সে আগামী শনিবার তাহাকে দেখিতে যাইতেছে। সোম ও মঙ্গলবার ছুটি, ট্রেনে স্টীমারে

বেজায় ভিড়। খুলনার স্টীমার এবারও ফেল করিল। শ্বশুরবাড়ি পৌঁছিতে বেলা দুপুর গড়াইয়া গেল।

নৌকা হইতে দেখে কাজল ঘাটে তাহার অপেক্ষায় হাসিমুখে দাঁড়াইয়া—নৌকা থামিতে-না-থামিতে সে ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। মুখ উঁচু করিয়া বলিল—বাবা,—আমার আরব্য উপন্যাস?—অপু সে-কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে। কাজল কাঁদ-কাঁদ সুরে বলিল—হু-উ বাবা এত ক'রে লিখলাম, তুমি ভুলে গেলে লণ্ঠন? অপু বলিল,—আচ্ছা তুই পাগল নাকি—লণ্ঠন কি করবি?—কাজল বলিল, সে লণ্ঠন নয় বাবা! হাতে ঝুলানো যায়, রাঙা কাচ, সবুজ কাচ বের করা যায় এমনি ধারা। হুঁ-উ, তুমি আমার কোন কথা শোনো না। একটা আর্শি আনবো বাবা?

—আর্শি?—কি করবি আর্শি?

—আমি আর্শিতে ছিঁয়া দেখ্‌বো—

অপর্ণার দিদি মনোরমা অনেকদিন পরে বাপের বাড়ি আসিয়াছেন। বেশ সুন্দরী, অনেকটা অপর্ণার মত মুখ। ছোট ভগ্নীপতিকে পাইয়া খুব আহ্লাদিত হইলেন, স্বর্গগত মা ও বোনের নাম করিয়া চোখের জল ফেলিলেন। অপু তাঁহার কাছে একটা সত্যকার স্নেহ-ভালবাসা পাইল। সন্ধ্যাবেলা অপু বলিল—আসুন দিদি, ছাদের উপর ব'সে আপনার সঙ্গে একটু গল্প করি।

ছাদ নির্জন, নদীর ধারেই, অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যায়।

অপু বলিল—আমার বিয়ের রাতের কথা মনে হয় মনোরমাদি?

মনোরমা মৃদু হাসিয়া বলিলেন—সেও যেন এক স্বপ্ন। কোথা থেকে কি যেন সব হয়ে গেল ভাই—এখন ভেবে দেখলে—সেদিন তাই এই ছাদের উপর বসে অনেকক্ষণ ধরে ভাবছিলুম—তোমাকেও তো আমি সেই বিয়ের পর আর কখনও দেখি নি। এবার এসে-ছিলুম ভাগ্যিস, তাই দেখাটা হ'ল।

হাসির ভঙ্গি অপর্ণার মত, মুখের কত কি ভাব, ঠিক তাহারই মত—বিস্মৃত জগৎ হইতে সে-ই যেন আবার ফিরিয়া আসিয়াছে।

মনোরমা অনুযোগ করিয়া বলিলেন—তুমি তো দিদি বলে খোঁজও কর না ভাই। এবার পুজোর সময় বরিশালে যেও—বলা রইল, মাথার দিব্যি। আর তোমার ঠিকানাটা আমায় লিখে দিও তো।

কোথা হইতে কাজল আসিয়া বলিল—বাবা একটা অর্থ জান?

অর্থ? কি অর্থ?

কাজলের মুখ তাহার অপূর্ব সুন্দর মনে হয়—কেমন একধরনের ঘাড় একধারে বাঁকাইয়া চোখে খুশীর হাসি হাসিয়া কথাটা শেষ করে, আবার তখন বোকার মতই হাসে—হঠাৎ যেন মুখখানা করুণ ও অপ্রতিভ দেখায়। ঠিক এই সময়েই অপুর মনে ওই স্নেনের বেদনাটা দেখা দেয়—কাজলের ঐ ধরনের মুখভঙ্গিতে।

—বল দেখি, বাবা, 'এখান থেকে দিলাম সাড়া, সাড়া গেল সেই বামুনপাড়া?' কি অর্থ।

অপু ভাবিয়া ভাবিয়া বলিল—পাখি।

কাজল ছেলেমানুষি হাসির খই ফুটাইয়া বলিল, ইল্লি। পাখি বুঝি? শাঁখ তো—শাঁখের ডাক। তুমি কিচ্ছু জানো না বাবা।

অপু বলিল—ছিঃ বাবা, ওরকম ইল্লি টিল্লি বলো না, বলতে নেই ও-কথা, ছিঃ।

কেন বলতে নেই বাবা?···

ও ভাল কথা নয়।

আসিবার আগের দিন রাত্রে কাজল চুপি চুপি বললে—এবার আমায় নিয়ে যাও বাবা, আমার এখানে থাকতে ভাল লাগে না।

অপু ভাবিল—নিয়েই যাই এবারে এখানে ওকে কেউ দেখে না, তাছাড়া লেখাপড়াও এখানে থাকলে যা হবে।

পরদিন সকালে ছেলেকে লইয়া সে নৌকায় উঠিল। অপর্ণার তোরঙ্গ ও হাতবাক্সটা এখানে আট-নয় বৎসর পড়িয়া আছে, তাহার বড় শালী সঙ্গে দিয়া দিলেন। ইহাদের তুলিয়া দিতে আসিয়া ঘাটে দাঁড়াইয়া চোখের জল ফেলিলেন। অপুকে বার বার বরিশালে

যাইতে অনুরোধ করিলেন। সকালের নবীন রোদ ভাঙা নাটমন্দিরের গায়ে পড়িয়াছে। নদীর জল হইতে একটা আমিষ গন্ধ আসিতেছে। শ্বশুর মহাশয়ের তামাক-খাওয়ার কয়লা পোড়ানোর জন্য শুকনা ডালপালায় আগুন দেওয়া হইয়াছে নদীর ধারটাতেই। কুণ্ডলী পাকাইয়া ধোঁয়ার রাশ উপরে উঠিতেছে। সকালের বাতাসটা বেশ ঠাণ্ডা। আজ বহু বৎসর আগে যেদিন বন্ধু প্রণবের সঙ্গে বিবাহের নিমন্ত্রণে এ বাটী আসিয়াছিল তখন সে কি ভাবিয়াছিল এই বাড়িটার সহিত তাহার জীবনে এমন একটি অদ্ভুত যোগ সাধিত হইবে, আজও সেদিনটার কথা বেশ স্পষ্ট মনে হয়। মনে আছে, আগের দিন একটা গ্রামোফোনের দোকানে গান শুনিয়াছিল—'বরিষ ধরা মাঝে শান্তির বারি।' শুনিয়া গানটা মুখস্থ করিয়াছিল ও সারাপথে ও স্টীমারে আপন মনে গাহিয়াছিল—এখনও গুন্ গুন্ করিয়া গানটা গাহিলে সেই দিনটা আবার ফিরিয়া আসে।

কাজলকে সে কলিকাতায় লইয়া আসিল পরদিন বৈকালের ট্রেনে। সন্ধ্যার পর গাড়িখানা শিয়ালদহ স্টেশনে ঢুকিল। এত আলো, এত বাড়িঘর, এত গাড়িঘোড়া—কি কাণ্ড এ সব! কাজল বিস্ময়ে একেবারে নির্বাক হইয়া গেল। সে শুধু বাবার হাত ধরিয়া চারিদিকে ডাগর চোখে চাহিতে চাহিতে চলিল।

হ্যারিসন রোডের বড় বড় বাড়িগুলা দেখাইয়া এইবার সে বলিল, ওগুলো কাদের বাড়ি, বাবা? অত বাড়ি?

বাবার বাসাটায় ঢুকিয়া কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া সে গলির মোড়ে দাঁড়াইয়া বড় রাস্তাটার গাড়িঘোড়া দেখিতে লাগিল। অবাক জলপান জিনিসটা কি? বাবার দেওয়া দুটো পয়সা কাছে ছিল, এক পয়সার অবাক-জলপান কিনিয়া খাইয়া সে সত্যই অবাক হইয়া গেল। মনে হইল, এমন অপূর্ব জিনিস সে জীবনে আর কখনও খায় নাই। ছোলা-ছোলা ভাজা সে অনেক খাইয়াছে। কিন্তু কি মশলা দিয়া ইহারা তৈরী করে এই অবাক-জলপান?

ভাবে, আফ্রিকার মরুভূমির বালিও এমনি গরম। বাবার কাছে গল্প শুনিয়া সে লক্ষ্য করিয়াছে, যাবতীয় রোমাঞ্চকর ঘটনা আফ্রিকাতেই ঘটিয়া থাকে। আফ্রিকা তাহার কাছে রহস্যের দেশ। বড় হইলে সে আফ্রিকায় যাইবে, বাওবাব গাছ (বাবার কাছে নাম শুনিয়াছে) দেখিবে।

সূর্য দিগন্তরেখা স্পর্শ করিয়াছে। কাজল তাকাইয়া দেখিল মস্ত লাল সূর্যটা আস্তে আস্তে দিগন্তের নিচে নামিয়া পড়িতেছে। ততক্ষণে একটু ঠাণ্ডা বাতাস ছাড়িয়াছে। আলের পাশে ছোট ছোট ঝোপের মধ্য দিয়া হালকা শব্দ তুলিয়া হাওয়া বহিতেছে। কেহ কোথাও নাই। যতদূর দৃষ্টি যায়, উদার বিশাল মাঠ পড়িয়া আছে। বিকালে কেমন-একটা ছায়া-ছায়া ভাব নামিতেছে। বাতাসের অদ্ভুত শব্দ। এর মধ্যে একলা দাঁড়াইয়া থাকিবার যে একটা ভয়-মিশ্রিত আনন্দ আছে, তাহা কাজলকে অভিভূত করে। ঠিক ভয় নহে, একটা অচেনা অনুভূতি। এই সময় দিন ও রাত্রির সন্ধিক্ষণে বাড়ি হইতে দূরে মাঠের ভিতর পৃথিবীটাকে যেন অচেনা বোধ হয়।

ফিরিবে বলিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইতেই কাজলের সেই লোকের সহিত দেখা হইয়া গেল। মানুষটার হাতে খঞ্জনী, পরনে আটহাতি খাটো মোটা ধুতি। নাকে রসকলি, বগলে ছাতা—তাপ্পি মারা, কাঁধে ঝুলি। আপন মনে আসিতেছিল, সামনে কাজলকে দেখিয়া খঞ্জনীটা দ্রুতলয়ে একবার বাজাইয়া দিল।

কাজল প্রথমে ভয় পাইয়াছিল। পরে লোকটার চোখের দিকে তাকাইয়া বুঝিল, এ চোখ যাহার তাহাকে ভয় পাইবার কোন কারণ নাই।

লোকটা হাসিয়া বলিল—বেড়ান বাবাজী? ভালো, বেড়ানো ভালো। বেড়ালে মানুষের চোখ ফোটে—তাঁর দুনিয়াটার রূপ দেখতে পায় মানুষ—

—কার দুনিয়া?

লোকটা আর একবার দ্রুত খঞ্জনী বাজাইয়া ওপরে আকাশের

দিকে দেখাইয়া বলিল—ওই ওখানে যিনি থাকেন, তাঁর। সবই তো তাঁর বাবাজী।

সম্পূর্ণ টা না পারিলেও, কাজল লোকটার কথার খানিকটা অর্থ ধরিতে পারিল। বেশ কথা বলে মানুষটি। কাজল বলিল—তুমি বুঝি অনেক বেড়িয়েচ?

লোকটা মৃদু হাসিল।

—বেড়ানো আর হলো কোথায়? অকাজেই বড্ড বেলা হয়ে গেল। হ্যাঁ, কিছু কিছু ঘুরেছি বাবাজী। বেশীর ভাগটাই না দেখা রইল।

খঞ্জনী বাজাইয়া লোকটা ভাঙা বেসুরো গলায় ঢ্‌'কলি গান গাহিল—

ও মন তুই পোড়া সুখে রইলি ভুলে
যখন তোর মনের পদ্ম উঠল দুলে
প্রভুর পদপরশনে—

কাজল লোকটাকে ভালবাসিয়া ফেলিল। সুন্দর মানুষ! গান গাহিতে পারে—গল্প করিতে পারে, আর কি চাই? বলিল—তোমার কি তাড়াতাড়ি আছে? এইখানটায় বসে আমার সঙ্গে একটু গল্প করে যাও না। লোকটা ছাতাটা আলের গায়ে হেলান দিয়া রাখিয়া বসিল।

—তুমি যদি থাকতে বলো, তবে আমার কোন তাড়া নেই।

অনেক গল্প হইল লোকটার সহিত। লোকটা সুন্দর গল্প করিতে জানে। সাধারণ ঘটনাও তাহার বলিবার গুণে চিত্তাকর্ষক হইয়া ওঠে। একটি মেয়ের বাপের বাড়ির গাঁয়ে সে ভিক্ষা করিতে যাইত, মেয়েটির বিবাহের পর তাহার শ্বশুর বাড়ির গাঁয়েও ভিক্ষা করিতে গিয়াছিল—না জানিয়াই। শ্বশুরবাড়িতে ভিক্ষা চাহিয়া দাঁড়াইতে বাপের বাড়ির চেনা বলিয়া মেয়েটি তাহাকে অনেক কথা লুকাইয়া বলিয়াছে। ইহাতে লোকটা খুব খুশি।

—জগতে কেউ কারুর নয় বাবাজী আপন মনে করলেই আপন পর ভাবলেই পর।

গল্প শেষ হইলে সে ঝুলির ভিতর হইতে একটি পাকা আম বাহির করিল।

—তুমি এটা নাও খোকন। বাড়ি গিয়ে খেয়ো।

—না, তোমার জিনিস আমি কেন নেবো?

—আমার আর কই? এটা তোমারই, আমি তোমাকে দিচ্ছি।

—নিশ্চিন্দিপুর এই তো, কাছেই। একদিন যেও না আমাদের বাড়ি।

—যাব, নিশ্চয় যাব।

খঞ্জনীতে আওয়াজ তুলিয়া গুনগুন করিতে করিতে সে বিদায় লইল। দুই পা হাঁটিয়াই কাজল তাহাকে ডাকিল—তোমার নাম তো বলে গেলে না?

সে ফিরিয়া বলিল—আমার নাম রামদাস বোষ্টম। স্বল্প আলাপেই রামদাস কাজলের মনে গভীর ছাপ রাখিয়া গেল। কেমন সুন্দর জীবন, একা একা বেড়ায় মাঠে-ঘাটে, ঘরবাড়ির ঠিক নাই। কোন বন্ধন নাই—পিছুটান নাই। আবার পিছুটান নাই বলিয়া দুঃখও নাই। খোলা আকাশের নিচে একা খঞ্জনী বাজাইয়া ফেরে।

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে কাজল বাড়ির পথ ধরিল।

পরদিন সকালে অপু ছেলেকে লইয়া কলিকাতা রওনা দিল। কাজল একটা ঘিয়ে-রঙের হাফপ্যান্ট আর সাদা শার্ট পরিয়াছে। হৈমন্তী চুল আঁচড়াইয়া দিয়াছে পরিপাটি করিয়া। যাইবার সময় অপুকে বলিয়া দিয়াছে—ওকে ভাল করে দেখেশুনে নিয়ে যাবে। যা দুষ্টু—
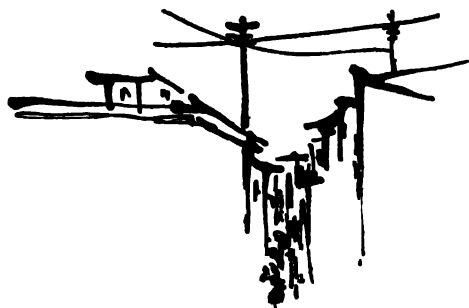
কলকাতায় কাজল

কাজল অনেকদিন বাদে কলিকাতায় আসিল। আবার সেই বড় বড় বাড়ি, লোকজন, হৈ-চৈ, রাস্তায় গাড়ীর ভেঁপু, ট্রামের ঘণ্টা। সব মিলিয়া জিনিসটি মন্দ লাগে না। বাবা তাহাকে বলিয়াছে বড় হইলে তাহাকে কলিকাতার কলেজে পড়াইবে। কলিকাতার বড় বড় কলেজের গল্প বাবা তাহার নিকট করিয়াছে, সেখানে লাইব্রেরীতে কত বই আছে—তাহা নাকি গণিয়া শেষ করা যায় না। ঐ সমস্ত বই সে পড়িবে।

অপুর কাজ ছিল বিকালে। খুব সকালে রওনা হওয়ায় তাহার বেশি বেলা হইবার আগেই কলিকাতা পৌঁছিয়াছিল। ট্রামে করিয়া অপু এসপ্লানেডে আসিয়া নামিয়া বলিল—এইটুকু চল হেঁটে যাই। কেমন দেখতে দেখতে যাওয়া যাবে।

যাদুঘরে ঢুকিতেই কাজলের সেই অদ্ভুত ভাবটা হইল—যাহা সে কিছুতেই কাহাকেও বুঝাইয়া উঠিতে পারে না। মাথার মধ্যে কেমন একটা ঝিম-ঝিম ভাব। যাদুঘরের একটা নিজস্ব গন্ধ আছে, তাহা কাজলকে পুরানো দিনের কথা মনে করাইয়া দেয়। নিজের জীবনের কথা নহে, বাবার কাছে শোনা ইতিহাসের কথা—মানব-সৃষ্টির আগেকার পৃথিবীর কথা। সমস্ত আবেদনটা সে ঠিক ধরিতে পারে না। কিন্তু তাহার মনে হয়, এই জীবনের বাহিরে আর একটা বৃহত্তর জীবন তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে।

সারাদিন ভারী আনন্দে কাটিল। প্রাচীন স্তূপ হইতে গুহামানবের মাথার খুলি পর্যন্ত সব-কিছুই কাজলের কাছে সমান আকর্ষণীয়। প্রাচীন জীবজন্তুর কঙ্কালগুলি যে ঘরে আছে, সে ঘর ছাড়িয়া কাজল আর নড়িতে চায় না। উল্কাপিণ্ডটার সামনে দাঁড়াইয়া উত্তেজনায় তাহার চোখ কোটর হইতে বাহির হইয়া পড়ে আর কি। ফসিলের ঘরে সে অপুকে জিজ্ঞাসা করে—তুমি যে বলেছিলে পলিমাটিতে তারামাছের ফসিল আছে, সে কই বাবা?

এ সমস্ত অত্যন্ত পক্কতার লক্ষণ সন্দেহ নাই—অপু কাজলকে এইভাবেই মানুষ করিয়াছিল। এই বয়সে অন্যরা যাদুঘরে গিয়া মুগ্ধ বিস্ময়ে চতুর্দিক একবার দেখিয়া আসে মাত্র। কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে ঘুরিয়া পা ব্যথা করিয়া বেতের ঝুড়িতে-আনা জলখাবার খাইয়া মা-বাবার সহিত বাড়ি ফিরিয়া যায়। কিন্তু কাজল বুঝিতে চায়, কাজল অনুভব করে।

বিকালে যাদুঘর বন্ধ হইবার সময় অপু বলিল—চল, এবার আমার কাজটা সেরে আসি। বই-এর দোকানের দিকে যেতে হবে।

প্রকাশকের কাছে কিছু টাকা পাওনা ছিল। দোকানে ঢুকিতেই মালিক হাসিয়া বলিল—আসুন অপূর্ববাবু, বসুন। এবার তো অনেক অনেক দিন বাদে এলেন। আপনার ও-বইটার স্টক প্রায় শেষ। নতুন এডিশন সম্বন্ধে একটু কথাবার্তা বলে নিতে হয়। এটি কে? ছেলে? বাঃ, বেশ বেশ।

অপুর এ সব আজ ভাল লাগিতেছিল না। সকালে খুব আনন্দ করিয়া বাহির হইয়াছিল বটে, কিন্তু দুপুরের পর হইতেই শরীরটা ভাল বোধ হইতেছিল না। বুকের কাছটায় কেমন একটা ব্যথা-ব্যথা ভাব। এখন আবার নতুন এডিশন সম্বন্ধে বাক্যালাপের ঝামেলা আসিয়া জুটিল।

সমস্ত কথা মিটিতে প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় লাগিল। অপুর মাথা ঘুরিতেছিল। বুকের যন্ত্রণাটাও বেশ বাড়িয়াছে! কেন যে হঠাৎ এমন হইল, বোঝা যাইতেছে না। শরীর লইয়া পূর্বে সে কখনো

চিন্তায় পড়ে নাই। দোকান হইতে বাহির হইয়া সে কাজলের হাত ধরিয়া রাস্তা পার হইবার জন্য ফুটপাথ হইতে পিচের রাস্তায় নামিতে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীটা যেন তাহার পায়ের নিচু হইতে সরিয়া যাইতে লাগিল হু-হু করিয়া। সে যতই পা নামাইতেছে, পা আর রাস্তায় ঠেকিতেছে না। ফুটপাথ হইতে রাস্তা এত নিচু? পরক্ষণেই বুকের বেদনাটা বাড়িয়া উঠিল। মাটিতে পড়িতে পড়িতে সে হাত বাড়াইয়া কাজলকে ধরিতে গেল। কাজল যেন অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে, তাহাকে আর ধরা যাইতেছে না। সব দূরে সরিয়া গিয়াছে। সে একটা অন্ধকার অতল গহ্বরের মধ্যে পড়িতেছে।

প্রকাশক ভদ্রলোক দোকান হইতে ছুটিয়া আসিলেন, রাস্তায় লোক জমা হইয়া গেল। কাজলের হাত-পা কেমন ঝিমঝিম করিতেছিল। ঘটনার আকস্মিকতায় সে হতবুদ্ধি হইয়া সাহায্যকারীদের মুখের দিকে কয়েকবার তাকাইয়া দেখিল মাত্র। বাবা পড়িয়া গিয়াছে —ব্যাপারটা তাহার বিশ্বাস হইতেছিল না। তাহার কাছে বাবা সর্বশক্তিমান, বাবার ক্ষমতা অপ্রতিরোধ্য। বাবাকে মাটিতে পড়িতে দেখিয়া কাজলের সমস্ত হৃদয় আতঙ্কে সংকুচিত হইয়া আসিল। অপুকে উহারা ধরাধরি করিয়া দোকানের ভিতর তুলিয়া আনিল। কাজলকে কেহ ডাকিল না। সে নিজেই আস্তে আস্তে হাঁটিয়া সবার পিছন পিছন দোকানে ঢুকিয়া দেখিল, তাহার বাবাকে একটা বেঞ্চির উপর শোয়াইয়া জলের ছিটা দিয়া বাতাস করা হইতেছে। কাঠের একটা টেবিলে হেলান দিয়ে সে ভাবিবার চেষ্টা করিল, বাবার কিছুই হয় নাই—ঘটনাটা একটা দুঃস্বপ্ন।

মিনিট কুড়ি বাদে অপু তাকাইল। সে চিত হইয়া শুইয়া আছে, ওপরে যেন কালো কড়িকাঠ, চারপাশে লোকের কণ্ঠস্বর। বুকে কাহারা একটা ওজন চাপাইয়া দিয়াছে যেন। এটা কোন জায়গা? সে এখানে শুইয়া কেন?

একটু বাদেই সমস্ত কিছু মনে পড়িতে সে আচ্ছন্নের মতো হাত বাড়াইয়া বলিল—খোকা কোথায় গেল? খোকা?

অপু ডাক্তার দেখাইতে গিয়াছিল। ডাক্তারবাবু চশমাটা নাকের উপর ঠিক ভাবে আঁটিয়া লইয়া বলিলেন—আসল কথা এই, বাংলাদেশের হিউমিড আবহাওয়া আপনার স্যুট করছে না। আপনি কিছুদিন বাংলার বাইরে থেকে দেখুন তো। মনে হয়, একটু সুস্থ হবেন।

কথাটা অপুর বেশ মনে ধরিল। মধ্যপ্রদেশে সে যে কয়েক বৎসর কাটাইয়াছে, সে সময় তাহার অসুখবিসুখ তেমন কিছু হয় নাই। প্রচণ্ড উল্লাসে হৈ হৈ করিয়া প্রায় একটা বন্য-জীবনযাপন করিয়াছে। বিহারের দিকে কোথাও গিয়া থাকিলে মন্দ হয় না।

রাত্রে শুইয়া একদিন সে হৈমন্তীর সঙ্গে পরামর্শ করিল। হৈমন্তী কিছুটা অবাক হইয়া বলিল—নিশ্চিন্দিপুর ছেড়ে চলে যাবে। অন্য কোথাও ভাল লাগবে তোমার ?

—একেবারে যাব না হৈমন্তী। আমাদের গাঁ ছেড়ে পৃথিবীতে কোথাও গিয়ে শান্তি পাব না। এ বাড়িও রইল, ইচ্ছে হলেই চলে আসব।

আসল কথা, অপুর রক্তে ভবঘুরেমি আবার জাগিয়া উঠিতেছে। স্থবিরতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতেছে—অসুখের জন্যই সে যাইতেছে এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নহে। এক জায়গায় সমস্ত জীবন কাটানো তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। এ তাহার পূর্বপুরুষদের নিকট হইতে প্রাপ্ত। তাঁহাদের ভবঘুরে রক্ত তাহাকেও স্থির থাকিতে দিতেছে না। সে যাইবে, আমৃত্যু সে পৃথিবীর ধুলিতে পা ডুবাইয়া হাঁটিবে।

সামান্য সময়ের ভিতরেই অপু কিছু টাকা যোগাড় করিয়া ফেলিল। সবাই তাহাকে অগ্রিম টাকা দেয়, তাহার বই পাইবার জন্য হাঁটাহাটি করে। সকাল দুপুরে বিকালে প্রচুর চিঠি আসে—পাঠকেরা মুগ্ধ হইয়া লিখিতেছে। অপু সবার চিঠির উত্তর দেয়, সামান্য এক লাইনে লিখিলেও। প্রত্যেককে দীর্ঘ চিঠি দেওয়া সম্ভব নহে।

জীবন কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। আর কি প্রত্যাশা করিবার আছে? সে অর্থ পাইতেছে এবং নাম করিয়াছে এটাই বড় কথা নহে—সে দু-চোখ ভারিয়া প্রাণ ভরিয়া জগৎটা দেখিয়া লইয়াছে। আরও দেখিবে। সে থামিবে না। গার্হস্থ্য জীবন তাহার কপালে লেখা নাই।

টাকা আনিতে প্রকাশকের কাছে গিয়া একদিন জিজ্ঞাসা করিল—আপনার সন্ধানে কোন ভাল জায়গা আছে বিহারের দিকে? ভাবছি কিছুদিন ওদিকে থাকবো—

প্রকাশক হাসিয়া বলিলেন—আপনার ঘোরা বাতিকটা আর গেল না। হ্যাঁ, জায়গার খোঁজ দিতে পারি। অল্প কয়েকদিন থাকবেন, না—

—ভাবছি একটা ছোটমতো বাড়ি পেলে কিনে নিতাম।

অপুকে তিনি একটি জায়গার কথা বলিলেন, কলিকাতা হইতে খুব দূরে নহে, জামসেদপুরের কাছাকাছি। হাওড়া হইতে ট্রেনে মাত্র ঘণ্টা পাঁচেক লাগে। পাহাড়ী এলাকা—অপুর বেশ ভাল লাগিবে। তিনি বারবার একথা বলিতে লাগিলেন।

—জঙ্গল আছে? প্রাকৃতিক দৃশ্য কেমন?

—খুব ভালো। সে আপনি নিজের চোখে দেখবেন। আপনাকে তো চিনি। ভাল না হলে আপনার কাছে ও-জায়গার নাম করি কখনো!

অপু আরও দু'পাঁচ জনকে জিজ্ঞাসা করিল। অনেকেই বিশেষ কোন খবর দিতে পারিল না। কেবল দুইজন লোক, যাদের কথায় অপু মূল্য দেয়, জায়গাটার সম্বন্ধে প্রশংসা করিল।

প্রকাশকই খোঁজ করিয়া একটা বাড়ি বাহির করিলেন এবং অপু বিশেষ দেরী না করিয়া বাড়িটা কিনিয়া ফেলিল। কিনিবার জন্ম সে নিজে যায় নাই, বাড়ির ছবি দেখিয়াছিল মাত্র। টালির ছাদওয়ালা ছোট সুন্দর বাড়ি। পাশে দুইটা ইউক্যালিপটাস গাছ পাশাপাশি যমজ ভাইয়ের মতো উঠিয়াছে। বহু পিছনে একটা পাহাড় দেখা যায়। ছবিতে একটা রহস্যের ভাব ফুটিয়াছিল—বিশেষতঃ পিছনের পাহাড়টা অপুকে আকর্ষণ করিল। ছবিটা প্রকাশককে ফেরত দিয়া সে বলিল—আমি আর দেখতে যাবো না। আপনার ওপর সম্পূর্ণ ভরসা করেই কিনছি। আপনি লোক পাঠিয়ে দিন টাকা সঙ্গে দিয়ে। দলিলপত্রে আমি একেবারে গিয়ে সই করব।

রাত্রে শুইয়া অপু বলিল—খোকা, তুই পাহাড় তো দেখিস নি? এবার দেখবি'খন।

কাজল পাহাড় দেখে নাই। বাবার কাছে শুইয়া সে মনে মনে জিনিসটা সম্বন্ধে একটা ধারণা করিবার চেষ্টা করে। চড়কতলার ডাইনে যে মাটির উঁচু ঢিবিটা আছে, অনেকটা সেইরূপ কি?

—সেখানে নদী নেই বাবা?

—আছে, নাম কি জানিস?

—কি বাবা?

—সুবর্ণরেখা।

নামটা তাহার পছন্দ হয়। সুবর্ণরেখা। এক-নিশ্বাসে বলিবার মতো নাম। সাঁই করিয়া একবার তলোয়ার ঘুরাইবার মতো। কত নূতন জিনিস সে দেখিবে—পাহাড়, শালবন, সুবর্ণরেখা। সুবর্ণরেখা মিষ্টি নাম, সুন্দর নাম।

সুবর্ণরেখা—সু-ব-র্ণ রেখা—নামটা কাজলকে ঘুম পাড়াইয়া ফেলে।

কাজল ঘুমাইলে অপু বলিল—ঠিক বুঝতে পারছিনে হৈমন্তী, কাজটা ভাল হল কিনা। সবে এসে নিশ্চিন্দিপুরে বসতে না বসতেই আবার রওনা দেওয়া—অবশ্য ডাক্তার বলল যেতে, তবু—

হৈমন্তী একটু ভাবিয়া বলিল—না, চলো কিছুদিন থেকেই দেখি

তোমার শরীরটা সারে কিনা। এই ভালো, এ জায়গায় না থেকে, বেশ ঘুরে ঘুরে বেড়ানো। ও-রকম শেকড় গেড়ে সংসার গড়তে আমিও ভালবাসিনে।

কাজলের ষান্মাসিক পরীক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছে; অপু ঠিক করিয়াছে এখন বিহারের নতুন বাড়িতে যাইবে না, কাজলের বাৎসরিক পরীক্ষা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিবে। নতুন জায়গায় একেবারে নতুন শ্রেণীতে ছেলেকে ভর্তি করিবে। এখন গেলে কাজলের একটা বৎসর নষ্ট হয়।

পরীক্ষার পর কাজল বেশ মজায় আছে। পড়ার চাপ কমিয়াছে। সারাদিন সে ঘুরিয়া কাটাইতেছে। বনজঙ্গল ভাঙিয়া মাঝে মাঝে চলিয়া যায় পাশের গ্রামে।

একদিন কাজল বেড়াইতে বেড়াইতে একটা বাড়ির উঠানে গিয়া হাজির হইল। বেশ সুন্দর ঝকঝকে বাড়ি, উঠানের ধানের গোলা, সিঁদুর দিয়া তাহাতে মঙ্গলচিহ্ন আঁকা। কয়েকটা ছেলে ছোটাছুটি করিতেছে। গোয়ালে একটা গরু বাছুরের গা চাটিতেছে। উঠানে ক্রীড়ারত চারিটি কুকুর-ছানা। সে মুগ্ধনয়নে হৃষ্টপুষ্ট বাচ্চাগুলির খেলা দেখিতেছিল। এমন সময় একটি ছেলে আসিয়া তাহার সামনে দাঁড়াইল।

--কি দেখছ?

সে আমতা আমতা করিয়া বলিল—না, এই—মানে—ঐ বাচ্চাগুলো বেশ সুন্দর কিনা, তাই—

—তুমি নেবে একটা?

অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের সম্মুখীন হইয়া কাজল প্রথমটা কিছু বলিতে পারিল না। পরে বলিল--একেবারে দিয়ে দেবে? তোমার তোমার বাড়ির লোক কিছু বলবে না?

—দূর। আরও তো তিনটে রইল—তুমি একটা নাও।

প্রথমে কাজল ধরিতে ভয় পাইতেছিল। পরে গায়ে হাত বুলাইয়া বুঝিল তাহারা নিতান্তই নিরীহ।

একটা বাচ্চা বগলদাবা করিয়া দ্রুত সে স্থানত্যাগ করিল। প্রতি মুহূর্তে ভয় হইতেছিল, পেছন হইতে ছেলেটি ডাকিয়া বলিবে—না ভাই, বাচ্চা দেবো না। তুমি রেখে যাও।

দ্রুত বড় মাঠটা পার হইয়া কাজল নিশ্চিন্দিপুরে ঢুকিল।

হৈমন্তী রাগ করিয়া বলিল—এঃ, এটা আবার কোত্থেকে জুটিয়ে আনলি, নেড়ীর বাচ্চা—

হাত-পা নাড়িয়া কাজল দুর্বল জীবের পক্ষে অনেক ওকালতি করিল। অবশেষে অনুমতি মিলিল। এবারে বাচ্চাকে তো কিছু খাওয়ানো প্রয়োজন। কুকুরের বাচ্চা কি খায়, এ সম্বন্ধে ধারণা না থাকায় হৈমন্তীর কাছে আবার গিয়া দাঁড়াইতে হইল।

—মা!

—কি রে?

—ওটাকে কি খেতে দিই এখন?

রাগ করিতে গিয়া হৈমন্তী হাসিয়া ফেলিল। ছেলেকে কাছে টানিয়া লইয়া বলিল—বড্ড বাচ্চা যে, দুধ ছাড়া কি অন্য কিছু খেতে পারবে? তুই বরং রান্নাঘরের কড়া থেকে খানিকটা দুধ নারকোলের মালায় নিয়ে খাওয়াগে!

খাদ্যের প্রতি বাচ্চাটার একটা দার্শনিকসুলভ নিস্পৃহতা। কাজল জোর করিয়া দুধের মধ্যে মুখ ডুবাইয়া দিলে নাকের মধ্যে দুধ ঢুকিয়া হাঁচিয়া সে অস্থির হইল। এক-মালা দুধ খাওয়াইতে বেলা গড়াইয়া অন্ধকার নামিল।

দুই-তিন দিনের মধ্যে কুকুরছানা নূতন জায়গায় অভ্যস্ত হইয়া আসিল। কাজল বাবাকে বলিয়াছে কলিকাতা হইতে কুকুরের গলার চেন আনিয়া দিতে। চেন গলায় দিয়া সকাল-বিকাল কাজল তাহাকে লইয়া গ্রাম পরিক্রমা করিবে ওয়াইড-ওয়ার্লড ম্যাগাজিনে কুকুরের বীরত্ব সম্বন্ধে ভাল ভাল গল্প ছাপা হয়—বাবার কাছে কাজল অনেক গল্প শুনিয়াছে। সে-ও ইহাকে সুশিক্ষিত করিয়া বীরত্ব অভিযানের সঙ্গী করিবে

কুকুরের নাম রাখা হইল—কালু। সাতদিনের মধ্যেই কালু কাজলের পরমভক্ত হইয়া উঠিল। কাজল নিজে আসিয়া খাইতে না দিলে খায় না—সর্বদা কাজলের পেছনে পেছনে ঘোরে। বেশ ভাল চলিতেছিল, কিন্তু মাসখানেক বাদে হঠাৎ কালুর কি অসুখ করিল। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঝিমায়, খাওয়া দাওয়া একদম ছাড়িয়া দিয়াছে। প্রথমে কাজল আমল দেয় নাই, পরে দেখিল কালুর উঠিবার ক্ষমতা লুপ্ত হইয়াছে। তিনদিন আগেও লাফালাফি করিয়া বেড়াইয়াছে, ইদানীং সর্বক্ষণ শুইয়া থাকে। কাজলের সাড়া পাইলে অতিকষ্টে একবার মাথা তুলিয়া তাকায়! অশক্ত ঘাড়ের উপর মাথাটা কাঁপে, কিছুক্ষণ বাদে আবার চটের উপর পড়িয়া যায়।

অপু দেখিয়া বলিল—আহা রে! কালু বোধ হয় আর বাঁচবে না।

সারাটা বিকাল ধরিয়া কালু অস্পষ্ট আর্তনাদ করিল, রাত্রি বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে কাতর গোঙানি। কালু মারা যাইতেছে কালু ভীষণ কষ্ট পাইতেছে, অথচ কাজলের কিছুই করিবার নাই। চাপা গোঙানী তাহাকে কিছুতেই ঘুমাইতে দিল না। রাত্রে মার বুকের কাছে তাহার মনে হইল, তাহার অসুখ করিলে মা-বাবা ব্যস্ত হইয়া সেবা করে—আর বেচারা কালু অন্ধকারের ভিতর একা একা কষ্ট পাইয়া মরিতেছে।

কাজল ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

হৈমন্তী তাহাকে কাছে টানিয়া বলিল—কাঁদতে নেই মাণিক আমার। ছিঃ—

আদরের কথা শুনিয়া কান্নাটা আরও বাড়িল। অশ্রুরুদ্ধ-কণ্ঠে কাজল বলিল—কালু কত কষ্ট পাচ্ছে, অন্ধকারের মধ্যে রয়েছে—

হৈমন্তী তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—একা কোথায় পাগলা। ওর কাছে ঠিক ভগবান এসে বসে আছেন জানিস। যারা কষ্ট পেয়ে মারা যায়, তাদের আত্মাকে ভগবান নিজের হাতে স্বর্গে নিয়ে যান। ঠিক ওর পাশে ভগবান এসে বসেছেন—

কাজলের দুঃখের বেগটা একটু কমিয়া আসিল। এ ভাবে সে কখনো ভাবিয়া দেখে নাই। একথা যদি সত্য হয়, তবে দুঃখের কিছুই নাই। ভগবান যদি আসিয়া থাকেন—তবে ভালই তো। কাজল স্পষ্ট দেখিল, কালুর পাশে এক জ্যোতির্ময়দেহ বিশাল পুরুষ —উন্নতললাট, দীপ্তনয়ন। তাঁর হাতে পৃথিবী শাসনের স্বর্ণদণ্ড। তিনি আসিয়াছেন ক্লিষ্ট আত্মাকে স্বহস্তে স্বর্গে লইয়া যাইবার জন্য।

সুবর্ণরেখা।
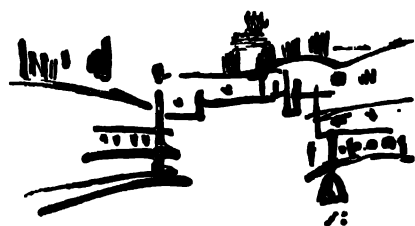
বালির চর বুকে করিয়া নদীটা সারাদিন পড়িয়া থাকে। স্বল্প জল এখানে-ওখানে বালির মধ্য দিয়া বহিয়া যায়। নদীর মাঝখানে বড় বড় কালো পাথরের চাঁই প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর মত পড়িয়া আছে। উপরের প্রখর নীল আকাশ ধূসর দিগন্তের সহিত একটা অদ্ভুত বৈষম্য সৃষ্টি করিয়াছে। মাটির রঙ লাল। জমি সর্বত্র উঁচুনিচু। স্থানটিতে কেমন একটা বৈরাগ্যের ভাব আছে, মাটির গৈরিক রঙটির মত।

মৌপাহাড়ীতে লোকজন কম। দিনের বেলায় মনে হয় কিসের উপলক্ষে যেন ছুটি হইয়া গিয়াছে—সবাই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সন্ধ্যার সময় একটা কালো চাদর ক্রমশঃ সবকিছু ঢাকিয়া ফেলে। ঝিঁঝি এবং অন্যান্য পতঙ্গের ডাকের মধ্য দিয়া রাত্রি মৌপাহাড়ীকে গ্রাস করিয়া লয়।

অপু ইহার ভিতরে কি-একটা যেন খুঁজিয়া পাইয়াছে। মানুষের সঙ্গ—কেবল কাজল এবং হৈমন্তী ছাড়া—তাহার কাছে আর কাম্য নহে। বইখাতা বগলে দিনের প্রায় সময়টাই সে বাহিরে ঘুরিয়া কাটায়। নদীর ধারে একখানি বড় পাথরের উপর বসিয়া সে লেখে। জীবনকে সে অলসভাবে একদিক হইতে দেখে নাই। তাহার দেখা বিচিত্র জীবনের কথা সে আগামী যুগের জন্য রাখিয়া যাইবে। লিখিতে লিখিতে কখনো মুখ তুলিয়া দেখে সামনে সুবর্ণরেখার বিস্তৃত বক্ষ, ওপারে প্রান্তরের গৈরিক প্রসার। পড়ন্ত

সূর্যালোকে নদীর বালির মধ্যে মিশ্রিত অভ্রকণা চিক্ চিক্ করিতেছে। আকাশে-বাতাসে কিসের একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত অপুকে বিচলিত করে। কি-একটা এখনই করিতে হইবে, কি একটা করিবার আছে—কিন্তু কিছুতেই করা হইতেছে না। শরীরের মধ্যে একটা বিচলিত ভাব বাড়িয়া ওঠে। মনে হয়, সবটাই বাকি রহিল, নির্দিষ্ট কাজের ভগ্নাংশও করা হইল না। যাহা জানিবার ছিল, তাহার কণামাত্রের আস্বাদন হইল মাত্র।

শরীর লইয়া অপু খুবই বিব্রত। নিশ্চিন্দিপুর ছাড়িয়া আসার পর মৌপাহাড়ীতে তিন-চার বৎসর কাটিল, কিন্তু স্বাস্থ্যের খুব-একটা উন্নতি হয় নাই। প্রায়ই বুকে একটা যন্ত্রণা হয়। মাথা ভার ঠেকে, অম্বল হয়। এ সব কথা সে কাহাকেও বলে না। অসুখ গা-সহা হইয়াছে। সন্ধ্যা ঘনাইলে লেখা বন্ধ করিয়া নক্ষত্রের আলোয় বাড়ি ফিরিতে ফিরিতে হঠাৎ ছোট টিলাটার গা ঘেঁষিয়া বিশাল বৃহস্পতি গ্রহটাকে উঠিতে দেখিয়া তাহার অসুখের কথা বিস্মরণ হইয়া যায়। সেতারের জলদের মত জীবনটা কাহার হাতের স্পর্শে যেন বাজিতেছে। কিসের স্পর্শে যেন জীবনের রঙ বদলাইতেছে, সুরের পরিবর্তন ঘটিতেছে।

সুবর্ণরেখার ধারে বসিয়া সময় কাটাইতে কাটাইতে অপু নদীর সঙ্গে নিজের মিল খুঁজিয়া পায়। একা থাকিলেও মনে হয় না, সে একা আছে। কাহার উপস্থিতি যেন রহিয়াছে আশেপাশে, অনুভব করা যায় কেহ পেছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, চোখ ফিরাইলে সরিয়া যায় দূরে।

একদিন একটা কাণ্ড ঘটিল। অপু বসিয়া লিখিতেছে, একটা প্রজাপতি আসিয়া বসিল তাহার খাতার পাতায়। সে হাত বাড়াইয়া ধরিতে গেলে সেটা উড়িয়া একটু দূরে একটা পুটুস গাছের উপর বসিল। অপুর হঠাৎ কেমন মনে হইল, সুন্দর প্রজাপতিটাকে ধরিতেই হইবে। এক টুকরা পাথর খাতার উপর চাপা দিয়া উঠিল।

প্রজাপতিটা ধরা গেল না। গাঢ় লাল আর বাদামি ডানাওয়ালা পতঙ্গ তাহাকে দূর হইতে দূরে লইয়া গেল। এক ঝোপ হইতে

অন্য ঝোপ করিতে করিতে অপু আচ্ছন্নের মতো দৌড়াইল। বাতাস অপুর চুল অবিন্যস্ত করিয়া দিল, তাহার ধুতিতে চোরকাঁটা লাগিয়া গেল। পাথরে লাগিয়া পায়ের এক জায়গা কাটিয়াও গেল, কিন্তু প্রজাপতি পাওয়া গেল না।

মাইলখানেক দৌড়াদৌড়ি করিয়া অপু নিজের বসিবার জায়গায় ফিরিয়া আসিল। পাথরের উপর রাখা খাতার পাতা বাতাসে অল্প অল্প উড়িতেছে, চাপা আছে বলিয়া একেবারে উড়িয়া যায় নাই।

অপু পাথরটার এককোণে বসিয়া শূন্য দৃষ্টিতে সুবর্ণরেখার দিকে তাকাইয়া রহিল।

বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে কাজলের দুষ্টামি কমিয়াছে। আগের মত লাফালাফি করিতে আর ভালবাসে না। মৌপাহাড়ীতে তাহার সমবয়সী কম। সমবয়সীদের সঙ্গে কখনই তাহার বন্ধুত্ব গড়িয়া ওঠে নাই। বয়সে যাহারা অনেক বড়, তাহাদের সঙ্গেই বরঞ্চ কাজলের জমে ভাল।

একদিন কয়েকটা ছেলে মিলিয়া মাইল তিনেক দূরের একটা পাহাড়ে বেড়াইতে গিয়াছিল। কাজলের মনে হইয়াছিল, ছেলেগুলি এক একটি আস্ত বর্বর। ঢিল কুড়াইয়া ভীষণ জোরে ছুঁড়িতেছে, লাফাইতেছে, চীৎকার করিতেছে, নিজেদের মধ্যে তুচ্ছ কারণে মারামারি করিতেছে। অথচ চারিপাশে কেমন সুন্দর পাহাড়ী পরিবেশ। নির্জন স্থানে স্তব্ধতা খাঁ খাঁ করিতেছে। মাঝে মাঝে বাসায়-ফেরা কি-এক ধরনের পাখী মাথার উপর দিয়া মধুর সুরে ডাকিয়া যাইতেছে। সব মিলাইয়া বেশ ঘনিষ্ঠ আনন্দময় পরিবেশ। ছেলেরা এসব মোটে বুঝিতেছে না। কাজল ক্রমশঃ বিরক্ত হইয়া উঠিল, বড় গোলমাল করে ইহারা। তাহার মনের সঙ্গে ইহাদের কোন যোগাযোগ নাই। থামাইবার জন্য সে কিছুদিন আগে-পড়া একটা গল্প বলিতে শুরু করিল, কিন্তু সে গল্পে কেহ উৎসাহ পাইল না।

ধীরে ধীরে, অল্প বয়সেই, কাজলের ভিতর একটা বোধ জাগিয়া উঠিতেছিল, তাহার সহিত অন্যের মনের মিল হয় না—হইবে না।

একটু বয়স হওয়ায় সে বাবাকে চিনিতে পারিতেছে। বাবার কেমন একটা আলাদা অস্তিত্ব আছে, সে বুঝিতে পারে। সেটা বাবার সাংসারিক অস্তিত্ব নহে—অন্য কিছু। সব-কিছুর ভিতরে থাকিয়াও বাবা সব-কিছু হইতে আলাদা। একদিন বাবাকে বড় অদ্ভুত লাগিয়াছিল। বেড়াইতে যাইবে বলিয়া বাহির হইতে গিয়া সে দেখিল, বাবা উঠানের প্রান্তে ইউক্যালিপটাস গাছটার নীচে সতরঞ্চি পাতিয়া বসিয়া লিখিতেছে। হয়তো কিছু মনে আসিতেছে না, কোন উপযুক্ত শব্দ খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না, তাই বাবা কলমটা হাতে ধরিয়া উদাস ভাবে দূরে তাকাইয়া আছে। ডানদিকের কাঁধটা একটু নিচু দেখাইতেছে। ফর্সা ঋজু দেহ বাবার। হঠাৎ বাবার জন্য ভীষণ মায়া হইল, ভীষণ—ভীষণ ইচ্ছা হইল বাবার কোলের কাছে গিয়া মুখ গুঁজিয়া থাকে। শরীরের ভিতরের প্রতি শিরায় সে পিতার প্রতি ভালবাসার স্রোত অনুভব করিল। বাবার শরীর মোটে ভাল যাইতেছে না—বাবা কাহাকেও বলে না, কিন্তু কাজল জানে।

•

হৈমন্তীর বাবা সুরপতি বাবু একদিন মৌপাহাড়ীতে আসিয়া হাজির হইলেন। কি কাজে জামসেদপুর আসিয়াছিলেন—পথে মৌপাহাড়ী ঘুরিয়া যাইতেছেন।

হৈমন্তী দৌড়াইয়া আসিয়া প্রণাম করিল। অপু ব্যস্ত হইয়া পড়িল খাওয়াইবার আয়োজনের জন্য। কাজল একটু থতমত খাইয়াছিল, কিন্তু লজ্জা কাটিয়া গেলে দেখিল দাদু খুব ভালমানুষ। কাজলকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, আজকে সারাদিন আমি তোমার সঙ্গে গল্প করব দাদু—কেমন ?

হৈমন্তী বলিল—তুমি দু'একদিন থাকবে তো বাবা ?

—না, মা, সময় নেই হাতে একদম। পরের কাজে আসা—

আপত্তি টিকিল না। দুইদিন থাকিয়া যাইতে হইল। সারাদিন কাজল আর দাদুর গল্প চলিত, অপু যোগ দিতে পারিত না। সে একখানি বড় উপন্যাস লিখিতেছে। সন্ধ্যায় উঠানে সতরঞ্চি পাতিয়া বসিয়া অপু শ্বশুর মহাশয়ের সহিত কথাবার্তা বলিত। সুরপতি বাবু জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ লোক। জীবনের তিক্ত এবং মধুর দুই দিকের সহিতই নিবিড় পরিচয় আছে। পরলোকে অত্যন্ত বিশ্বাসী। সন্ধ্যায় পরলোক লইয়া অপুর সহিত কথা হইল।

দুইদিনের বেশি সুরপতি বাবু থাকিতে পারিলেন না। যাইবার সময় অপুকে শরীরের প্রতি বিশেষ যত্ন লইতে বারবার বলিয়া গেলেন। হৈমন্তীকে আড়ালে ডাকিয়া বলিলেন—তোর কপাল ভাল হৈম যে, এমন স্বামী পেয়েছিস। জামাই সত্যিই বড়ো ভাল—এমন মানুষ দেখা যায় না। কাজলকে গোপনে দুইটি টাকা দিয়া তিনি ছাতা-ব্যাগসহ রওয়ানা হইলেন। অপু তাঁহাকে ট্রেনে তুলিয়া দিতে গেল। ট্রেনে তুলিয়া দিয়া ফিরিবার সময় অপুর বুকে কেমন একটা যন্ত্রণা বোধ হইল। বাঁদিকে একটা চিনচিনে ব্যথা, কমিতেছে না! বুকে হাত দিয়া অপু কিছুক্ষণ বসিল—কিছু হইল না। মাথাটা বেশ ঘুরিতেছে। অপু ঠিক করিল, ডাক্তারের কাছে একবার ঘুরিয়া যাইবে।

স্থানীয় ডাক্তার বিশ্বনাথ সোম অপুকে দেখেন—ডিসপেনসারিতে ঢুকিতেই তিনি অপুর মুখ দেখিয়া অবাক হইয়া বলিলেন—কি হয়েছে অপূর্ব বাবু? বসুন, ঐ চেয়ারটাতে—হ্যাঁ—

যন্ত্রণা বাড়িতেছিল। মাথার মধ্যে যেন ঝিমঝিম বাজনা। বিশ্বনাথ বাবু নাড়ি দেখিয়া কমপাউণ্ডারকে ডাকিলেন—সুরেন, মেজার গ্লাসে পনেরো ড্রপ কোরামিন চট করে নিয়ে এসো।

কোরামিন খাইয়া অপু একটু সুস্থ বোধ করিল। বিশ্বনাথ বাবু প্রেসার লইলেন। খুব হাই।

—কিছুদিন বিশ্রাম নিন। এ রকম বারবার হওয়াটা তো ভালো নয় রায় মশায়। খাওয়াদাওয়া নিয়মমাফিক—আমাকে প্রাত হপ্তায় একবার করে দেখিয়ে যাবেন।

অপু বাহিরে আসিল। রাস্তায় লোক কম। মাথার ভিতরটা এখনও পুরোপুরি পরিষ্কার হয় নাই। একটু হাঁটিলেই মনে হইতেছে, আবার মাথা ঘুরিয়া উঠিবে। ডাক্তার বিশ্রাম লইতে বলিয়াছে, এইবার তাহাকে বিশ্রাম লইতে হইবে। একটা উপন্যাস সে লিখিতেছে, শেষ হওয়ার পূর্বে বিশ্রাম নাই। উপন্যাসটা শেষ করিয়া তবে ছুটি।

ক্লান্ত শরীর—সামনে একটি উপন্যাস লিখিবার পরিশ্রম। হঠাৎ অপুর নিকট 'ছুটি' শব্দটা অত্যন্ত তৃপ্তিদায়ক বোধ হইল।

কলিকাতা হইতে প্রকাশকের পত্র আসিল, লেখাটা তাহাদের শীঘ্র প্রয়োজন। দেরী করিলে আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা।

সকালে জলখাবার খাইয়া অপু লেখা শুরু করে, দুপুরে খাইবার সময়টা বাদ দিয়া সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত ক্রমাগত লেখে। সন্ধ্যায় ক্লান্ত দেহে একটু নদীর দিকে বেড়াইতে যায়। ফিরিয়া আসিয়াই আবার রাত্রি বারোটা পর্যন্ত লেখে। শরীরের উপর অত্যন্ত অত্যাচার হইতেছে। উপন্যাসটি অপু হৃদয় উজাড় করিয়া লিখিবে। অপরিণত বয়সের ভাবাবেশ আর নাই—এখন জীবন-সত্য উপলব্ধি করিবার সময়।

কোন সময় লিখিতে লিখিতে মাথা একেবারে ফাঁকা হইয়া যায়, হাত-পা অবশ হইয়া আসে। কলমটা টেবিলে নামাইয়া অপু অনুভব করে, শরীর ভাঙিয়া আসিতেছে—আচ্ছন্নের মত সে কাজ করিয়া যাইতেছে। কিছুটা লোভে-লোভে বটে। কাজটা শেষ হইলে আপাতত ছুটি।

হৈমন্তী আসিয়া বলে—রেখে দাও তো। এরকম খাটলে শরীর দুদিনে ভেঙে পড়বে। শোবে চলো।

অপু চুলের ভিতর হাত চালাইতে চালাইতে বলে—আর একটু, চ্যাপ্টারটা শেষ করে ফেলি।

হৈমন্তী বুঝাইয়া পারে না।

একদিন অপু টেবিলেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। হাত হইতে

কলম খসিয়া পড়িয়াছিল। খাতার উপর মাথা রাখিয়া অপু স্বপ্ন দেখিতেছিল। মধ্যপ্রদেশের সেই বন্য জীবনটা আবার ফিরিয়াছে। সে তেজী ঘোড়ায় সওয়ার হইয়া আদিগন্ত হাটুসমান জঙ্গলে তীব্রবেগে ভ্রমণ করিতেছে। কালপুরুষ পশ্চিম দিগন্ত ছুঁই-ছুঁই করিয়াছে। বাতাসে সেই সজীব ভাবটা।

বাধা দিবার কেহ নাই—মহাশূন্যে গাঢ় অন্ধকারে ভীমবেগে ধাবমান উল্কার মত জীবন, আবার ফিরিয়াছে। চিন্তা নাই, দুঃখ নাই, ক্ষোভ নাই। স্বপ্নের মধ্যেই সব পাইবার তৃপ্তি তাহাকে আচ্ছন্ন করিতেছে। খুব জোরে ঘোড়া ছুটাইয়াছে সে। দৌড়—দৌড়—দৌড়। সামনে কালোমত কি-একটা আসিতেছে, বিশাল পাহাড়ের মত। সে ঘোড়ার রাশ টানিল।

ঘুম ভাঙিয়া সে কলমটা আবার তুলিয়া লইল, কিন্তু আর লিখিবার উৎসাহ নাই। স্বপ্ন এখনও মাথার মধ্যে ঘুরিতেছে। অর্থটা বোঝা যাইতেছে না বলিয়া অস্বস্তি হইতেছে। টেবিলের ওপাশে জানলা খোলা, হু হু বাতাস আসিয়া কাগজপত্র এলোমেলো হইতেছে। সবাই ঘুমাইয়া, কেবল বহু দূরের কোন সাঁওতাল বস্তীর ক্লান্ত মাদলের শব্দ এখনও শোনা যায়।

চিঠি লিখিবার প্যাডটা টানিয়া লইয়া অপু মনে করিয়া করিয়া বহু পুরাতন বন্ধু-আত্মীয়কে এক একখানা চিঠি লিখিল। অনেককে লেখা হইল না—তাহাদের ঠিকানা মনে নাই। লিখিল, ভালো আছো ? অনেকদিন খবর নিতে পারি নি, স্বার্থপরের মত নিজের ভেতর নিজেকে গুটিয়ে বসেছিলাম। কিন্তু মানুষ একা বাঁচে না—তোমাদের সবাইকে আমার জীবনে বড় দরকার। আমাকে মনে রেখো, একেবারে ভুলে যেও না যেন। মানুষের মধ্যে বেঁচে আছি—এ বোধটা আমার জীবনে যেমন প্রয়োজন, তোমাদের জীবনেও তেমনি।

চিঠিগুলি লিখিতে রাত শেষ হইয়া গেল। পূর্ব দিকের টিলাটার পাশের আকাশের লাল রঙ ধরিল। মেঘের লম্বা স্তরগুলিকে

দেখাইতেছে যেন আঁকা ছবি। আলো ফুঁ দিয়া নিভাইয়া অপু বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল।

পরের দিন সকালে যত্ন পিওন আসিল মনি অর্ডার দিতে। কিছুদিন আগে কাগজে হৈমন্তীর গল্প বাহির হইয়াছিল। তাহার পারিশ্রমিক পনেরটি টাকা আসিয়াছে। যত্ন পিওন এমনি মনি-অর্ডার আগেও কয়েকবার বিলি করিয়াছে। মৌপাহাড়ীর নিরালায় হৈমন্তী বেশ কয়েকটি গল্প লিখিয়াছে।

মনি-অর্ডারফর্মে হৈমন্তী সই করিতেছে, অপু আসিয়া পেছনে দাঁড়াইল।

—বঙ্গবাণীর টাকাটা এল বুঝি ?

হৈমন্তী ফিরিয়া মুখ টিপিয়া হাসিল।

যত্ন পিওন বলিল—এ তল্লাটে এমন রোজগেরে বৌ আর দেখি নি বাবু।

হৈমন্তী হাসিয়া বলিল—তোমাকে আর বকবক করতে হবে না যত্ন দা! এই টাকাটা নাও, বাচ্চাদের মিষ্টি কিনে দিও।

টাকা দুইটা হাত পাতিয়া লইয়া বলিল—দিদির আরও অনেক মনি-অর্ডার আসুক।

হাসিতে হাসিতে যত্ন চিঠির ব্যাগ তুলিয়া রওনা দিল।

সারাদিন অপু টেবিলেই বসিয়া রহিল। লিখিতে লিখিতে কখন যে দিন কাটিয়া গেল, কে জানে। উপন্যাসের শেষ অধ্যায়ের শেষ বাক্যটি লেখা হইয়া গেল। স্তূপাকার কাগজগুলির দিকে তাকাইয়া অপুর অবাক লাগিল। শেষ হইয়া গিয়াছে। বিনিদ্র রাত্রির বেদনা-অনুভূতির ফল ঐ কাগজগুলি। এইবার প্যাকেট বন্দী হইয়া কলিকাতায় যাইবে, নাকের উপর চশমা নামিয়া-আসা বৃদ্ধ কম্পোজিটার বানান করিয়া কম্পোজ করিবে।

শরীরে ভীষণ ক্লান্তি। এত পরিশ্রম সে একসঙ্গে কখনও করে নাই। ডানহাত ব্যাথায় টন টন করিতেছে।

হৈমন্তীকে ডাকিয়া অপু বলিল—একটু গরম জল করে দাও তো, হাতটা বড্ড ব্যথা করছে, ডুবিয়ে রাখব।

কাজ মিটিয়া গেল। সামনে আর বড় কোন কাজ নাই। অপু আপন মনে বেড়াইতেছিল। ছেলেবেলাকার অভ্যাসমত হাতে সরু কঞ্চির মত এক লাঠি লইয়াছে। অনেকক্ষণ ঘুরিবার পর মনে হইল, সে আজ ভীষণ অন্যমনস্ক। অনেক পুরাতন মুখ। অপর্ণার কথা বড় বেশী মনে আসিতেছে। তাহাকে কিছু দেওয়া হয় নাই—তখন অপুর পয়সা ছিল না। অথচ অপর্ণা হাসিমুখে অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইয়া নিয়াছিল—কখনো অভিযোগ করে নাই। বড় সিঁদুরের টিপ-পরা অপর্ণার সলজ্জ মুখখানি আজ অনেকদিন বাদে মনে পড়িয়া গেল। তাহার চিবুকের টোলটা সে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছে।

কাশীতে যখন বাবা মারা যায়—উঃ, কি দিন গিয়াছে! কনকনে শীতের রাত্রে সেই গঙ্গাস্নান করিয়া বাড়ি ফেরা।

সবার হইতে বেশী মনে পড়ে মাকে। কখনো কিছু চায় নাই, আশা করে নাই। অপু সুখে থাকিলেই সুখী হইত। মনসাপোতার বাড়িতে ফিরিয়া তাহার প্রতি ছাত্রীর অভিভাবকদের সদয় ব্যবহারের কথা সে মাকে খুশী করিবার জন্য বানাইয়া বানাইয়া বলিত। মা সরল মনে সব বিশ্বাস করত। ছিন্নবেশ-পরা মায়ের হাস্যময়ী চেহারা মনে পড়িয়া যায়।

ঘুরিতে ঘুরিতে সুবর্ণরেখার তীরে আসিয়া পড়িয়াছে অপু। বসিলে মন্দ হয় না। যে পাথরটার উপর বসিয়া সে লিখিত জুতা ছাড়িয়া তাহার উপর অপু বসিল। জনপ্রাণী নাই কোনদিকে। সুবর্ণরেখার শূন্য বুকটা খাঁ খাঁ করিতেছে। কয়েকটি বক একপায়ে নদীর চরে ধ্যানমগ্নের মত দাঁড়াইয়া। সূর্য যেন জ্বলিতেছে। অপুর মনে হইল, সবদিকে কেমন একটা নাই-নাই ভাব, আকাশ রিক্ত। এতটুকু মেঘ নাই। নদীর বুক রিক্ত—জল নাই। দিগন্ত পর্যন্ত প্রান্তর রিক্ত নদীর ওপারে কেবল একটিমাত্র গাছ—পলাশ গাছ

বিপুল একটি প্রাকৃতিক কবিতার যতি চিহ্নের মত সোজা মাথা তুলিয়া আছে। গাছটার সর্বাঙ্গে যেন আগুন। নিঃস্ব প্রান্তরের পটভূমিতে পুষ্পিত পলাশ গাছটাকে সামান্য একটুকু সান্ত্বনার মতো দেখাইতেছে।

এমনকি একটা দিনে কলিকাতা হইতে মায়ের জন্য সামান্য কিছু জিনিস কিনিয়া গ্রামের পথে হাঁটিয়া মনসাপোতায় ফিরিয়াছিল। দরজা খুলিয়া তাহাকে দেখিয়া মা কি খুশী না হইয়াছিল! মাকে জড়াইয়া আদর করিলে কেমন সুন্দর গন্ধ পাওয়া যেত মায়ের গায়ে!

মাকে মনে পড়িতেছে। ছোটবেলায় মা তাহাকে পাঠশালায় যাইবার জন্য খুব সকালে ঘুম হইতে তুলিয়া দিত, নিজের হাতে সাজাইয়া হাতে বই দিয়া বলিত—যাও বাবা, পাঠশালায় যাও। তুমি লেখাপড়া শিখে মানুষ হলে বংশের নাম উজ্জ্বল হবে।

সে কি মানুষ হইতে পারিয়াছে? অথবা মা কি অন্য কিছু চাহিয়াছিল, যা সে হইতে পারে নাই?

একদিন রাগ করিয়া সে মায়ের দেওয়া তালের বড়া ছুঁড়িয়া উঠানে ফেলিয়া দিয়াছিল—অনেকদিন আগের ঘটনাটা। মায়ের কত কষ্টে জোগাড় করা জিনিসে তৈয়ারী।

• এসব মনে করিয়া তাহার চোখে জল আসিতেছে কেন? আশ্চর্য! ইহা কি কাঁদিবার সময় হইল? এমন সুন্দর পরিবেশে? কিছু দূরে নদীর বাঁকের মুখটায় বালির উপর তাপতরঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, আকাশে সূর্য, ধূ-ধূ প্রান্তর—সব মিলাইয়া স্বরলিপির তীব্র মাধ্যমের মত।

একটা ঢিল তুলিয়া জোরে নদীর দিকে ছুঁড়িল, বেশ জোরে। সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করিল বুকের বাঁদিকে যন্ত্রণা শুরু হইয়াছে। সামনে হইতে জোরে ধাক্কা মারিলে যেমন হয়, তেমনি ভাবে বুকে হাত দিয়া কিছুটা ছিটকাইয়া পেছনে সরিয়া আসিল। মুহূর্তে মাথা কি রকম খালি হইয়া গেল। সূর্যটা যেন একবার কাছে আসিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে আবার দূরে সরিয়া যাইতেছে।

অপু অনুভব করিল, পা দুইটা তাহাকে আর দাঁড় করাইয়া রাখিতে পারিতেছে না। পাথরটার গায়ে হেলান দিয়া সে মাটিতে বসিয়া পড়িল। ব্যথাটা বাড়িতেছে—শ্বাস লইতে কষ্ট হইতেছে। খুব গভীর ঘুম আসিবার আগে যেমন হয়, শরীরে তেমনি অবসাদের ভাব। দেহে-মনে অবসাদ মাকড়সার জালের মত জড়াইয়াছে। সে কি এইখানে একটু ঘুমাইবে?

বাবা বাড়ি আসিয়া বলিতেছে—দুর্গা কই? তার জন্যে শাড়ী কিনে এনেছি যে—

বাবা থলির ভিতর হইতে অনেক জিনিস বাহির করিতেছে। হঠাৎ অপুর মনে হইল—সত্যিই তো, দিদি কই? তাহাকে সবাই কোথাই হারাইয়া ফেলিয়াছে। দিদিকে খুঁজিতে হইবে।

ঘুম-ঘুম-ঘুম। বুক বাহিয়া চিনচিনে ব্যথাটা উপরে উঠিতেছে। যন্ত্রণা ততটা আর বোধ হইতেছে না, তাহার খুব ঘুম পাইয়াছে। কানের কাছে তীক্ষ্ণ স্বরে একটা পাখী ডাকিয়া উঠিল। নিশ্চিন্দিপুরে সেই পাখীটা যেমন ডাকিত।

সামনের ঐ ব্যাপ্তির ভিতর কোথায় যেন বাজনা বাজিতেছে। গম্ভীরনাদ বীণার উদারার তারের আলাপের মত। তারের উপর এক-একটি আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে সে একটু একটু ঘুমাইয়া পড়িতেছে। হাত-পায়ের সমস্ত শক্তি চলিয়া গিয়াছে। আর সে চলিতে পারিবে না, সমস্ত জীবনে অনেক ঘোরা হইয়াছে—এইবার সে একটু বিশ্রাম করিয়া লইবে। এইখানেই বিশ্রাম করিবে।

এ্যাশবার্টন সাহেব বলিতেছে—East opened my eyes, Roy. It really enthralls me, this call of the mysterious—this mystic span of the river—

এ্যাশবার্টনকে দেখিয়া সে উঠিবার চেষ্টা করিল। সে শুইবে না। সে অনড় হইয়া থাকিবে—না, কিছুতেই না। কিন্তু শরীর তাহার কথা মান্য করিতেছে না। তাহাকে কেহ উঠাইয়া দিতেছে না কেন?

ঐ বড় পাথরটার আড়ালে সে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাকে সে চিনিতে পারে নাই। এইবার সে বাহির হইয়া সামনে আসিয়াছে।

লীলা।

—পোর্তোপ্লাতায় যাবে না অপূর্ব? তুমি যে বলেছিলে, সোনা উদ্ধার করে আনবে সমুদ্রের তলা থেকে?

হ্যাঁ, যাইতে হইবে বৈকি! অতল সমুদ্রের নীচে তাহার জন্য যে রত্ন অপেক্ষা করিয়া আছে, তাহাদের সে সূর্যের আলোয় বাহির করিয়া আনিবে।

খোকা কোথায় গেল, খোকা? খোকা, আমার পাশে আয়—এইখানটায়। কোল ঘেঁসে বোস, উঠে যাসনে কোথাও। আমি তোকে কোলকাতা থেকে সেই বইটা এনে দেবো এবার। উঠে যাস নে বাবা আমার—তোকে না দেখে আমি যে মোটে থাকতে পারি না।

তাহার মা বলিতেছে—ঘুমো অপু, ঘুমো। আহা রে, বড্ড খাটুনি গেছে তোর—

• ঘুমাইয়া পড়িবার আগে অপু জোর করিয়া একবার তাকাইল। দেখিল, লাল ফুল ফুটিয়া-থাকা পলাশ গাছটার পাশ দিয়া একটা পথ সমস্ত প্রান্তরকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়া দূরে দিগন্তে মিশিয়া গিয়াছে।

পিতৃহীন কাজল সাত

বুধন সর্দার আর তার ছেলে সুবর্ণরেখাব ধারে কি কাজে আসিয়াছিল। অপুকে বুধন চিনিত, বেড়াইতে বাহির হইয়া অপু বহুদিন তাহার বাড়িতে জল চাহিয়া খাইয়াছে। বুধন দেখিল, ঢালু পাড়ের উপর একখণ্ড পাথরে হেলান দিয়া বাবু ঘুমাইয়া রহিয়াছে। পাশেই চটিজোড়া খোলা রহিয়াছে—পাথবের উপর সরু কঞ্চি।

ছেলেকে দাঁড় করাইয়া বুধনই প্রথম লোক ডাকিয়া আনে।

বাড়িতে শহরের লোক ভাঙিয়া পড়িয়াছে। ডাক্তার বিশ্বনাথ সোমও আসিয়াছেন। তখন আর কিছু করিবার ছিল না। বিশ্বনাথ বিষণ্ণমুখে বলিলেন—রায়মশায়কে এইজন্যই বলেছিলাম পরিশ্রম কম করতে, শুনলেন না সে কথা—

অপুর অনেক ভক্ত আসিয়াছিল। যোগাড়-যন্ত্র করিয়া তাহারা দাহ করিবার ব্যবস্থা করিল। অনেক মানুষ, অনেক গোলমাল—তাহার মধ্যে অপু যেন চুপ করিয়া শুইয়া আছে। মুখ দেখিয়া হৈমন্তী স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, শেষ সময়ে অপু বেশী কষ্ট পায় নাই। মুখে একটা তৃপ্তির ভাব মাখানো।

পাড়ার লোকেই হৈমন্তীর বাপের-বাড়ি টেলিগ্রাম করিয়াছে। ঘটনাগুলি হৈমন্তীর চোখের সামনে ছায়াবাজির মত ঘটিয়া যাইতেছিল। সে যেন ইহার সঙ্গে জড়িত নয়, যেন কোথাও বাহিরে এ সমস্ত হইতেছে—সে শুধু দর্শকমাত্র।

দাহ শেষ করিয়া শেষরাত্রে সবাই ফিরিল। খাটের পায়ার

কাছে হৈমন্তী একভাবে বসিয়া আছে, একটুও নড়ে নাই। দিন তাহার চোখের সামনেই রাত্রি হইয়াছিল আবার রাত্রিও ভোর হইতে চলিল।

সবাই অবাক হইল কাজলকে দেখিয়া। শ্মশানে সে মুখাগ্নি করিয়াছে অত্যন্ত শান্তভাবে। ফিরিয়া সেই যে জানালায় দাঁড়াইল, পরের দিন দুপুর পর্যন্ত আর সেখান হইতে নড়িল না। পাশের বাড়ির ওভারসিয়ার বাবুর স্ত্রী আসিয়া সারারাত হৈমন্তীর কাছে বসিয়াছিলেন। তিনি পর্যন্ত কাজলের নিস্পৃহতা দেখিয়া অবাক হইলেন।

অকস্মাৎ বজ্রপাত হইয়া সব যেন বিনষ্ট করিয়া দিয়াছে। উনানে আগুন নাই, ঠাকুরের কাছে প্রদীপ জ্বালা হয় নাই। পরের দিন সন্ধ্যা হইয়া গেল, তখনও কেহ ঘরে আলো জ্বালিল না। ওভারসিয়ার বাবুর স্ত্রী সমস্ত রাত জাগিয়া ক্লান্ত ছিলেন, বিশ্রাম করিতে তিনি বাড়ি চলিয়া গিয়াছেন। আবার সকালে আসিবেন বলিয়াছেন। কিছু ফল ও দুধ আনিয়া তিনি বারবার খাইতে বলিয়া গিয়াছেন। ফলের থালা এবং দুধের ঘটি এখনও জলচৌকিটার উপর পড়িয়া আছে—কেহ তাহাতে হাত দেয় নাই।

দুপুরে কাজল অপুর লেখার ঘরে গিয়া বসিল। সমাপ্ত পাণ্ডুলিপিটা বড় খামের ভিতর টেবিলের উপর রাখা। টেবিলের এককোণে বাবার চুল আঁচড়াইবার যশোরের-চিরুনিখানা, তাহাতে বাবার কয়েকটা চুল এখনও জড়াইয়া আছে। ঘাড়ের কাছে ময়লা হইয়া-যাওয়া দুইটা জামা দেয়ালের পেরেক হইতে ঝুলিতেছে। এসব দেখিতে দেখিতে কাজল জানলা দিয়া বাহিরে তাকাইল। বেলা পড়িয়া আসিতেছে। সূর্যটা কেমন করুণাহীন—কাহারও দুঃখের সমব্যথী নহে, সমস্ত দিন কেবল ঘুরিতেছে। একটা মাকড়সা দুই দেয়ালের কোণে জাল বুনিতেছে অখণ্ড মনোযোগে।

অনেক রাত্রি পর্যন্ত কাজল টেবিলে এবং হৈমন্তী খাটের পায়ের কাছে বসিয়া রহিল। ঝকঝক শব্দ করিয়া রাঁচী-এক্সপ্রেস

জামসেদপুরের দিকে রওনা হইয়া গেল। সমস্ত দিন গরমের পর একটু ঠাণ্ডা বাতাস দিতেছে। ঘরে আলো নাই, অন্ধকারের ভিতর সমস্ত বাড়ির শূন্যতাটা হৈমন্তীর কাছে বেশী করিয়া ফুটিল।

হঠাৎ বাইরে পায়ের শব্দ। একটা পরিচিত গলার স্বর শোনা গেল। মানুষটি বারান্দায় উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে ওভারসিয়ার বাবুর গলা—রাঁচী-একস্‌প্রেসেই এলেন বুঝি?

একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলিয়া উঠিল অন্ধকারে। সেই আলোয় কে পথ দেখিয়া আসিতেছে। ঘরের মধ্যে আবার একটা কাঠি জ্বলিতে হৈমন্তী বিরক্তির সহিত মুখ ফিরাইল। কে আসিয়া তাহার মাথায় হাত রাখিয়া বলিল—ভয় নেই মা, আমি এসেছি। বাড়ি অন্ধকার কেন?

সুরপতিবাবু আসিয়াছেন।

মালতীনগরে যাইবার আয়োজন হইতে লাগিল। সুরপতি বাবু হৈমন্তী ও কাজলকে মালতীনগরে লইয়া যাইবেন। জিনিসপত্র প্রায় সবই এখানে রাখিয়া যাওয়া হইতেছে, লইয়া যাওয়া খুব কষ্টকর এবং তাহার প্রয়োজনও নাই। দুই চারখানা কাপড় সঙ্গে যাইতেছে মাত্র।

সুরপতি বাবু দিন পাঁচেক মৌপাহাড়ী থাকিলেন। মেয়ে সদ্য শোক পাইয়াছে, একটু সামলাইয়া নিক। বিকালের দিকে সতরঞ্চি পাতিয়া তিনি উঠানে বসেন। অন্যমনস্ক হইয়া চাহিয়া থাকেন কোন একদিকে। কিছুদিন আগে এইখানে বসিয়াই অপুর সহিত গল্প হইয়াছে। অপু বলিয়াছিল—আত্মার বিনাশ নেই বাবা। আত্মা একটা শক্তি। একটা ভীষণ শক্তি—শক্তির বিনাশ নেই, রূপান্তর আছে মাত্র।

পরলোকে বিশ্বাসী সুরপতি বাবু চারদিকে তাকাইয়া দেখেন। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা হইতেছে। তাঁহার মনে হয়, এই মাটি-জল-বাতাসের ভিতর, ঐ দূরের নক্ষত্রটার ভিতর অপুর আত্মা রূপান্তরিত হইয়া মিশিয়া গিয়াছে।

সারাদিন ধরিয়া মৌপাহাড়ী ছাড়িয়া যাওয়ার তোড়জোড়—অথচ সবাই জানে তোড়জোড় করিবার কিছু নাই। সঙ্গে বেশী জিনিসপত্র যাইতেছে না। মৌপাহাড়ীর সহিত এতদিনে যে সম্পর্কটা বহু সুখস্মৃতির সঙ্গে জড়িত হইয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে, আসল কষ্ট সেটাকে ছিন্ন করা।

রাত্রি ঝিমঝিম করিতে থাকে। তখনও আলোকবিন্দুহীন অন্ধকারের ভিতর হৈমন্তী কাজলের পাশে শুইয়া চুপ করিয়া তাকাইয়া থাকে। দূরের থানায় ঘন্টা বাজিয়া যায়। অনেকক্ষণ পরেও হৈমন্তী বুঝিতে পারে, কাজল জাগিয়া আছে।

পর পর কয়েক রাত জাগিয়া চতুর্থ দিন শেষরাত্রে হৈমন্তী ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। ঘুমাইয়া সে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিল। দেখিল, সে বড় স্টীলের ট্রাঙ্কটা খুলিয়া তার সামনে দাঁড়াইয়া। কোথাও বেড়াইতে যাওয়া হইতেছে। পাশেই বই-এর আলমারি। অপু হাসিয়া বলিতেছে—শুধু জামাকাপড় নিলেই কি চলবে? আমি তো বই ছাড়া মোটেই থাকতে পারি নে—

অপু তাহাকে বই আগাইয়া দিতেছে, সে সাজাইয়া লইতেছে ট্রাঙ্কের ভিতর। মন-ভরা বেড়াইতে যাইবার আনন্দ। যেন সব ঠিক আছে। যেন কিছুই বদলায় নাই।

পরের দিন ঘুম হইতে উঠিয়া হৈমন্তী সুরপতি বাবুর কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

—বাবা!

—কি মা?

—এখান থেকে আর কিছু নয়—শুধু বইগুলো নিয়ে যাবো।

সুরপতি বাবু হৈমন্তীর দিকে তাকাইলেন। কোনো প্রশ্ন করিলেন না। কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া মুখ নিচু করিয়া বলিলেন—তাই হবে মা। একটা বইও ফেলে যাবো না।

কয়েকটা প্যাকিংবাক্সে বইগুলি ভর্তি করিয়া সুরপতি বাবু মালতী-নগরের ঠিকানায় রেলে বুক করিয়া দিলেন। যাইবার দিন সকালে

কাজল একবার সুবর্ণরেখার ধারে গেল। বাবা যে পাথরটার উপর বসিয়া লিখিত, সেটা একইভাবে পড়িয়া আছে। কাজলের অবাক লাগিল। যখন কাজলও পৃথিবীতে থাকিবে না, তখনও এটা এইভাবে এখানে পড়িয়া থাকিবে। এই নদী, এই চর, ঐ প্রান্তর— সবই এক রকম থাকিবে। আকাশটা নীল থাকিবে। কেবল সে থাকিবে না। যেমন এখন বাবা নাই।

কি-একটা পাখী মাথা সামনে-পেছনে নাড়াইতে নাড়াইতে ক্রমশঃ চর বাহিয়া নদীর ভিতরে যাইতেছে। ওপারে বাঁদিকে টিলার মাথায় সূর্যটা যেন আটকা পড়িয়াছে। বাবা এই সময়ে অনেকদিন এইখানে বসিয়া লিখিত। সে কতদিন আসিয়া বাবাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছে। একবার তাহার মনে হইল, পেছনে ফিরিয়া তাকাইলেই বাবা একটা ঝোপের আড়াল হইতে বাহির হইয়া আসিবে।

—অমন লুকিয়ে ছিলে কেন বাবা?

অপু হাসিয়া বলিবে—দেখছিলুম, আমায় না দেখতে পেয়ে তুই ভয় পাস কি না।

এমন কতদিন ঘটিয়াছে। বাবা তাহার সহিত ছেলেমানুষের মত খেলা করিত। লুকোচুরি-খেলা শেষ হইলে খাতাপত্র গুটাইয়া তাহারা বাড়ির পথ ধরিত।

এবার বাবা বড় কঠিন জায়গায় লুকাইয়াছে। আর কেহ তাহাকে পাইতেছে না। আর তাহাকে কোনদিন কেহ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে না।

খেলিতে খেলিতে খেলাটা হঠাৎ যেন ভারী রকমের হইয়া গিয়াছে।

হৈমন্তী জানলা খুলিয়া দিতেই প্রথম নজরে পড়িল ইউ-ক্যালিপটাস গাছ দুইটা। সকালেও বাতাস তাহাদের পাতায় পাতায় সামান্য কাঁপন ধরাইয়াছে। এই গাছ দুইটার ফাঁক দিয়াই সেদিন রাত্রে চাঁদ ধীরে ধীরে দিগন্তের দিকে নামিতেছিল।

—এবার চল, আমার উপন্যাসটা শেষ হলে হরিদ্বার ঘুরে আসি।

—সত্যি বলছ ?

—এমন ভাবে বলছ যেন কোনদিন কোথাও নিয়ে যাই নি। তৈরী হও, এবার বেরিয়ে পড়ব।

কথা রাখে নাই। একাই সে লম্বা পাড়ি জমাইয়াছে। বেলা বাড়িয়া চলিয়াছে। বিকালের গাড়িতে চলিয়া যাইতে হইবে। বাড়িটার, ছোট্ট শহরটার প্রতি ধূলিকণায় তাঁহার স্মৃতি রহিল। সদর-দরজায় তালা ঝুলাইয়া যাইবার পরেও বাড়ির ভিতরে সে থাকিবে একা। এখন হৈমন্তী থাকিবে না। সেই পরিচিত গলা শোনা যাইবে না—ভাত নেমেছে ? না খাইয়ে আজ মারবার মতলব করেছ নাকি ?

দিন কাটিয়া যাইবে, আসবাবপত্রে ধুলা জমিবে। মাস এবং বৎসর আপন খেয়ালে কাটিতেই থাকিবে। একটা অর্থহীন অস্তিত্ব হৈমন্তীকে সারা জীবন ক্লান্ত করিতে করিতে এক নিরালম্ব অবস্থায় আনিয়া দিবে।

সত্যই কি অর্থহীন অস্তিত্ব ?

একটা কাজ অন্ততঃ তাহার এখনও রহিয়াছে। অপু শুরু করিয়াছিল, তাহাকে শেষ করিতে হইবে। অনুচ্চারিত প্রতিজ্ঞায় সে অপুর কাছে-সত্যবদ্ধ।

ঘরের দরজায় শব্দ হইল, কাজল ফিরিয়াছে।

হৈমন্তী বলিল—তোর পড়াশুনোর বইগুলো বেঁধে নিয়েছিস বুড়ো ?

দরজায় তালা লাগানো হইয়া গেল। সুরপতি বাবু তালাটা ভাল করিয়া টানিয়া দেখিলেন, ঠিকমত লাগিয়াছে কিনা। ওভারসিয়ারবাবুকে বলা রহিল, এদিকে একটু নজর রাখিবার জন্য।

কাজল বারান্দার রেলিংয়ে হাত দিয়া গম্ভীর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার বিশ্বাস হইতেছিল না, এখনই এসব ছাড়িয়া অনেকদিনের জন্য—হয়তো বা চিরদিনের জন্য চলিয়া যাইতে হইবে তাহাতে

কোন সন্দেহ নাই। তাহাদের ট্রেন এতক্ষণে জামসেদপুর ছাড়াইয়াছে।

হৈমন্তীর বুকের ভিতর কি-একটা আবেগ কোন বাধা না মানিয়া ঠেলিয়া উঠিতেছিল। দরজা বন্ধ না হওয়া অবধি সে বারান্দায় দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে শুইবার-ঘরের কুলুঙ্গিতে লক্ষ্মীর পটটার দিকে চাহিয়াছিল। দরজার পাল্লা বন্ধ হইতে দৃশ্যটা আড়াল হইয়া গেল। কাজলের হাত ধরিয়া চলিতে শুরু করিয়াই হৈমন্তীর চোখের বাঁধ ভাঙিল, এতক্ষণে বিচ্ছেদটা যেন সম্পূর্ণ হইল। মৌপাহাড়ীর মাটি হইতে পা তুলিয়া লইবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক মিটিয়া যাইবে।

কয়েকটা শুকনো পাতা বারান্দার উপর দিয়া খড়খড় শব্দে সরিয়া গেল। সিঁড়ি দিয়া উঠানে নামিতে নামিতে কাজল অবাক হইয়া ফিরিয়া তাকাইল। ঠিক মনে হইয়াছিল, কাহার পায়ের শব্দ।

উঁচু নিচু লাল মাটির পথে রিক্সা চলিল স্টেশনের দিকে। সেখানে তাহাদের বিদায় দিবার জন্য অনেকে অপেক্ষা করিয়া আছে। তাহারা ভিড় করিয়া আসিল। এই কয়েক বৎসরে যাহাদের সহিত পরিচয় হইয়াছিল, যাহারা অপুর লেখার ভক্ত—সবাই আসিয়াছিল। এত কলরবের মধ্যেও হৈমন্তী বারবার স্টেশনের লাল রাস্তাটার দিকে তাকাইতেছিল। কি-একটা যেন ফেলিয়া আসিয়াছে।
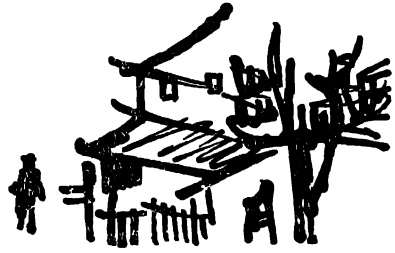
মামাবাড়িতে কাজল আট

মামাবাড়িতে আসিবার আগে কাজলের মনে দ্বিধার ভাব ছিল। কিন্তু কয়েকমাস কাটিবার পর সে অনুভব করিল, এ বাড়ির সহিত তাহার মানসিকতা বেশ খাপ খাইয়াছে। মামাবাড়িতে সবসময়ই একটা সাহিত্য ও শিল্পের হাওয়া বহিতেছে। সেটাই তাহাকে ক্রমশঃ সুস্থ করিয়া তুলিল। প্রতাপ একটি গ্রন্থকীট। তাহার সহিত কাজলের চমৎকার সময় কাটে। দিদিমা তাহাকে খুব ভালবাসেন, তাঁর সম্বন্ধে কাজলের অস্বস্তি দু'দিনেই চলিয়া গিয়াছিল। সর্বাপেক্ষা বেশী জমিয়াছে কিন্তু দাদুর সঙ্গে।

সুরপতি বাবু কাজলকে ছাড়া একটুও থাকিতে পারেন না। কাজলের জন্য প্রাইভেট টিউটর রাখেন নাই, নিজেই পড়ান। ধার্মিক মানুষ তিনি, কাজলের চারিত্রিক শিক্ষার জন্য তাহাকে শিষ্য বানাইয়া লইলেন। সন্ধ্যায় ঘরের বাতি নিভাইয়া দাদুর পাশে বসিয়া কাজলকে ধ্যান করিতে হয়। সুরপতি বাবু তাহাকে বলিয়াছেন, মনঃসংযোগ ব্যতীত জীবনে সিদ্ধি আসে না, সন্ধ্যায় কাজল তাই মনঃসংযোগ অভ্যাস করে। দুইগাছা রুদ্রাক্ষের মালা কেনা হইয়াছে—তাহার একটা সুরপতি বাবু নিজের গলায় দেন, অন্যটা ধ্যান করিবার সময় কাজল পরে।

এই তিন-চার বৎসরে মালতীনগর আরও অনেক উন্নত হইয়াছে। নূতন দোকানপাট বসিয়াছে, রাস্তায় গাড়ী-ঘোড়ার ভিড় বাড়িয়াছে,

বাড়িঘর অনেক তৈয়ারী হইয়াছে। কলিকাতা খুব দূরে নহে কাজেই ব্যবসাপত্রের বেশ প্রসার হইতেছে।

মালতীনগরের গোলমাল ছাড়িয়া মাইল দুয়েক গেলে কয়েকটি সুন্দর গ্রাম আছে। পিচের রাস্তা ছাড়িয়া মাঠের মধ্য দিয়া হাঁটিয়া কিছুটা দূরে চমৎকার বাঁশবন, পুকুর, কলসী-কাঁখে গ্রামবধূ দেখা যায়। ধূলাবালি মানুষজনে বিরক্ত হইয়া কাজল মাঝে মাঝে হাঁটিয়া গ্রামের দিকে যায়। নিশ্চিন্দিপুরে যাওয়া হইয়া ওঠে না, এই ভাবেই কাজল প্রকৃতির সহিত সম্পর্ক বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।

কাজলের মনের গভীরে ছন্দপতনের প্রতি একটা বিতৃষ্ণা আছে। জিনিসটা সে সময় ভাষায় প্রকাশ করিয়া বলিতে পারে না। যে জিনিসটার যেমন থাকিবার কথা, যেখানে যে জিনিসটা মানায়, সেখানে তাহা না থাকিলে কাজল ভীষণ অস্বস্তি বোধ করে। অস্বস্তিটাও অদ্ভুত। ব্ল্যাকবোর্ডে খড়ি পিছলাইয়া কি—চ্ করিয়া তীক্ষ্ণ শব্দ হয়—তাহা শুনিলে যেমন গা গুলাইয়া ওঠে, অনেকটা তেমনি। সুন্দর কিছুর মধ্যে সামান্যতম ত্রুটি, তাহার মতে, সমস্ত ব্যাপারটাকে একেবারে মাটি করিয়া দেয়। বাবার সঙ্গে বেড়াইতে গিয়া সুন্দর বিকালবেলাটায় রেললাইনের পাশে বীভৎস দৃশ্য দেখিয়া সে চমকাইয়া উঠিয়াছিল এই কারণেই। তখন কারণটা বুঝিতে পারে নাই, এখন আবছা ভাবে আন্দাজ করিতে পারে। জগতের সমস্ত দিক ব্যাপিয়া এক অতিমানবিক সঙ্গীত বাজিতেছে, তাহার মধ্যে অসুন্দর কিছু মানায় না। সেতার বাজাইতে বাজাইতে ভুল তারে হাত পড়িয়া যাইবার মত লাগে।

বাবা তাহাকে একখানি 'ডেভিড কপারফিল্ড' কিনিয়া দিয়াছিলেন। বইখানি শিশুদের জন্য সংক্ষিপ্ত করা। আজ তাহার ইচ্ছা হইল, বইখানি নির্জনে কোন জায়গায় বসিয়া পড়িবে। সে জিনিসটা তাহার বাবাকে দেখিয়া শেখা। কোন ভাল বই অপু সাধারণতঃ বাড়ির মধ্যে বসিয়া পড়িত না।

দুপুরে কাজল বাড়ি হইতে বাহির হইয়া সোজা গ্রামের পথ

ধরিল। হাতে বইখানা, পকেটে আনা দুই পয়সা—সকালে সুরপতি বাবুর নিকট হইতে লইয়াছে।

পিচের রাস্তা যেখানে দূরের এক মহকুমা শহরের দিকে বাঁকিয়া গিয়াছে, কাজল সেখানে রাস্তা ছাড়িয়া মাঠে নামিল। মাঠে ধান বুনিয়াছে—গাছ এখনও খুব লম্বা হয় নাই, কাজলের কোমর বরাবর হইবে। মাঠের মাঝখানে আসিয়া চারিদিকে তাকাইলে ব্যাপারটাকে একটা সবুজ ধাঁধা বলিয়া মনে হয়। সামান্য বাতাসেই মাঠ জুড়িয়া সবুজের ঢেউ শুরু হয়, ভারী ভালো লাগে দেখিতে। একদিক হইতে ঢেউ শুরু হয়, একেবারে অপর প্রান্তে গিয়া শেষ হয়।

মাঠ পার হইয়া সামনে একটা বড় বাঁশবন পড়ে। দিনের বেলাতেও তাহার ভিতরটা আধো-অন্ধকার থাকে। লম্বা সরু বাঁশ-পাতা ঝরিয়া ঝরিয়া তলার মাটি একেবারে ঢাকিয়া গিয়াছে। মাঠের উজ্জ্বল আলোক ছাড়িয়া বাঁশবনে ঢুকিলেই মনে হয়, হঠাৎ সন্ধ্যা নামিল। বেশ ঠাণ্ডা জায়গাটা। বাতাসে বাঁশগাছ দুলিয়া আওয়াজ হইতেছে কট্—কট্—কট্, ক্যাঁ—চ্।

বাঁশের গা হইতে কতকগুলি খোলা টানিয়া ছিঁড়িয়া কাজল তাহার উপর বসিল। বই খুলিয়া পড়িতে পড়িতে সে মগ্ন হইয়া যায়। ডেভিডের দুঃখ, ডেভিডের সংগ্রাম করিতে করিতে বড় হওয়া, সব তাহার মনে দাগ কাটে। মানুষের জন্য লেখকের সমবেদনা অশ্রু তাহাকে ডিকেন্স-এর প্রতি আকৃষ্ট করে। অন্য কে এমনভাবে লিখিতে পারিত? অনাদৃত শুষ্কমুখ ডেভিডকে সে যেন স্পষ্ট দেখিতে পায়।

একটা কঞ্চি সামনে বাঁকাভাবে মাটির উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। তাহার উপর হঠাৎ এক টুনটুনি আসিয়া বসিল। কাজল তাকাইয়া দেখিতেছে, পাখীটা বসিয়া আছে—ভয় পাইয়া উড়িয়া যাইতেছে না। কঞ্চিটা অল্প অল্প দুলিতেছে।

কাজল অনুভব করিল, মনে তাহার কোনো দুঃখ নাই, গতকাল রেললাইনের ধারে যে ভয়টা হৃৎপিণ্ড চাপিয়া ধরিয়াছিল, তাহাও অদৃশ্য। চারিদিকে শুধু ছায়া-ছায়া আলো, পাখীর ডাক, ঘন

বাঁশবনে নিঝুম দুপুরে বাঁশ দুলিবার শব্দ। আর সব-কিছুর সঙ্গে মিলাইয়া রহিয়াছে—ডেভিডের জীবনচিত্র।

বইটা রাখিয়া কাজল চিৎ হইয়া শুইল। গতকাল বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, মাটি সামান্য ভিজা। উপরে বাঁশপাতা জড়াজড়ি করিয়া একটা সবুজ চাঁদোয়া বানাইয়াছে, তাহার ফাঁক দিয়া আকাশ দেখা যায়। মাটি হইতে সোঁদা গন্ধ আসিতেছে। আবার বোধ হয় বৃষ্টি হইবে—এক সার পিঁপড়া মুখে ডিম লইয়া ছুটিতেছে। বৃষ্টি হইবার আগে পিঁপড়া নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ঘোরে।

একটা বাছুর গলায় দড়ি এবং দড়ির প্রান্তে আটকানো খোঁটাসুদ্ধ তাহার সামনে আসিয়া পড়িল। ছোট্ট বাছুরটা, কাহাদের কে জানে—খোঁটা উপড়াইয়া এখানে হাজির হইয়াছে। বাছুরের চোখের শান্ত দৃষ্টি তাহাকে মুগ্ধ করিল। সে হাত বাড়াইয়া ডাকিল —আয়, আয়।

নাক উঁচু করিয়া বাতাসে কি শুঁকিয়া বাছুরটা উল্টা পথ ধরিল।

কেমন আরামে তাহার সময় কাটিতেছে। কাজলের একবার দেবেশের কথা মনে পড়িল। সে এখনও মৌপাহাড়ীতে তেমনই বন্ধুদের সহিত অকারণে হৈ হৈ করিয়া কাটাইতেছে। একটা বই পড়া নেই, দু'দণ্ড একলা বসিয়া চিন্তা করা নাই। এই ছায়ায় বসিয়া বই হাতে সে চিন্তা করিয়া যে আনন্দ পাইতেছে, সে আনন্দের সন্ধান কি সারা জীবনেও উহারা পাইবে?

বিকাল হইয়া আসায় সে বাঁশবাগান ছাড়িয়া গ্রামের ভিতরে চলিল। এক জায়গায় একটা পানাপুকুর টোপাপানায় আচ্ছন্ন হইয়া আছে। পানা সরাইয়া এক কিশোরী থালা মাজিতেছিল। কাজলকে দেখিয়া ত্বরিতপদে তালগাছের গুঁড়ির তৈয়ারী ঘাট বাহিয়া উপরে উঠিয়া দৌড়াইল। একটা কুকুর, বেশ স্বাস্থ্যবান, তাহার দিকে পুকুরের ওপার হইতে তাকাইয়া আছে। কাজলের মনে হইল —আমার কালু বেঁচে থাকলে ঠিক অত বড় হোত।

কালুর কথা মনে পড়িতে তাহার মন খারাপ হইয়া গেল।

কালু মারা যাইবার পরেও তাহার গলার চেনটা উঠানের কাঠচাঁপার ডালে ঝুলিত।

সামনে একটা খোড়োচালের বাড়ী। কাজল উঠানে দাঁড়াইয়া বলিল—শুনছেন?

খাটো ধুতি পরা একজন বাহির হইয়া আসিল।—কে? কি চাই?

একটু খাবার জল দেবেন?

লোকটা কাজলকে আপাদমস্তক দেখিয়া বলিল—আমরা কিন্তু মুসলমান।

কাজল বলিল—হোক গে, আপনি দিন জল।

—ওখানে কেন? এই দাওয়ায় এসে বোসো খোকা।

—এই গ্রামে বুঝি সবাই মুসলমান।

লোকটা হাসিয়া বলিল—না, না। সবাই নয়, আমরা কয়েক ঘর আছি আর কি।

তাহার পর যেন একটা খুব গোপনীয় কথা হইতেছে, এমন ভাবে মুখটা কাজলের কাছে আনিয়া ফিসফিস করিয়া বলিল—মুড়ি খাবে দুটো?

ভাব জমিয়া গেল।

একটু পরেই কাজল দাওয়ায় বসিয়া মুড়ি খাইতে খাইতে গল্প করিতেছে, নাক দিয়া সর্দি-ঝরা একটা বাচ্চা পাশে-রাখা ডেভিড কপারফিল্ড খানা লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছে।

লোকটা বলিল—আর দেবো মুড়ি?

—না, এই অনেক। তোমার নাম কি?

লোকটা নাম বলিবার আগে গামছায় একবার মুখ মুছিয়া লইল, যেন তাহার বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে।—আমার নাম আখের আলি।

ভিতর হইতে একটা বৌ আসিয়া তাহার সামনে একটা বাটি নামাইয়া রাখিল। কাজল অবাক হইয়া বলিল—একি! দুধ কে খাবে?

বৌটি বলিল—খেয়ে নাও। আমাদের গরুর দুধ, ছিটেফোঁটাও

পানি নেই। চিনি দেওয়া আছে, মুড়ি দিয়ে খাও। শুধু-মুখে মুড়ি খেতে নেই।

কাজল আখেরকে জিজ্ঞাসা করিল—এ কে?

—আমার বৌ। ওর নাম রাবেয়া।

—এত দুধ খেতে হবে?

আখের আলি বলিল—উপায় নেই, রাবেয়া বিবি যখন ধরেছে, তখন আর—আমাকেই কেবল মোটে আদর যত্ন করে না।

রাবেয়া অনুচ্চ কণ্ঠে বলিল—আঃ!

কাজল ভাবিল, বড় হইয়া সে দেখা-মানুষ লইয়া—ইহাদের জীবন লইয়া উপন্যাস লিখিবে ডিকেন্সের মতো।

এমন সময় গলায়-খোঁটা সেই বাছুরটা গুটি গুটি আখেরের উঠানে আসিয়া ঢুকিল। আখের বলিল—ঐ এতক্ষণে এসেছে। সারাদিন ঘুরেফিরে এখন আসা হলো। আমি গিয়ে দেখি, বুঝলে, খোঁটা উপড়ে কোথায় হাওয়া হয়েছে। তারপর আসছে-আসছে করে এই এলো—

কাজল এক চুমুকে কিছুটা দুধ খাইয়া বলিল—তোমাদের বাছুর?

খাওয়া হইলে আখের কাজলকে লইয়া তাহার পোষা হাঁস-মুরগী ইত্যাদি দেখাইল। বলিল—কিছুদিন বাদে এসো, তোমাকে একটা হাঁসের বাচ্চা দেবো।

বইখানি বগলদাবা করিয়া কাজল আবার সেই বাঁশবন পার হইয়া মাঠে পড়িল। সূর্য ডুবিয়া গিয়াছে। বাঁশবাগানে ঘন ছায়া। সে যেখানটায় শুইয়াছিল, সেখানে বাঁশের খোলাগুলি এখনও পড়িয়া আছে। ছোটবেলায় নিশ্চিন্দিপুরে এই সময়টায় অন্ধকার বনের মধ্য দিয়া যাইতে ভয় করিত, ভাবিলে এখন হাসি পায়। গা-ছমছমে অনুভূতি একটা হয় ঠিকই, তবে তাহা ভূতের ভয় নহে।

বাঁশবনটার মাঝখানে সে হঠাৎ দাঁড়াইয়া গেল। ঘনায়মান অন্ধকারে সে একা! জনপ্রাণী নাই কোথাও কোনোদিকে। সন্ধ্যা শব্দহীনতায় বাঁশ দুলিবার শব্দটা আরও স্পষ্ট লাগে।

মাঠের ভিতর দিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে কাজল দেখিল, দিগন্তে মেঘ জমিয়া বিদ্যুৎ চমকাইতেছে। মনে অদ্ভুত আনন্দ। আখেরের সহিত সন্ধ্যাটা খুব ভালো কাটিয়াছে। অচেনা অজানা মানুষ কত তাড়াতাড়ি আপন হইয়া যায়। আবার সে এখানে আসিবে।

মাঠের উপরে সেই সন্ধ্যায় তাহার এক অপূর্ব অনুভূতি হইল। বুঝিল, তাহার জীবন অন্যদের বাঁচিবার প্রণালী হইতে একেবারে ভিন্ন রকম। অযথা সে পৃথিবীতে আসে নাই, তাহার একটা-কিছু করিবার আছে। দিগন্তের ঐ বিদ্যুৎ চমকেব মতো সে জীবনের একঘেয়ে আকাশে চমক দিয়া যাইবে। উত্তেজনার প্রাবল্যে জোরে জোরে হাঁটিয়া বাড়ি পৌছিয়া গেল।

ঘরে ঢুকিতেই সুরপতি বাবু ডাকিয়া বলিলেন—কোথায় ছিলি দাদু?

—বেড়াতে গিয়েছিলাম দাদু, ঐ গ্রামের দিকে।

—রাত-বিরেতে মাঠে-ঘাটে বেশী থাকিস্ নে, সাপ-খোপ বেরোয়।

কাজল হাসিয়া জামা-কাপড় ছাড়িয়া মুখ ধুইতে গেল। সুরপতি বাবু ডাকিয়া বলিলেন—চট করে হাত-মুখ ধুয়ে আয়। আজ একটু আলো নিভিয়ে বোস তো। বড় চঞ্চল হয়েছিস, তোর মনঃসংযোগ হবে না ইয়ে হবে—
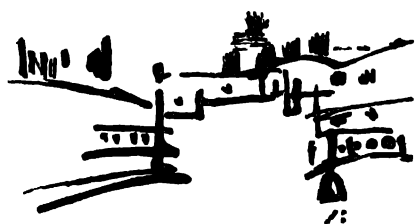
বিপুলগড়ের শিবমন্দিরে কাজল — নয়

হৈমন্তীর ঘরের দেওয়ালে দরজার মাথায় অপুর একখানা ছবি টাঙানো হইয়াছে। সারাজীবনে অপু ছবি তুলিয়াছে খুব কম। বিবাহের পরে পরেই হঠাৎ কি খেয়ালে কলিকাতার এক স্টুডিও হইতে ছবিটা তুলিয়াছিল। রোজ স্কুলে যাইবার সময় কাজল বাবার ছবিকে প্রণাম করিয়া বাহির হয়। ছবিটা উঠিয়াছিল সুন্দর। মনে হয় অপু হাসি-হাসি মুখে ফ্রেমের ভিতর হইতে তাকাইয়া আছে। পারতপক্ষে হৈমন্তী ছবির দিকে তাকায় না, তাকাইলে বুকটা কেমন করিয়া উঠে।

কাজলের স্কুল হইতে ফিরিবার পথে একটা দোকান পড়ে। ছাত্রেরা দোকান হইতে চকোলেট-বিস্কুট কিনিয়া খায়। সেদিন কাজল দোকানে ঢুকিল। উদ্দেশ্য, বিশেষ এক ধরনের লজেন্স্ ক্রয় করা। একদিন খাইয়া ভাল লাগিয়াছিল, আবার কিনিবার জন্য সুরপতি বাবুর নিকট হইতে পয়সা লইয়া আসিয়াছে। দোকানদারকে সবাই আন্টি বলিয়া ডাকে। ওষ্ঠদেশে প্রলম্বিত গুম্ফ-যুক্ত একজন দশাসই পুরুষের উদ্দেশ্য কেন যে উক্ত বিদেশী স্ত্রীলিঙ্গ শব্দটি প্রযুক্ত হয়, বোঝা মুশকিল। তবে মানুষটি ঐ ডাকে সাড়া দিয়া থাকে কোনো উষ্মা প্রকাশ না করিয়াই।

আন্টি কাজলকে লজেন্স্ গণিয়া দিতেছে, এমন সময় দোকানের পিছন হইতে বেশ ভাল গলায়-গাওয়া গান ভাসিয়া আসিল। কাজল জিজ্ঞাসা করিল—কে গান গাইছে আন্টি?

আন্টি বলিল—আপনাদের ইস্কুলেরই ছেলে, এখানে এসে বসে মাঝে মাঝে।

আন্টি তর্জনী আর মধ্যমা একত্রে ঠোঁটের কাছে ধরিয়া হুস-হুস করিয়া ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিল।

কৌতূহলী কাজল দোকানের পিছন দিকে ঢুকিল।

জায়গাটা আন্টির শুইবার স্থান। দরমার বেড়া দিয়া ঘেরা, উপরে টিনের চাল। মেঝেয় কালি-পড়া মেটে হাড়ি, এনামেলের সানকি, তোলা-উনান এবং ঘরের কোণে-রাখা একটা প্যাকিংবাক্সে তৈল-তণ্ডুলাদি। একপ্রান্তে দড়ির খাটিয়ায় ময়লা-কুটকুটে বিছানা, তাহার উপর বসিয়া একটি ফর্সামত ছেলে চোখ বুজিয়া হাত সামনে বাড়াইয়া রীতিমত ওস্তাদি ঢঙে গান গাহিতেছে। কোনো ষষ্ঠেন্দ্রিয় দ্বারা কাজলের উপস্থিতি বুঝিয়া সে গান থামাইল এবং চোখ খুলিয়া তাকাইল।

কাজল এবং ফর্সা ছেলেটি কিছুক্ষণ পরস্পরের দিকে তাকাইয়া রহিল। নীরবতা অস্বস্তিকর হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া কাজল বলিল গাও না, বেশ তো গাইছিলে।

ছেলেটি হাসিল। এবং ময়লা বিছানার এক প্রান্ত হাত দিয়া ঝাড়িয়া বলিল—এখানে বসো।

এতক্ষণে কাজলের মনে পড়িয়াছে, ছেলেটি তাহাদেরই ক্লাসে অন্য সেকশনে পড়ে। আলাপ হয় নাই—দূর হইতে বার কয়েক দেখিয়াছে। কাজল জিজ্ঞাসা করিল—তুমি তো বি-সেকশনে পড়ো না? তোমার নাম কি?

ছেলেটি মাথা পেছনে হেলাইয়া চোখ অর্ধনিমীলিত করিয়া গম্ভীর গলায় বলিল—আমার নাম ব্যোমকেশ চৌধুরী। তাহার ভঙ্গী দেখিয়া সন্দেহ হইতে পারিত, সে বলিতেছে—আমার নাম নেপোলিয়ন বোনাপার্ট।

কাজল বুঝিল একটি অদ্ভুত চরিত্রের সহিত পরিচয় হইতে চলিয়াছে। সে আন্টির বিছানায় বসিল।

—তুমি কি গাইছিলে ? সুন্দর সুর।

—মালকোষ গাইছিলাম, বেশ মেজাজ আসে গাইলে।

কাজল অবাক হইল। এ অঞ্চলে রবীন্দ্রসঙ্গীতই কেহ গায় না, তার উপর রাগসঙ্গীত !

—তুমি গান শেখো ?

—ছোড়দা শেখে। ছোড়দা ওস্তাদের কাছে শেখে, আমি ছোড়দার কাছে শিখি। কাজেই আমিও শিখি বলতে পারো। আমাদের দেশ বগুলায়। বগুলার নাম শুনেছো ? বগুলার কাছেই কুমারী-রামনগর গ্রামে আমাদের বাড়ি। বাবা ডাক্তার। তোমার বাড়ি কোথায় ?

—আমাদের দেশ নিশ্চিন্দিপুরে, সে-ও গ্রাম ! বাবা মারা যাওয়ার পর এখানে মামাবাড়িতে থাকি।

—রবিঠাকুরের কবিতা কেমন লাগে ?

কাজল বিপদে পড়িল। রবীন্দ্রনাথের কবিতা তাহার খুব বেশী পড়া নাই, দুই-একটা যাহা পড়িয়াছে, সম্পূর্ণ মানে বোঝে নাই। বলিল—বেশী তো পড়ি নি, যা পড়েছি বেশ লেগেছে।

অনেক কথাবার্তা হইল। কাজল দেখিল, ব্যোমকেশ একটু ছিটগ্রস্ত। মনের খুশীতে ঘোরে, গান গায়, বই পড়ে। মাঠে মাঠে ঘুরিয়া গাছপালা চিনিয়া বেড়ায়। এমন সব গাছপালার নাম করিল, যাহা কাজল চিনিলেও অনেক শহুরে ছেলে নামও শোনে নাই। উঠিবার সময়ে আড়মোড়া ভাঙিয়া বলিল—তা-ও কতকিছু ভুলে যেতে বসেছি। গ্রামে থাকতে অনেক কিছু জানতাম—

গ্রাম ছেড়ে এলে কেন ?

—ছোড়দা এখানে চাকরী করে। ছোড়দার কাছে থেকে পড়ি। বাবার একার আয়ে চলে না। নতুন পাস-করা ভালো ভালো সব ডাক্তার গিয়ে গিয়ে বাবার পসার মাটি করেছে। বাবা খুব তেজী লোক ছিলেন, জানো ? অনেকদিন আগে সেটেলমেণ্টের লোক জমি জরিপ করিতে গিয়েছিল—সঙ্গে ছিল, এক সায়েব। সায়েবের

মা কঠিন অসুখে পড়লে বাবা চিকিৎসা করে তাকে সারিয়ে তোলেন। সায়েব বলেছিল বাবাকে বিলেতে নিয়ে যাবে। এক রাত্তিরে বাবা তো পালিয়ে যাবার মতলব করলেন। বাবার বয়স তখন সাতাশ-আটাশ, রক্ত গরম। কথা ছিল মাইল দশেক দূরে এক জায়গায় দেখা করার, সেখান থেকে সায়েব বাবাকে নিয়ে চলে যাবে। ঠাকুমা কি করে জানতে পেরে আগে থেকে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালেন। বাবা ঘোড়ায় চেপে বাড়ির পাশের বড় আমবাগানটা পার হচ্ছেন, ঠাকুমা এসে পড়লেন একেবারে ঘোড়ার সামনে। বললেন—হরু, যেতে হয় আমার উপর দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে যা। বাবার আর বিলেত যাওয়া হোলো না।

পরের দিন আবার দেখা হইবে বলিয়া কাজল বিদায় লইল।

ব্যোমকেশের সহিত কাজলের ঘনিষ্ঠতা বেশ বাড়িয়া উঠিল। তুইজনে শহর ছাড়াইয়া গ্রামের দিকে বেড়াইতে যায়, কাঁঠালিয়া গ্রামের আখের আলির বাড়ি যায়। ব্যোমকেশ মাঠের মধ্যে হাত-পা নাড়িয়া গান করিতে করিতে হাঁটে। কখনো বৃষ্টি আসিলে তু'জনে দৌড়াইয়া চাষীদের ধান পাহারা-দেওয়া চালার নিচে আশ্রয় নেয়। বৃষ্টি দেখিতে দেখিতে ব্যোমকেশ বলে—চমৎকার বৃষ্টি, গাইতে ইচ্ছে করছে। দেশ আর মল্লার—এ তুটো ঝম-ঝম বৃষ্টিতে ভারী জমে, বুঝলে ?

কোথায় একটা পাখী ডাকিয়া ওঠে—কুউ-কুউ, কুউ-কুউ। স্বরটা খাদ হইতে আরম্ভ হইয়া চড়ায় গিয়া শেষ হয়। ব্যোমকেশ বলে—বর্ষাকোকিল ডাকছে, শুনছো ?

কাজল ডাকটা আগেও শুনিয়াছে, কিন্তু নামটা যে বর্ষাকোকিল তাহা জানিত না—বর্ষার কোকিল আছে নাকি আবার ?

—নেই তো ওটা কি ডাকছে ?

চারিদিকে বুক-সমান ধানগাছ দেখাইয়া ব্যোমকেশ বলে—রাম-নগরে এই রকম ধানক্ষেতে বর্ষার দিনে আমাকে একবার সাপে তাড়া করেছিল। টিপটিপ বৃষ্টি হচ্ছে, আলের উপর দিয়ে হাঁটছি, এমন

সময় ধানগাছের ভেতর থেকে বিরাট কেউটে এসে আলের ওপর উঠল। কি তার ফোঁস-ফোঁসানি, কি তার কুলোপানা চক্কর। নেহাৎ আমার কাছে বেদের-দেওয়া সাপের ওষুধ ছিল, তাই বেঁচে গেলাম।

—কি করলে ওষুধ দিয়ে?

—ওষুধ একরকম শেকড়। সাপের ভয়ে তাই সবসময় পকেটে নিয়ে ঘুরতাম—আমাদের ওদিকে ভীষণ সাপের উপদ্রব কিনা। ছোবল মারবে বলে সাপটা যেই ফণা তুলেছে, অমনি শেকড়টা বাড়িয়ে দিলাম। সাপ মাথা নিচু করে চলে গেল—না কামড়ে।

স্কুল-জীবনে ব্যোমকেশ কাজলের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল—একমাত্র বন্ধু। পরে অবশ্য যোগাযোগ ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল। প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিন দিন পরীক্ষা দিবার পর ব্যোমকেশ আর আসিল না। কে আসিয়া বলিল—স্কুলে আসিবার সময় সে দেখিয়াছে, ব্যোমকেশ মাঠের ধারে বসিয়া গান গাহিতেছে, পাশে খাতা-কলম দোয়াত।

পরীক্ষা হইয়া যাইবার পর কাজল ব্যোমকেশকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তুই পরীক্ষা দিলি না কেন?

ব্যোমকেশ হাসিল। পরীক্ষা দিবে বলিয়াই খাতা-কলম লইয়া সে বাহির হইয়াছিল—পথে মাঠের দৃশ্যটা এমন ভাল লাগিয়া গেল যে বসিয়া একটা গান না গাহিয়া সে পারে নাই। গানটা কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হওয়ায় দেড়ঘন্টা সময় পার হইয়া গিয়াছিল।

ব্যোমকেশ কোনোদিনই প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করিতে পারে নাই। বৎসর চারেক বাদে একদিন কাজলের সহিত তাহার দেখা হইয়াছিল—তখন ব্যোমকেশের খুব দুঃসময় যাইতেছে। পড়াশুনা হয় নাই, চাকরী পায় নাই। বাবা মারা গিয়াছেন, দাদার সংসারে অনটন—সেখানে বসিয়া বসিয়া খাওয়া ভাল দেখায় না। শুষ্ক মুখে চাকরীর সন্ধানে ঘুরিতেছে। আর গান গায় না, আগের সে প্রাণোচ্ছলতা নাই। কাজলের খুব খারাপ লাগিতেছিল, কিন্তু করিবার কিছুই ছিল না।

প্রথম আলাপের মাসখানেক বাদে এক বিকালে ব্যোমকেশ কাজলের বাড়িতে আসিল। কাজল ঘরে বসিয়া পড়িতেছে (পাঠ্য নহে—অপাঠ্য বই), হৈমন্তী আসিয়া বলিল—বুড়ো, তোকে কে ডাকছে। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। ভেতরে আসতে বললাম, এলো না।

কাজল বাহির হইতেই ব্যোমকেশ বলিল—খুব বেশী হলে পাঁচ মিনিট সময় দেওয়া যেতে পারে। চট করে একটা জামা গলিয়ে বেরিয়ে পড়বি। দেরী করিস না, যা -

—কিন্তু যাবোটা কোথায় ?

—সে সব পরে। আগে বেরিয়ে আয়।

বাহির হইয়া ব্যোমকেশ বলিল - বিপুলগড়ের শিবমন্দিরে যাবো, চল্। যাবো-যাবো করছিলাম, আজকে মনস্থির করে ফেলেছি।

—বিপুলগড়ে যাবি এখন ? তোর কি মাথা খারাপ ?

—মেলা বকিস না। খুব মজা হবে, দেখবি।

বিপুলগড় কাঁঠালিয়া ছাড়াইয়া অনেক দূরে। গ্রামের বাহিরে জঙ্গলের ভিতরে একটা পোড়ো-শিবমন্দির আছে। দিনের বেলাও কেহ সেখানে যায় না। কারণ প্রথমতঃ ঘন জঙ্গল, দ্বিতীয়তঃ মন্দিরে আকর্ষণীয় কিছু নাই। বড়লোক জমিদার শখ করিয়া মন্দির বানাইয়াছিল—তাহারা সপরিবারে কলিকাতায় উঠিয়া গিয়াছে। সে প্রায় সত্তর বৎসর আগের কথা। তাহাদের বড়বাড়ির ভগ্নাবশেষ পাশেই পড়িয়া আছে—জঙ্গলাবৃত অবস্থায়।

কাজল একটু আপত্তি করিয়া বলিল—বৃষ্টি আসতে পারে, দেখছিস না আকাশে মেঘ। অমন জায়গায় যাওয়াটা উচিত হবে এখন ?

—তবে থাক তুই।

ব্যোমকেশ সত্যিই চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া কাজল দৌড়াইয়া তাহাকে ধরিল।—রাগ করছিস কেন ? চল, আমিও যাবো।

আকাশে মেঘ ছিল—আরও মেঘ চাপিয়া অন্ধকার হইয়া আসিল। ব্যোমকেশ বলিল—অ্যাডভেঞ্চারের পরিবেশ তো এই। মেঘলা দিন, জঙ্গলের ভেতর পোড়ো মন্দির, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া। একেবারে পাঁচকড়ি দে-র গল্প, এঁ্যা?

ততক্ষণে কাজলেরও ভাল লাগিতে শুরু করিয়াছে। ওয়াইড ওয়ার্লড ম্যাগাজিন পড়িয়া বহু দুর্গম দেশে অ্যাডভেঞ্চার করিয়াছে সে মনে মনে। ঘন জঙ্গলের মধ্যে একটা সুঁড়িপথে তাহারা ঢুকিল। বেলা আছে, কিন্তু মনে হইতেছে সন্ধ্যা নামিল বলিয়া। শিবমন্দিরের চাতালে উঠিয়া দুইজনে দাঁড়াইল। মাথায় বটগাছ গজাইয়াছে, ভারী কাঠের দরজা ভাঙিয়া কব্জায় আটকাইয়া ঝুলিতেছে। চাতাল চৌকা-টালি বসাইয়া তৈয়ারী, এতদিন বাদেও বেশ মসৃণ। একটুও শব্দ নাই কোন দিকে, বাতাসে একটা বন্য গন্ধ।

কাজল চাতালের উপর বসিয়া পড়িল। কয়েকটা কালো ডেয়োপিঁপড়া এখানে-ওখানে ঘুরিতেছে। ঠিক নিচেই কতকগুলি বনতুলসীর গাছ জড়াজড়ি করিয়া আছে। দূরে ভাঙা নাটমন্দির দেখা যাইতেছে। কাজল ভাবিতেছিল, এই জায়গাটা না-জানি কত জাঁকজমকপূর্ণ ছিল! দোল-দুর্গোৎসবে কুলবধূরা ভিড় করিয়া পূজা দেখিত, ঝাড়লণ্ঠনের আলো প্রতিমার মুখে পড়িয়া ঘামতেল চকচক করিত। সন্ধ্যায় শাঁখ বাজিত, বৃদ্ধারা মালাজপ করিতেন। কে কোথায় চলিয়া গিয়াছে—কেহ নাই, কিছুই নাই। তাদের চিহ্ন পৃথিবী হইতে একেবারে মুছিয়া গিয়াছে, সাক্ষী হিসাবে রহিয়াছে কেবল এই ভাঙা নাটমন্দির।

ব্যোমকেশ ডাকিল—কাজল!

—কি?

—কি রকম একটা লাগছে না?

কাজল ব্যোমকেশের দিকে তাকাইল। ব্যোমকেশের মুখ গম্ভীর যেন একটা ভয়ানক-কিছুর জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

—কি রকম লাগছে মানে?

—চারিদিকে কেমন একটা থম থমে ভাব, তাই না? এমনি জায়গাতেই তো বহুদিনের মৃত আত্মারা নেমে আসে।

কাজল সমর্থন করিল। আসিয়াই জিনিসটা সে অনুভব করিয়াছে। বাতাসের রহস্যের গন্ধ—সাধারণত জীবনে যাহা ঘটে না, তাহা যেন এখানে এখনই ঘটিবে। কিছুদিন আগেই সে 'বিপভ্যান উইঙ্কল' পড়িয়াছে। ঐ সুঁড়িপথটির বাঁক হইতে এখনি হাফমুন জাহাজের কোন মৃত নাবিক বাহির হইয়া আসিলে সে বিন্দুমাত্র অবাক হইবে না।

ব্যোমকেশ বলিল—মন্দিরের ভিতর ঢুকে দেখি চল—

ভিতরে বেশ অন্ধকার। তার মধ্যেই দেখা গেল, মন্দিরের ভিতরে কালো পাথরের শিবলিঙ্গ—তাহার মাথায় কয়েকটি ফুল। ঘরের ভিতরে আর কিছু নাই—দেওয়ালে একটা কুলুঙ্গি ছাড়া।

বাহিরে আসিয়া ব্যোমকেশ বলিল—একটু ভুপালী গাই।

কাজল হাঁটুর উপর থুতনি রাখিয়া শুনিতে লাগিল। ভুপালী রাগ ব্যোমকেশ ভালই আয়ত্ত করিয়াছে। দরাজ গলায় ষড়জ লাগাইয়া আলাপ শুরু করিল। এমন সময় কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি পড়িল। গান থামাইয়া ব্যোমকেশ উপর দিকে তাকাইয়া বলিল—বৃষ্টি এলো বলে মনে হচ্ছে।

কথা শেষ হইতে না হইতে ঝম ঝম করিয়া বৃষ্টি নামিল। ব্যোমকেশ লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—ঢোক মন্দিরে।

হুড়মুড় করিয়া মন্দিরে ঢুকিল। বৃষ্টির তোড় প্রতি মুহূর্তে বাড়িতেছে। সাবধানে শিবলিঙ্গের স্পর্শ বাঁচাইয়া দুইজনে এক কোণে চুপ করিয়া দাঁড়াইল। দরজার ফ্রেমে আটকানো বাহিরের বনজঙ্গল, মন্দিরের চাতালের কিয়দংশ প্রচণ্ড বৃষ্টিতে অদ্ভুত দেখাইতেছে। কাজল বলিল—মুশকিল হোলো, এখন ফিরবো কি কোরে?

—ফেরবার তাড়া কিসের? বেশ তো লাগছে। ব্যোমকেশের গলা স্বপ্নালু।

বৃষ্টি কমিল না। জোলো হাওয়া এক একবার ভীষণ দাপটে দরজার ভাঙ্গা পাল্লাটাকে খট খট করিয়া নাড়িতেছে। বাতাসের জোর খুব বাড়িয়াছে, অত ভারী পাল্লাটা নড়িতেছে যখন। মাঝে-মাঝে বৃষ্টির ছাঁট আসিয়া পড়িতেছে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় শীত-শীত করিতে লাগিল।

বাহিরে হাওয়ার মাতামাতি—অন্ধকার, ভিতরে ব্যোমকেশের গান। কাজল ভুলিয়া গেল বাড়ী ফিরিতে আজ অনেক দেরী হইবে, মা ভাবনা করিবে। ভুলিয়া গেল যে স্থানে তাহারা বসিয়া আছে, তাহা আদৌ নিরাপদ নহে। রোমাঞ্চকর পরিবেশ তাহাকে সব ভুলাইয়া দিয়াছিল।

দরজার কাছে দাঁড়াইয়া কাজল বাহিরে তাকাইল। ভাঙা নাটমন্দিরের দিকটা একেবারে ভূতের দেশ বলিয়া মনে হইতেছে। বিদ্যুৎ চমকাইলে চারিদিক পলকের জন্য আলোকিত হইয়া উঠিয়াই আবার আবছা অন্ধকারে ডুবিয়া যাইতেছে। দরজার দুইদিকে হাত রাখিয়া সে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল।

এক নাগাড়ে প্রায় চার ঘণ্টা বৃষ্টি হইয়া তারপর থামিল। ব্যোমকেশ আর কাজল পাশাপাশি হাঁটিয়া বাড়ি ফিরিতেছিল। কাহারও মুখে কথা নাই। এই চার ঘণ্টার অভিজ্ঞতা তাহাদের প্রাণ পূর্ণ করিয়া দিয়াছে। মেঘ জমিয়া আছে, তবে বৃষ্টি নামিবার আপাতত আশঙ্কা নাই।

রাত্রে কাজল চোরের মত বাড়িতে পা দিল, তখন তাহাকে খুঁজিবার জন্য লোক বাহির হইয়া গিয়াছে।

একদিন কানে আসিল খঞ্জনীর বাজনা—কে যেন খঞ্জনী বাজাইয়া গাহিতেছে। মানুষটা কাজলের চেনা চেনা লাগিল, তারপরই দৌড়াইয়া লোকটির কাছে গিয়া ডাকিল রামদাস কাকা!

রামদাস প্রথমে কাজলকে চিনিতে পারে নাই। একটু পরেই প্রসন্ন হাসিতে তাহার মুখ ভরিয়া গেল। পুরাতন দিনের অভ্যাস

মত খঞ্জনীটা একবার দ্রুত বাজাইয়া বলিল—খোকন বাবা না? তুমি এখানে কোথায়? তোমাকে তো মাধবপুরের মাঠে দেখেছিলাম·—

কাজল তাহাকে সমস্ত ঘটনা বলিল, শুনিয়া রামদাস অনেকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। একটু পরে গলা সাফ করিয়া বলিল—বাবার সঙ্গে দেখা হলো, আমারই দোষ। আমি তোমাকে কথা দিয়েছিলাম তোমাদের বাড়ি যাবো—গিয়ে উঠতে পারিনি।

কাজল দেখিল রামদাস একই রকম আছে, বিশেষ বদলায় নাই। কথায় কথায় হাসে, কথায় কথায় খঞ্জনী বাজায়। অপুর মৃত্যুর কথা শুনিয়া সে একটুখানি গম্ভীর হইয়াছিল বটে, কিন্তু পরমুহূর্তেই হাসিয়া বলিল—আমারই বা আর ক'দিন, খোকন বাবা? তাঁর নামেই জীবন, তাঁর নামেই মৃত্যু—নিজের নামে কিছু রাখলেই যত বখেড়া এসে জোটে। বেশ তো আছি তাঁর নাম করে—

কাজল বলিল—তুমি আজ আমাদের বাড়ি যাবে চলো, কোনো কথা শুনবো না।

—কিন্তু আজকাল আমি একবেলা আহার করি, ওবেলা একবার হয়ে গেছে।

—মিষ্টি খাবে চল, তাতে দোষ নেই। মা তো একাদশীর দিন মিষ্টি খান।

—মিষ্টি খাওয়া যায় হয়তো, কিন্তু অত হাঙ্গামার কি দরকার? খাওয়াটাই সব নয়, তার চেয়ে কোথাও বসে একটু কথা বলি তোমার সঙ্গে।

কাজল কিছুতেই শুনিল না, রামদাসকে বাড়ি লইয়া গেল। হৈমন্তী যত্ন করিয়া আসন পাতিয়া বসাইয়া খাওয়াইল। খাইতে পাইয়া রামদাস ছেলেমানুষের মত খুশী হইল। খাইবে না খাইবে না করিয়া অনেকগুলি মণ্ডা খাইয়া ফেলিল। হৈমন্তী মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল—আর দেবো বাবা? রামদাস ব্যস্ত হইয়া বলিল—আর না, আর। খোকন বাবা, এবার তুমি খাও—

—আমি খেয়েছি কাকা, চলো তোমার সঙ্গে বরং একটু ঘুরে আসি।

বাহির হইবার আগে হৈমন্তী রামদাসকে বেশ বড় রকমের একটা সিধা আনিয়া দিল, সিধার চালের উপর একটা টাকাও আনিয়াছে। রামদাস হাসিয়া বলিল—এত সব কার জন্যে ?

—এ আপনাকে নিতে হবে বাবা, সামান্য দিয়েছি।

—শ্রদ্ধার দান মাত্রই অসামান্য, সামান্য নয়। কিন্তু এ তো আমি নিতে পারবো না।

—কেন বাবা।

—প্রয়োজন মত আমি ভিক্ষা করি, প্রয়োজনের অধিক কখনও নিই না। তাতে আর একজনের অন্নে ভাগ বসানো হয়। আজ ভিক্ষা করে কালকের মত চাল পেয়ে গেছি—আজ আর নেবো না।

বহু অনুরোধেও রামদাস রাজী হইল না। রাস্তায় বাহির হইয়া কাজলকে বলিল—নিলে কেবল লোভ বাড়ে, লোভ বড় খারাপ জিনিস খোকন বাবা। লোভ কথাটা উচ্চারণ করিবার সময় সে এমন ভাব করিল যেন সামনে সাপ দেখিয়াছে।

কাজল বলিল—তোমাকে যদি এখন কেউ এক লাখ টাকা দেয়, তাও নেবে না ?

—কি করবো নিয়ে ? তাতে আমার মনের শান্তি চলে যাবে, সবসময়ে ভালো খেতে ভালো পরতে ইচ্ছে হবে। রাত্তিরে জেগে বসে থাকতে হবে, পাছে চোরে টাকা নিয়ে যায়। এই করে করে যখন বুড়ো হব, তখন হঠাৎ একদিন দেখবো আমার একলাখ টাকা কবে জমার খাতা থেকে খরচের খাতায় চলে গেছে, জমার খাতায় মস্ত বড় একটা শূন্য। না না খোকন বাবা, তিনি আমাকে যেন কখনো টাকা পয়সা না দেন—সে আমি সহ্য করতে পারবো না, মরে যাবো।

কাজলের রামদাসের প্রতি শ্রদ্ধা হইল। সে বলিল—কিন্তু সারাজীবন এইভাবে ছন্নছাড়ার মতো ঘুরে বেড়াতে তোমার ভালো লাগিবে ? শেষ জীবনে একটা আশ্রয় তো দরকার—

রামদাস মৃদু মৃদু খঞ্জনী বাজাইতে বাজাইতে বলিল—ছন্নছাড়া ! আমাকে ছন্নছাড়া বলছো, তোমার সাহস তো কম নয় বাবাজী।

আমাকে তিনি যেমন রেখেছেন, তেমনি আছি। তিনি যেমন ভাবে যেখানে খেলা শেষ করতে বলবেন, সেখানে তেমনিভাবে খেলা শেষ করে দেবো। তাঁর হাতে আছি—তার মধ্যে আবার খারাপ ভালো কি ?

কাজলের পক্ষে যদিও রামদাসের দর্শনের গভীরে প্রবেশ করা করা সম্ভবপর নয়, তবুও তাহার কথা কাজলের ভালো লাগিতেছিল। সহজ বিশ্বাসের সুরটি তাহার হৃদয় অধিকার করিতে বেশী সময় নেয় নাই।

কাজল বলিল—এর মধ্যে অনেক ঘুরেছ তুমি, না ? গল্প বলো না, শুনি।

হ্যাঁ, এই চার বৎসরে রামদাস অনেক ঘুরিয়াছে—অনেক নূতন জায়গা দেখিয়াছে। এক স্থানে সে বেশীদিন থাকিতে পারে না, প্রাণ পালাই-পালাই করে। ছুনিয়াটা যদি ঘুরিয়াই না দেখিবে, তবে ঈশ্বর তাহাকে চোখ ছুইটা দিয়াছেন কি প্রয়োজনে ?

একবার তাহার এক সাকরেদ জুটিয়াছিল। সে জোগাড় করে নাই, লোকটা জুটিয়া গিয়াছিল। ভক্তিভাবের কথা বলে, গদগদ কণ্ঠস্বর। দিন সাতেক ছিল সঙ্গে। এক শহরে কোন বড়লোকের বাড়ি গান করিয়াছিল রামদাস। তাহারা খুশি হইয়া রামদাসকে একখানা নূতন কাপড় দিয়াছিল। রাত্রে সামান্য আহার করিয়া ছুই জনে একটা হাট-চালায় শুইয়াছিল। পরদিন সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া দেখে সাকরেদটি উধাও—নূতন কাপড়খানাও নাই।

কাজল বলিল—তুমি কি করলে তখন ?

—কি আর কোরব ? ভারী ছুঃখ হ'ল মনে। কাপড়টা চেয়ে নিতে পারতো আমার কাছ থেকে, আমি দিয়ে দিতাম। অনর্থক চুরি করে সে পাপের ভাগী হলো।

—তোমার রাগ হলো না ?

—না বাবাজী। তার নিশ্চয়ই আমার চেয়ে বেশী দরকার ছিল, নইলে সে নেবে কেন ? তবে আমাকে বললেই পারতো। মানুষের

অসাধুতা দেখলে বড় কষ্ট পাই মনে। কি লাভ অসাধুতায়। সেই তো একদিন সবকিছু ছেড়েছুড়ে বেরিয়ে পড়তে হবে চিরদিনের জন্য, তবে আর কেন পিছনে কুকীর্তি রেখে যাওয়া ?

রামদাস বিদায় লইবার আগে কাজল তাহাকে বলিল—তুমি মাঝে মাঝে আসবে তো রামদাস কাকা? আমাদের বাড়ী তো চেনা হয়ে গেল।

—বলতে পারি না বাবাজী। কখন কোথায় থাকি তার তো ঠিক নেই। আজ এখানে আছি, কাল থাকব আর এক জায়গায়। দেখ না, সেই মাধবপুরের মাঠের পর আবার কতদিন বাদে আমাদের দেখা হলো।

—তুমি বোধ হয় কাউকেই বেশী ভালোবাসে না রামদাস কাকা, তাহলে কি না দেখে থাকতে পারতে ? খালি ঘুরে ঘুরে বেড়ালে কি আর একজনকে ভালোবাসা যায় ?

প্রশ্নটা শুনিয়া রামদাস কেমন অন্যমনস্ক হইয়া গেল, আনমনে খঞ্জনীতে টিনটিন আওয়াজ তুলিতে লাগিল। কাজল বলিল—সত্যিকথা বলি নি, কাকা ?

মুখটা এদিকে ফিরাইয়া রামদাস বলিল—একজনকে ভালোবাসার জন্য তো জীবনটা নয় বাবাজী, আমি চেয়েছিলাম সবাইকে ভালোবাসতে। তা আর হোলো কই ? একজনকে ভালোবাসলে জীবনটা বড় ছোট হয়ে যায়। কিন্তু সবাইকে ভালোবাসার মত হৃদয়ও তো ভগবান আমাকে দেন নি, কি করি তুমিই বলো ?

একটু চুপ করিয়া রামদাস বলিল—এখন মনে হয় গাছ নদী ফুল ফল সবকিছুর ভেতরেই আলাদা করে দেখবার মত রূপ আছে, এমন কি পাথরের মধ্যে, মাটির মধ্যেও আলাদা সত্তা—আমি তাই দেখি। কি পেলে চাওয়া আমার পূর্ণ হয় তা আমি এখনও জানি না—তারই সন্ধানে ঘুরে বেড়াই।
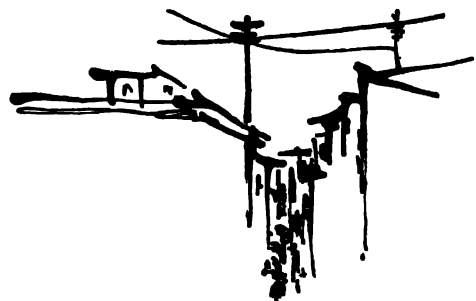
কলেজ জীবনে কাজল — দশ

স্কুল হইতে বাহির হইয়া কাজল রিপন কলেজে ভর্তি হইল। প্রবেশিকা পরীক্ষায় সে খুব ভাল ফল করিয়াছিল—বিশেষতঃ ইংরাজীতে। যে কোনো অধিকতর অভিজাত কলেজে সহজেই সে ভর্তি হইতে পারিত, কিন্তু এক রকম জিদ করিয়াই রিপনে ভর্তি হইল। কাজল একদিন আদিনাথ বাবুকে প্রণাম করিতে গেল। আদিনাথ বাবু আদর করিয়া তাহাকে ঘরের ভিতর লইয়া গেলেন। কাজল বলিল—আশীর্বাদ করুন সার, যেন মানুষ হতে পারি। সবাই বলছে রিপনে ভর্তি না হয়ে প্রেসিডেন্সী বা অন্য কোথাও যাওয়া উচিত ছিল।

আদিনাথ বাবু চশমা খুলিয়া কোঁচার প্রান্তে কাচ পরিষ্কার করিতে করিতে বলিলেন—মানুষ হওয়া তোর কেউ আটকাতে পারবে না কাজল। অনেকদিন ধরে শিক্ষকতা করছি, চুল পেকে গেছে—আমি মানুষ চিনি। তোর মধ্যে যে ক্ষমতা আছে, সেটা নষ্ট হতে দিস্ না।

চশমা মুছিবার পর, না পরিয়া অনেকক্ষণ সেটা হাতে ধরিয়া রাখিলেন। অন্যদিকে তিনি তাকাইয়া আছেন। হঠাৎ তাঁহাকে যেন বেশি বৃদ্ধ দেখাইতে লাগিল। কাজল ভাবিল—বড্ড বুড়ো হয়ে গেছেন সার, বয়সের তুলনায়। চোখের নীচে কালি পড়ে গিয়েছে। একা মানুষ, কত আর খাটবেন!

মুখ ফিরাইয়া আদিনাথ বাবু বলিলেন—কত আশা ছিল বড় হবো, নাম করবো। সেইভাবেই জীবনটাকে তৈরী করবার চেষ্টা করে ছিলাম। তারপর সংসারের ঘানিকলে বাঁধা পড়ে ঘুরছি তো ঘুরছিই। বিলেত যাবার খুব ইচ্ছে ছিল। এখন সে কথা মনে পড়লে হাসি পায়। কত চিন্তা করেছি রাত্তিরে শুয়ে শুয়ে, ভেবেছি পালিয়ে চলে যাই। কিন্তু ততদিনে বড়খোকা হয়েছে, ফাঁদে আটকা পড়ে গেছি। আর যাওয়া হলো না।

নিঃশ্বাস ফেলিয়া আদিনাথ বাবু বলিলেন—জীবন তো প্রায় শেষ হয়ে এলো কাজল।

কাজল জানে মাস্টারমশাই খুব দুঃস্থ—মেয়ের বিবাহে সব টাকা যোগাড় করিতে না পারিয়া চড়া সুদে ধার করিয়াছিলেন, এখনও তাহা শোধ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। বামুনপাড়ার মতি মুখুজ্যে টাকাটা মাসিক দুই আনা সুদে ধার দিয়াছিল মওকা বুঝিয়া। আদিনাথ বাবু অনুরোধ করিয়াছিলেন সুদের হার এক আনা করিতে —মতি মুখুজ্যে শোনে নাই। ইস্কুলে কে যেন তাহাকে বলিয়াছিল কথাটা। মতি মুখুজ্যের পাশাপাশি তাহার রামদাস বোষ্টমের কথা মনে পড়িল—দুইটি চরিত্রের অদ্ভুত বৈপরীত্যের জন্য।

আদিনাথ বাবু কাজলের আপত্তি না শুনিয়া তাহাকে পেট ভরিয়া জলযোগ করাইয়া ছাড়িলেন।

কলেজ সম্বন্ধে কাজলের বিরাট ধারণা ছিল। স্কুলে সে ব্যোমকেশ ছাড়া মনের মতো সঙ্গী পায় নাই। ভাবিয়াছিল কলেজে তো কত ভালো ছাত্র পড়িতে আসে দূর দূরান্ত হইতে, একজনও কি তাহার পছন্দমত হইবে না? প্রতাপ বলিয়াছিল, এই মফঃস্বলে তোর বন্ধু হবে না কাজল—কোলকাতার কলেজে যখন পড়বি, দেখবি কত ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র আছে দেশে।

ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র দিয়ে কি করবো মামা? আমি চাই এমন বন্ধু, যে আমার মনের কথা বুঝতে পারবে, আমার মতো যে চিন্তা করবে।

—হলে কোলকাতাতেই হবে।

কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখিল তাহা হইতেছে না। ছাত্রদের মধ্যে অধিকাংশই নিরীহ, গোবেচারা। দু'একটি বড়লোকের ছেলে আছে —তাহারা গরমে আদ্দির পাঞ্জাবী শীতে সার্জের কোট পরিয়া কলেজে আসে, কথায় কথায় সিগারেট খায় এবং পরস্পরের পিতার কাজকর্ম লইয়া আলোচনা করে। তাহাদের সহিত কথা বলিতে গিয়া কাজল বোকা বানিয়া ফিরিয়াছে। কাজলকে তাহারা গ্রাহ্যের মধ্যে আনে নাই। মোটের উপর কাজল দেখিল গত কয়েক বৎসরে তাহার মানসিক বৃদ্ধি জ্যামিতিক হারে হইয়াছে, ফলে তাহার চারিধারে বহু দূর অবধি লোকজন নাই। অগত্যা সে লাইব্রেরীতে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

ছেলেবেলায় বাবার কাছে রিপন কলেজের লাইব্রেরীর গল্প শুনিয়াছিল। প্রত্যেকটা বইয়ে যেন বাবার স্পর্শ লাগিয়া আছে। নানা বিষয়ে কৌতূহল থাকার দরুন লাইব্রেরীর ভিতরে সে যেন দিশাহারা হইয়া ওঠে। কোন বইটা ছাড়িয়া কোন্‌টা পড়িবে, ঠিক করিতে পারে না। কতকগুলি পছন্দসই বই-এর লিস্ট করিয়া ফেলিল সে, এক এক করিয়া পড়িবে। এই ব্যাপারে তাহার কিছু সুবিধা ছিল, এমন সব বইয়ের সে স্লিপ দিত, যাহা সাধারণতঃ কেহ নেয় না। দপ্তরী তাক হইতে বই পাড়িয়া তাহার হাতে আনিয়া দিলে সে ফুঁ দিতে দিতে বলে, বাব্বাঃ! বেজায় ধূলো জমে গেছে দেখছি।

দপ্তরী হাসিয়া বলিত—বহু কাল বাদে বেরুলো তো বাবু।

কাজল অবাক হইয়া যায়? এত ভালো বই কেহ পড়ে না কেন? তাহাকে যদি লাইব্রেরীতে থাকিতে দিত, দিনরাত সে মাদুর পাতিয়া বসিয়া বই নামাইয়া নামাইয়া পড়িত। চাকরী হইলে সে টাকা জমাইয়া ভাল লাইব্রেরী করিবে—বাড়ীতে। মৌপাহাড়ীতে গিয়া থাকিবে তখন; সেখানকার স্কুলে মাষ্টারী করিবে। কলিকাতা হইতে বই কিনিয়া একটা ঘর সে ভর্তি করিয়া ফেলিবে। দেওয়াল

দেখা যাইবে না, শুধু আলমারী। সারাদিন বই-এর মধ্যে কাটানো—উঃ! এত বেশী আনন্দ আর কিসে পাওয়া যাইতে পারে?

কাজলের উর্দু শিখিবার শখ হইল। কি-একটা বই পড়িতে পড়িতে সে মির্জা গালিবের দুইটা লাইন পাইয়াছিল। লাইন দুইটা তাহার এত ভাল লাগিল যে ক্রমশঃ উর্দু কবিতা সংগ্রহ করা তাহার বাতিকে দাঁড়াইয়া গেল। কলেজে এক সহপাঠীকে সে উর্দু কবিতা আবৃত্তি করিয়া শোনাইতেছিল, ছেলেটি তাহাকে উর্দু শিখিবার উপদেশ দেয়। কথাটা মনে ধরিল। অনেক সন্ধানের পর এক বৃদ্ধ মুসলমান ভদ্রলোককে পাওয়া গেল, তিনি সপ্তাহে তিনদিন সন্ধ্যায় কাজলকে উর্দু পাঠ দিতে রাজী হইলেন। সন্ধ্যাবেলা খাতা হাতে কাজল তাঁর কাছে গিয়া হাজির হয়। মালতীনগরের প্রান্তে এক মসজিদে তিনি থাকেন, সবাই মৌলবীসাহেব বলিয়া ডাকে। কাজল গেলে মৌলবী-সাহেব হাসিয়া বলেন—সেলাম আলেকম্। ইহার প্রত্যুত্তরও কাজল তাঁহার নিকট হইতে শিখিয়া লইয়াছে—সে মাথা ঝুঁকিয়া বলে, ও আলেকম্ সেলাম। মৌলবীসাহেব বুঝাইয়া বলিলেন—এটা হচ্ছে শুভেচ্ছা জানানো, ভগবানের আশীর্বাদ প্রার্থনা করা। একজন বলছে—তোমার ওপরও ভগবানের আশীর্বাদ নেমে আসুক; অন্যজন বলছে—তোমার ওপরও ভগবানের আশীর্বাদ নেমে আসুক।

মৌলবীসাহেবের ছোট ঘরে মোমবাতি জ্বলে, মাদুরের উপর বসিয়া কাজল মনযোগ দিয়া আপাত বৈসাদৃশ্যহীন উর্দু অক্ষরের পার্থক্য বুঝিবার চেষ্টা করে। মৌলবীসাহেব হাঁ-হাঁ করিয়া বলেন--নেহি, নেহি, এয়সা কর্‌কে লিখ্‌খো—ইয়ে হম্‌জা নেহি হুয়া।

কখনো কখনো তিনি মূল ফারসী হইতে কাজলকে ওমর খৈয়াম পড়িয়া শোনান। বলেন—এই কবিতা অনেক গোঁড়া মুসলমান অপচ্ছন্দ করে। এতে নাকি অধর্মের কথা, ভোগবিলাসের কথা লেখা আছে। আমি কিন্তু তা মানি না—যা ভালো কবিতা, তা না পড়ে আমি থাকতে পারি না।

ওমর খৈয়াম শুনিয়া কাজলের এত ভাল লাগিল যে সে একখানা

ফিট্‌জেরাল্‌ড্‌ অনূদিত রুবাইয়াত-ই-ওমর খৈয়াম কিনিয়া ফেলিল। কেননা ফারসী বুঝিবার ক্ষমতা তাহার নাই। ওমর খৈয়ামের জীবন রহস্য মধ্যপ্রাচ্যের অতীত দিনগুলির রোমান্টিক অনুভূতি কাজলকে মুগ্ধ করিল। কি সুন্দর এক একটি কবিতা—

They say the Lion and Lizard keep
The courts where Jamshyd gloried
and drank deep
And Bahram, that great hunter—the Wild Ass
Stamps o'er his Head, but cannot
break his sleep.

'অনিবার্যভাবে মৃত্যু আসিয়া দাম্ভিক নৃপতি এবং বলদর্পী শিকারীকে চিরকালের মত ঘুম পাড়াইয়া গিয়াছে, তাহাদের সমাধির উপরে বাড়িয়া-ওঠা জঙ্গলে বন্য গর্দভের মাতামাতিও আর তাহাদের ঘুম ভাঙাইতে পারে না।'

মৌলবীসাহেব বলেন—তাড়াতাড়ি শেখার চেষ্টা করো, উর্দু সাহিত্যে ঢুকলে মুগ্ধ হয়ে যাবে। তাছাড়া উর্দু হয়ে গেলে ফারসী শেখাও বিশেষ আর কষ্টকর হবে না।

মেজাজ ভালো থাকিলে তিনি বলেন—আজ পড়া থাক—এসো, তোমাকে কিছু শের শোনাই। সম্রাট বাহাদুর শাহের লেখা কবিতা শুনবে? একেবারে শেষ জীবনে লেখা, শোনো—

উম্‌রে দরাজ-মাঙ্‌কর লায়ে থে ইয়ে চার রোজ।
দো আরজুমে কাট্‌গয়ে, দো ইন্ত্‌জারমে॥
* * *
কিত্‌না হ্যায় বদনসীব জাফর দফ্‌নেকে লিয়ে।
দো গজ জমিন না মিল সকি ইস্‌ কুয়েয়ার মে॥

কিছুদিন যাতায়াত করিয়া কাজলের উর্দু শেখার উৎসাহ গেল। জটিল ব্যাকরণ এবং ততোধিক জটিল লিখন-প্রণালী সে কিছুতেই আয়ত্ত করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। অবশ্য উর্দু সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ তাহার থাকিয়াই গেল।

কাঁঠালিয়া গ্রামে কাজল এগার

শীত আসিতেছে। সকালে ঘাসে আলগা শিশির লাগিয়া থাকে, শেষরাতের দিকে চাদর গায়ে টানিয়া দিতে হয়। সন্ধ্যাবেলা ঘরে ঘরে উনানে আঁচ পড়িলে ধোঁয়া জমিয়া যায়, বাতাস না থাকায় ধোঁয়া সরে না। রাত্রে আকাশ একেবারে পরিষ্কার হইয়া যায়, মেঘ আসিয়া নক্ষত্রদের ঢাকিয়া দেয় না। পাড়ায় পাড়ায় ধুনুরীদের হাঁক শোনা যায়—লেপ বানাবে নাকি মা-ঠাকরুন, বাছাই-করা ভালো তুলো ছিলো—

তারপর শীত আসিয়া গেল। কাজল শীতকাল ভালবাসে, শীত পড়িলে তাহার মনের ভিতরে একটা বড় রকমের ওলটপালট হয়। যে মন লইয়া সে গ্রীষ্ম উপভোগ করে, তাহা লইয়া কখনই শীতের রিক্ত রূপ উপলব্ধি করা যায় না। শীত আসিবার আগে হইতেই সে মনে মনে প্রস্তুতি চালাইতে থাকে, মনের জানালা হইতে পুরাতন পর্দা খুলিয়া নূতন পর্দা লাগায়, ফ্রেম ছবি হইতে খুলিয়া রাখিয়া দেয় সেখানে নূতন ছবি লাগাইবে বলিয়া। হেমন্তের মাঠে মাঠে হাঁটিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে শীতের জন্য তাহার মন তৈয়ারী হইয়া ওঠে। খাইতে বসিয়া রান্নায় ধনে পাতার গন্ধ পাইলেই বোঝা যায় আর দেরী নাই।

ঠাণ্ডার মধ্যে মাঠে ঘুরিতে আলাদা আমেজ। মৃদু রৌদ্রে পিঠ দিয়া দূরে তাকাইয়া থাকিলে ক্রমশঃ মনটা উদাস হইয়া যায়। কলিকাতার কলরবের ভিতর সে নিজেকে ঠিক মেলিয়া ধরিতে পারে না—নিজের মনে বসিয়া চিন্তা করিবার অবকাশও সেখানে নাই। সমস্ত সপ্তাহ নগর-জীবনের কোলাহলের মধ্যে কাটাইয়া একটা দিন

শীতের মাঠে কাটাইতে ভাল লাগে। আল ছাড়াইয়া মাঠে নামিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে পায়ের নিচে মাটির ঢেলা গুঁড়াইয়া যায়, রৌদ্রদগ্ধ মাটি হইতে কেমন গন্ধ আসিতে থাকে—যে গন্ধ নিশ্চিন্দিপুরে ছোটবেলায় সে পাইত।

একদিন হাতকাটা সোয়েটারটা লইয়া কাজল কাঁঠালিয়ার মাঠে বেড়াইতে গেল। রৌদ্র তখন পড়িয়া আসিয়াছে, ঠাণ্ডা কিছুক্ষণ বাদেই হাড়ের ভিতর ছুঁচ ফুটাইতে আরম্ভ করিবে।

কাঁঠালিয়ার বাঁশবনটায় ঢুকিতে মনে হইল সে যেন স্বপ্নের রাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। উৎসব-দিনে বাড়ীর ছাদে সামিয়ানা খাটাইলে তাহার নিচে দ্বিপ্রহরেও যেমন একটা নরম আলো থাকে, বাঁশবনের ভিতর তেমনি। না নড়িয়া চুপ করিয়া থাকিলে বাঁশপাতা ঝরিয়া-পড়ার হালকা শব্দ শোনা যায়। বাতাস ক্রমেই ঠাণ্ডা হইতেছে, কিন্তু শীতের আমেজ জমাইবার জন্য কাজল সোয়েটার পরে নাই। একটা বাঁশের গায়ে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া সে অনুভব করে, এ সমস্ত ছাড়িয়া সে বাঁচিতে পারিবে না। কলিকাতা তাহাকে প্রিয় বস্তু হইতে দূরে লইয়া যাইতেছে।

পানাপুকুরের পাশ দিয়া কাজল আখের আলির বাড়ি গেল। আখের উঠানের কিছু অংশ লইয়া একটা মুদির দোকান দিয়াছে। জিনিসপত্র বেশী নাই, নূতন দোকান। ব্যস্ত হইয়া আখের তাহাকে একটা নড়বড়ে কাঠের টুলে বসিতে দিল। কাজল বসিয়া বলিল—কেমন আছ আখের ভাই?

—আমাদের আবার থাকা না থাকা, তুমি কেমন আছ সেইটেই বড় কথা। তুমি তো এখন কলেজে পড়ো, না?

—হ্যাঁ, আই-এ পড়ি।

—ক'বছর লাগে এটা পড়তে?

—দু'বছর। তারপর পাশ করলে আবার দু'বছর লাগে বি-এ পড়তে।

—বাব্বাঃ! তোমাদের দেখছি সারাজীবন ধরে পড়া আর পড়া। পড়া শেষ হতে হতে তো বুড়ো হয়ে যাবে।

—পড়াশুনো না শিখলে চলবে না আখের ভাই, চাকরী তো করতে হবে।

আখের একটা বড় রকমের নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—তা তো বটেই। আমার মতো নয়, সারাটা জীবন এখানেই কাটল—কিছুই শিখতে পারলাম না।

—কতদিন আছ তোমরা এখানে?

—অনেকদিন হয়ে গেল, আমার ঠাকুরদার বাবা প্রথমে এই জায়গায় এসে বসতি করেন। আমার সারাজীবন এই গ্রামে কাটল —বারকয়েক কলকাতায় গিয়েছি বটে, কিন্তু দেশ বেড়ানো যাকে বলে তা কিছুই হয়নি আমার কপালে।

এর পর আখের তাহাকে খাওয়াইতে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কাজল খাইবে না, সেও ছাড়িবে না। দোকানের টিন হইতে একটা ঠোঙায় করিয়া মুড়কি তাহার হাতে দিয়া বলিল···খাও, ভাল মুড়কি। নিজেদের খাবার জন্য রয়েছে, বিক্রির নয়।

আখেরের দোকান হইতে উঠিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। কিছুতেই সে ছাড়িতে চায় না। শীঘ্রই আসিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া কাজল মাঠের দিকে রওনা দিল। ঠাণ্ডা আর সহ্য করা যায় না, সোয়েটার গায়ে দিতে দিতে কাজল দেখিল, গোধূলির শেষ আলোকচ্ছটাও আকাশের গা হইতে মিলাইয়া গিয়াছে।

অন্ধকার মাঠের মধ্য দিয়া রোমাঞ্চকর যাত্রা। আকাশে চুমকির মত অজস্র নক্ষত্রের ভিড। জীবনটা যেন হঠাৎ শরীরের সঙ্কীর্ণ পরিসর হইতে বাহির হইয়া দিক্‌হীন মহাশূন্যে মিশিয়া যাইতে চাহিতেছে। কাজলের মনে হইল, জীবন পৃথিবীর গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ নহে—পৃথিবীতে বাঁচিয়া আছে বটে, কিন্তু পৃথিবীই শেষ কথা হইতে পারে না। অস্তিত্ব সে মহাবিশ্বের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত বলিয়া অনুভব করিতেছে—তাহা কি মিথ্যা?

কাজল আজকাল বুঝিতে পারিতেছে বাবার সহিত তাহার মানসিকতার একটা আশ্চর্য মিল আছে। বাবার উপন্যাসগুলি পড়িতে পড়িতে সে অবাক হইয়া ভাবে, এমন নির্ভুল ভাবে তাহার মনের কথা লিখিল কি করিয়া? ছোটবেলায় সে যাহা ভাবিত, আকাশের দিকে তাকাইলে তাহার মনে যেভাব হইত, বাবা সব হুবহু লিখিয়াছে।

কাজল জানে, তাহার জীবন সাধারণভাবেই কাটিয়াছে। বাবা দারিদ্র্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া, প্রতিবাদে সংগ্রাম করিয়া তবে মানুষ হইয়াছিলেন। সে কিন্তু জন্মের পরে খুব একটা অসচ্ছলতা দেখে নাই, দারিদ্র্যের ভিতর যে কল্যাণস্পর্শ আছে তাহা সে কখনও অনুভব করে নাই। মাঝে মাঝে কাজলের মনে হয়, কিছুই তাহার বলিবার নাই। ইট-কাঠ-পাথরের ভিতর বাস করিয়া কিছু বলিবার থাকিতে পারে না। তবু এ কথাও মিথ্যা নয় যে তাহার তীক্ষ্ণ অনুভূতি তাহাকে অনেক রহস্যের সম্মুখীন করিয়াছে; জীবনের ভিতরও আর একটা গভীরতর জীবন আছে, তাহা সে বুঝিতে পারে। কি করিয়া সে এসব কথা না বলিয়া পারিবে?

একটা খাতায় দুইটি গল্প লিখিয়া সে বন্ধুদের পড়াইয়াছিল। কলেজের বন্ধুদের (মনের মিল বেশী না থাকা সত্ত্বেও দুই-একটি বন্ধু তাহার হইয়াছে) মধ্যে অনেকেই তাহার বাবার ভক্ত। তাহারা গল্প দুইটা আদ্যোপান্ত শুনিয়া বলিল—ভালই হয়েছে, মন্দ কি! তবে ব্যাপার কি জানো, লেখার মধ্যে তোমার বাবার প্রভাব বড্ড বেশী।

কাজল মহা হাঙ্গামায় পড়িয়াছে। সে ইচ্ছা করিয়া বাবার বই দেখিয়া নকল করিতেছে না। তাহার চিন্তাধারার সহিত বাবার চিন্তাধারা মিলিয়া গেলে সে কি করিতে পারে?

প্রকাণ্ড মাঠের অর্ধেক পার হইয়াছে—এমন সময় কাজল দেখিল, কিছুদূরে মাঠের ভিতর বসিয়া কাহারা আগুন পোহাইতেছে। বেশ দৃশ্যটা। চারিদিকে শূন্যমাঠ, উপরে খোলা আকাশ, তাহার নিচে

বসিয়া খড়-বিচালি জ্বালাইয়া কেমন আগুন পোহাইতেছে লোকগুলি। কিসের আকর্ষণে সে পায়ে পায়ে আগাইয়া গিয়া অগ্নিকুণ্ডের সামনে দাঁড়াইল।

লোকগুলি দরিদ্র। এই ভয়ানক শীতে গায়ে একটা সূতির জামা। তাহারা গায়ে গায়ে ঘেঁসিয়া হাত আগুনের উপর ছড়াইয়া নিজেদের মধ্যে কি গল্প করিতেছিল। কাজল আসিয়া দাঁড়াইতে লোকগুলি অবাক হইয়া তাহার দিকে তাকাইল। কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে কাজল অপ্রস্তুত বোধ করিয়া বলিল—আগুন পোহাচ্ছেন বুঝি?

অবান্তর প্রশ্ন। শীতের রাতে আগুন জ্বালাইয়া তাহার উপর হাত ছড়াইয়া এতগুলি লোক আগুন পোহানো ছাড়া অন্য কি করিতে পারে?

একজন বলিল—হ্যাঁ বাবু, আপনি বুঝি শহরে থাকেন? এই বুধো, সরে যা ওদিকে। বসুন বাবু ওইখেনটায়, আগুনের কাছে এসে বসুন।

বুধো তাহাকে সম্মান দেখাইয়া সরিয়া বসিল, কিন্তু বাকি কয়জন কেমন আড়ষ্টভাবে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহাদের চোখে শুধু বিস্ময় নহে, একটু যেন আতঙ্কও মিশ্রিত আছে।

প্রথম লোকটি বলিল—এই বুধোই গল্প বলছিল বাবু। শ্বশুরবাড়ী থেকে ফেরবার সময় মাঠের মধ্যে ওকে এলে-ভূতে পেয়েছিল। এলে-ভূত জানেন তো? মাঠের মধ্যে পথ ভুলিয়ে লোককে দূরে বেজায়গায় টেনে নিয়ে যায়, তারপর মেরে ফেলে। তা বুধো সন্ধ্যেবেলা বেরিয়েচে শ্বশুরবাড়ী থেকে, আর ভূত লেগেছে তার পেছনে—

একজন অনুচ্চকণ্ঠে বলিল—নাম করিস্ না রাত্তিরে—

গল্পটা দীর্ঘ। কাজলকে সবটা শুনিতে হইবে—কি করিয়া কাপড়টা ঝাড়িয়া উল্টাইয়া পরিয়া তবে বুধো ভূতের হাত হইতে রক্ষা পায়। শুনিতে শুনিতে অনেকে পিঠের উপর দিয়া পিছনে মাঠের দিকে

তাকাইয়া দেখিতেছিল। এবং ক্রমাগত আগুনের কাছে অগ্রসর হইতেছিল। ইহাদের আতঙ্কের কারণ এইবারে কাজল বুঝিল। অন্ধকার মাঠে বসিয়া প্রেতযোনির গল্প হইতেছিল—রীতিমত গা শিরশির-করা পরিবেশ। এমনি সময় মাঠের ভিতর হইতে আচমকা কাজলের নিঃশব্দ আবির্ভাব। প্রথমটা তাহারা বেজায় চমকাইয়াছিল, আগুনের আলোয় কাজলের ছায়া পড়িতেছে ইহা না দেখা পর্যন্ত স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িতে পারে নাই।

ঠাণ্ডা ক্রমশঃ বাড়িতেছে। তাহারা আরো কাঠকুটা আনিয়া আগুনের মধ্যে ফেলিয়া দিল। শুকনা ডালপালা পুড়িবার পটাপট শব্দ উঠিতেছে, বাতাসে পোড়া পাতার গন্ধ। হাত বাড়াইয়া আগুনের উত্তাপ উপভোগ করিতে করিতে কাজলের মনে হইল, এই লোকগুলি তাহার ভারি আপন।

দাদুহারা কাজল বারো

শীতের শেষে সুরপতি বাবু অসুখে পড়িলেন। শরীর খুবই মজবুত ছিল, বাগানের প্রিয় গাছগুলিতে নিজের হাতে পাম্প করিয়া জল তুলিয়া দিতেন। প্রত্যহ কয়েক মাইল হাঁটাহাঁটি চাকরী-জীবনের অভ্যাসের মধ্যেই ছিল। তবুও কোন এক রন্ধ্রপথে দেহে অসুখ ঢুকিয়া পড়িল। অসুখ সুরপতি বাবু গ্রাহ্যের মধ্যে আনিতেন না। জ্বরজারি হইলে তিনি আরও বেশী ঘোরাঘুরি করিতেন। মনে ভয় ছিল, শুইলেই অসুখ তাঁহাকে কাবু করিয়া ফেলিবে। কাজল দাদুকে কখনো কোন কারণে শুইয়া থাকিতে দেখে নাই। একদিন কলেজ হইতে ফিরিয়া সন্ধ্যাবেলা সুরপতি বাবুকে শুইয়া থাকিতে দেখিয়া সে অবাক হইল। পাশে সরযূ বসিয়া হাওয়া করিতেছে, বাড়িতে থমথমে আবহাওয়া।

হৈমন্তী বলিল—জ্বরটা হঠাৎ বেড়েছে। দুপুরের দিকে আমায় ডেকে বললেন গায়ের উপর চাদরটা এনে দিতে। নিঃশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে, বুকে খুব সর্দি। তুই খেয়ে নে, কি দরকার পড়ে কখন—

কাজল খাইতেছে, দিদিমা আসিয়া বলিলেন—খোকা, তুই খেয়ে সুরেশ ডাক্তারকে একটা খবর দিয়ে আসিস তো, তোর দাদুকে যেন দেখে যায়।

অসুখটা যে বেশী, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাড়ির সবাই সে কথা বুঝিতে পারিয়াছে। সুরেশবাবুও অনেকদিন হইতে সাবধান

চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে, অর্থহীন। দুপুরে সবাইকে বিশ্রাম করিতে পাঠাইয়া হৈমন্তী বাবার কাছে বসিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। অপুর মৃত্যুর পর সুরপতি বাবু বিরাট মহীরূহের নিচে তাহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, সে আশ্রয় এইবার নষ্ট হইতে চলিল।

সুরপতি বাবু তাকাইয়া চিনিবার চেষ্টা করিলেন। বলিলেন—কে? হেম?

—হ্যাঁ বাবা, আমি।

সুরপতি বাবুর কথা বলিতে কষ্ট হইতেছিল, অস্বাভাবিক স্বরে বলিলেন—কাঁদিস নে, তোদের কান্না দেখলে আমি মনে জোর পাই নে।

কান্নার বেগটা হৈমন্তী জোর করিয়া দমন করিল।

—তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেবো বাবা?

মাথা নাড়িয়া সুরপতি বাবু সম্মতি দিলেন। হৈমন্তী মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছে, এমন সময় সুরপতি বাবু হঠাৎ বলিলেন—দাদু কই?

—কাজল কলেজে গিয়েছে বাবা।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সুরপতি বাবু বলিলেন—হেম, দাদু খুব বড় হবে, দেখে নিস। ও অন্য রকম—

—তুমি ঘুমোও বাবা, কথা বোলো না—

—আমি বলে গেলাম হেম, তুই মিলিয়ে নিস।

একটু পরে সুরপতিবাবু বলিলেন—গায়ে চাদর দিয়ে দে, আমার শীত করছে।

একদিন মাঝরাত্রে ঘুম ভাঙিয়া কাজল শুনিল পাশের ঘর হইতে ক্ষীণ গলার স্বর ভাসিয়া আসিতেছে। দাদু কি বলিতেছে, কেহ উত্তর দিতেছে না।

মশারী তুলিয়া কাজল সুরপতি বাবুর ঘরে গিয়া দাঁড়াইল। প্রথম-রাত্রে সরযুর জাগিয়া থাকার কথা, অতিরিক্ত ক্লান্তিতে সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। পর পর কয়েক রাত্রি জাগিয়া দিদিমাও গভীর ঘুমে

আচ্ছন্ন। কোথাও কেহ নাই, সমস্ত বাড়িতে অপার্থিব নীরবতা খাঁ-খাঁ করিতেছে।

সুরপতি বাবুর মাথা বালিশ হইতে নিচে বিছানার চাদরে গড়াইয়া পড়িয়াছে। মাথা তুলিবার বারবার চেষ্টা করিয়াও পারিতেছেন না। কাজলকে দেখিয়া বলিলেন—মাথাটা তুই বালিশে তুলে দিয়ে যা দাদু, কেউ তো আসছে না।

কাজলের বড় খারাপ লাগিল। জীবনের পরিণতি যদি এমনি হয়, তবে মানুষ বাঁচে কিসের আশায়? যৌবন অতিক্রান্ত হইবার আগেই তো আত্মহত্যা করা উচিত পরবর্তী দুর্দশার হাত হইতে রেহাই পাইবার জন্য।

পরের দিন সকালে সুরেশডাক্তার বলিলেন, দিন কাটে কিনা সন্দেহ। কাজল কলেজ এবং প্রতাপ অফিস কামাই করিয়া বাড়িতে থাকিয়া গেল। দুপুরে অনেক মাছ রান্না হইয়াছিল—সরযূর আর হৈমন্তী পরামর্শ করিয়া কাজটা করিয়াছিল। অন্য দিন হইতে বেশী মাছ দেখিয়া দিদিমা বলিলেন—এত মাছ কেন রে?

সরযূ বলিল—খাও না মা। সস্তা পেয়ে প্রতাপ নিয়ে এসেছে।

দিদিমা হাটুর ওপর মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বলিলেন—আমাকে তোরা সবাই কেন ঠকাচ্ছিস, আসল কথাটা কেন বলছিস নে?

কিছুতে তাঁহাকে খাওয়ানো গেল না।

দুপুরবেলা সুরপতি বাবুর শ্বাসকষ্ট ভীষণ বাড়িল। এক একবার দম লইবার সময় মনে হইতেছিল, প্রাণ বাহির হইয়া যাইবে।

হৈমন্তী কাজলকে বলিল—একবার তুই চট করে সুরেশবাবুর কাছে যা, সঙ্গে করে নিয়ে আসবি অবস্থাটা বলে—

গায়ে একটা জামা গলাইয়া কাজল সুরপতি বাবুর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সুরপতি বাবু তাকাইয়া আছেন, কিন্তু চিনিতে পারিতেছেন কিনা কাজল বুঝিল না। সে ঝুঁকিয়া বলিল—দাদু, আমি কাজল।

সুরপতি বাবু কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিলেন। বুকটা হাপরের মতো

সমানে ওঠা-পড়া করিতেছে। গোঙানির স্বরে সুরপতি বলিলেন—দাদু, বুকে বড় কষ্ট—

আর্তস্বরে কাজলের ভীষণ খারাপ লাগিল, সে দৌড়াইল সুরেশবাবুর বাড়িতে। রিক্সা করিয়া সুরেশবাবুর সঙ্গে ফিরিবার সময় দেখিল, প্রতাপ খালি পায়ে বাহির হইতেছে। বলিল—বাবা মারা গেছেন ডাক্তারবাবু।

ডাক্তারবাবুর ঘড়িতে তখন তিনটা বাজিয়া পাঁচ মিনিট। কুড়ি মিনিট আগেও কাজল দাদুর সহিত কথা বলিয়াছে।

সুরপতি বাবুর সঙ্গে দেওয়ার জন্য কাজল পাঞ্জাবি কিনিতে গিয়াছে। একটা নামাবলীও কিনিতে হইবে। পাড়ার ছেলেরা ফুলের মালা, ধূপকাঠি ইত্যাদির জোগাড় করিয়া ফেলিয়াছে। দোকানী রেডিমেড পাঞ্জাবির স্তূপ সামনে আনিয়া বলিল, কি মাপের চাই?

কাজলের শুনিয়া অদ্ভুত লাগিল। গলা পরিষ্কার করিয়া সে বলিল—মাপের দরকার নেই, মাঝারি দেখে দিন। যার জন্যে যাচ্ছে, তিনি মারা গেছেন।

দোকানীর এই মাপ জানিতে চাওয়ার কথা কাজলের বহুদিন মনে ছিল।

দাহ অন্তে লোহা এবং আগুন স্পর্শ করিবার জন্য শ্মশানবন্ধুরা বাড়িতে ঢুকিতেই দিদিমা অনেকদিন বাদে কাঁদিয়া উঠিলেন—ওরে তোরা কোথায় শীতের মধ্যে রেখে এলি বুড়োকে—ও যে মোটে একলা থাকতে পারে না—

জীবন-জিজ্ঞাসায় কাজল   পনের

কলেজে যাইবে বলিয়া কাজল বইপত্র গোছাইতেছে, হৈমন্তী ডাকিয়া বলিল—হ্যাঁ রে, কোলকাতার অবস্থা কেমন? শুনলাম লোকজন নাকি খুব পালাচ্ছে? ভট্‌চাযপাড়ায় বকুলের বাবার যে-বাড়িটা খালি পড়েছিল, সেটায় এক পরিবার এসে উঠেছে। এখানে থাকবে না বলছে, আরও গাঁয়ের দিকে চলে যাবে।

কাজল বলিল—আমি তো এখন পর্যন্ত ভয়ের কিছু দেখলাম না। লোকজন কিছু গাঁয়ের দিকে পালিয়েছে ঠিকই, রাস্তাঘাট একটু ফাঁকা ঠেকে আগের চেয়ে। তবে অফিস-কাচারী ঠিকই চলছে—

—আমাদের এদিকে ভয়ের কিছু নেই, না?

—দূর! কোথায় রইল যুদ্ধ, কোথায় আমরা! যারা পালিয়েছে তারাও ফিরলো বলে, দেখ না।

একদিন কলেজ হইতে ফিরিবার সময় কাজল দ্বিতীয়-বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইবার খবর পায়। শেয়ালদহের মোড়ে হকার হাঁকিতেছে টেলিগ্রাম, টেলিগ্রাম। বহুলোক ভিড় করিয়া পড়িতেছে এবং সরব আলোচনা করিতেছে। একখানা কিনিয়া কাজল পড়িয়া দেখিল। পোলিশ-করিডর দাবী করিয়া হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিয়াছেন, যুদ্ধ শুরু হইয়াছে।

ক্রমে কলিকাতার চেহারা পাল্টাইল। ল্যাম্প-পোস্টের আলোয় কালো ঠুলি পরাইয়া দেওয়া হইল। এ. আর. পি. বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া নাম-ধাম লিখিয়া লইতে লাগিল, প্রয়োজনীয় উপদেশ দিতে লাগিল। অন্ধকার রাস্তা হাঁটিতে হাঁটিতে, কাজলের মনে একটা বিশ্রী ভাব যেন চাপিয়া বসিত। শীতকালে সন্ধ্যা হয় বিকাল শেষ হইতে না হইতেই

—কলেজ হইতে বাহির হইয়া কাজল দেখিত, বিশাল শহরের উপরে অন্ধকার দুঃস্বপ্নের মত চাপিয়া আসিতেছে।

মালতীনগরে বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই। কেবল কাঁঠালিয়ার কাছে একটা বিরাট মাঠ সৈন্যেরা কাঁটাতারে ঘিরিয়া সেখানে রাইফেল প্র্যাক্‌টিস করে। সাধারণের সেখানে প্রবেশ নিষেধ।

সকালে উঠিয়া শোনা যায়, দূর হইতে রাইফেলের আওয়াজ আসিতেছে। সুন্দর সকাল। জানলার পাশে টগর গাছটায় সকালের রোদ্দুর আসিয়া পড়িয়াছে, একটা টুনটুনি পাখি বারবার ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহার ডালে আসিয়া বসিতেছে। মিষ্টি আমেজের ভিতর রাইফেলের শব্দে কাজলের মেজাজ খারাপ হইয়া যায়। তাহার জীবনের সহিত বন্দুকের শব্দ মোটেই খাপ খায় না।

একদিন রাস্তায় আদিনাথ বাবুর সহিত দেখা হইয়া গেল। সে প্রণাম করিয়া বলিল—ভালো আছেন স্যার?

আদিনাথ বাবু কাজলকে জড়াইয়া ধরিলেন, বলিলেন—তুই কেমন আছিস অমিতাভ? তোর চেহারা বড্ড খারাপ হয়ে গেছে, অসুখ-বিসুখ করেছিল নাকি?

—না স্যার।

—তবে এমন চেহারা কেন?

কাজলের মনে হইল আদিনাথ বাবু তাহার মনের কথা বুঝিলেন, তিনি তাহাকে সমাধানের পথ বলিয়া দিতে পারিবেন। কিন্তু বলিতে গিয়া দেখিল, জিনিসটা সে সহজে প্রকাশ করিতে পারিতেছে না। জীবনের কোন অর্থ নাই, এ কথা ভাবিয়া তাহার বয়সী একটি ছেলের রাত্রে ঘুম হইতেছে না, ইহা রীতিমত হাস্যকর। এই কথা ভাবিয়া শরীর খারাপ হওয়া নিঃসন্দেহে অন্যদের কাছে অবিশ্বাস্য। সে বলিল—আমি ঠিক গুছিয়ে বলতে পারছি না স্যার। ছোটবেলা থেকে যে পরিবেশে মানুষ হয়েছি, তার সঙ্গে আমার মন যেন আর খাপ খাচ্ছে না।

—পরিষ্কার করে বল্।

—স্যার, এত দীর্ঘ দিন ধরে বেঁচে থাকার মানে কি? এত কষ্ট করে পড়াশুনা করা, জীবনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা, জীবনকে ভালবাসা—এর কি অর্থ? মৃত্যুর পর তো একটা ভয়ানক অন্ধকার আমাদের গ্রাস করে নেবেই।

মালতীনগর স্টেশনের লোকেব ভিড়ে ব্যাগ হস্তে আদিনাথ বাবুর সামনে দাঁড়াইয়া কথাটা ভীষণ নাটকীয় শোনাইল। কাজল বুঝিতে পারিল, বিষয়টা সে পরিষ্কার করিতে পারে নাই—কিছুটা ফাঁকা আওয়াজ হইয়াছে।

কিন্তু আদিনাথ বাবুর মুখ আস্তে আস্তে গম্ভীর হইল। কাজলের কাঁধে হাত দিয়া বলিলেন—চল্, কোনো জায়গায় বসে কথা বলি।

স্টেশন ছাড়িয়া নির্জন পথে পড়িয়া একটা বাঁধানো কালভার্টের উপর আদিনাথ বাবু বসিলেন। বলিলেন—বোস আমার পাশে।

কাজল বসিল।

কিছুক্ষণ আদিনাথ বাবু কথা বলিলেন না, ব্যাগটা পায়ের কাছে নামাইয়া চুপচাপ বসিয়া রহিলেন। কাজলও পাশে বসিয়া রহিল। সময় কাটিতেছে, কাহারও যেন কথা বলিবার চাড় চাই।

আদিনাথ বাবু হঠাৎ কাজলের দিকে তাকাইয়া গম্ভীর স্বরে মন্ত্র পডিবার মত কবিয়া বলিলেন—তোর জীবনেব সুখ একেবারে চলে গেছে অমিতাভ, আর কখনও আসবে না।

কাজল চমকিয়া উঠিল। কথাগুলি তাহার অন্তরের গভীরে যেন তীক্ষ্ণমুখ শলাকার মত বিঁধিযা গেল। মাস্টারমশাই ঠিকই বলিয়াছেন—তাঁহার মত করিয়া আর কে বুঝিয়াছে যে সুখ আর কখনও আসিবে না? সঙ্গে সঙ্গে কাজলের মেরুদণ্ড বাহিয়া একটা ভয়ের স্রোত নিচে নামিয়া গেল। যে অসুখ শুরু হইয়াছে, তাহা কখনও সারে না।

—অমিতাভ।

—স্যার?

আদিনাথবাবু বলিলেন—যে চিন্তা করে, কারো জীবনে কখনো

সুখ আসে না। তুই জীবনের একেবারে আসল জায়গায় ঘা দিয়েছিস। ভাবতে অবাক লাগছে, এত অল্প বয়সে তুই এ চিন্তা পেলি কোথা থেকে।

—একটা কথা বলবো স্যার?

—বল্।

—কি মনে হয় আপনার জীবন সম্বন্ধে? আপনি কি বিশ্বাস করেন মৃত্যুতেই জীবনের শেষ?

—সত্যি উত্তর দেবো?

—তা নইলে আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করবো কেন?

—আমার কিছুই মনে হয় না। অনেক দিন আছি পৃথিবীতে, কিছুই বুঝতে পারলাম না। সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগেই আমার চিন্তাশক্তি নিঃশেষ হয়ে গেল। এখন আমি দেনায় জর্জরিত—ভবিষ্যৎহীন বৃদ্ধ। আমার এই বর্তমানেব চেয়ে বেশী ভয়ঙ্কর আর কি হতে পাবে? তবুও অমিতাভ আমার মন চায়, একটা-কিছু অর্থ থাকুক এ-সবের। কিন্তু আমি জানি, সমস্ত জিনিসটা signifies nothing—কেবল sound অমিতাভ, কেবল fury, আর কিছু নয়।

অকস্মাৎ আদিনাথ বাবু হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন—ওসব চিন্তা একদম বাদ দিয়ে দিয়েছি। এককালে খুব ভাবতাম, বুঝলি? এখন তোদের জন্যেই বেঁচে আছি বলতে পারিস। তোরা মানুষ হবি, বড় হবি—বিশ্বাস কর্, আমার খুব ভাল লাগবে দেখতে।

—আপনি পুনর্জন্মে বিশ্বাস করেন স্যার

—তুই বিশ্বাস করিস?

—করতে ইচ্ছা হয়, পারি না।

—কেন?

—বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করে দেখলে কোনো মানে হয় না বলে।

—বুদ্ধি দিয়ে যা বোঝা যায় না, তা মিথ্যে?

—তাকে হৃদয় দিয়ে মেনে নেওয়া যায়, বাস্তবে স্বীকার করা যায় না।

—স্বীকার না করার বাহাদুরী কি অমিতাভ? তাতে তো শুধু কষ্ট—

—কষ্ট তো বটেই মাস্টারমশাই। স্বীকার না করায় কিছু বাহাদুরী নেই, আমি বিশ্বাস করার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি। কিন্তু বুদ্ধিতে বাধা দেয় যে।

—অমিতাভ, আমি তোকে আশীর্বাদ করি, তোর জীবনে যেন বিশ্বাস আসে, তুই যেন কখনো পরাজিত না হোস।

—শুধু বিশ্বাস দিয়ে কি হবে স্যার, যদি আসলে কোনো অর্থ না থাকে? শূন্যতায় বিশ্বাস করা কি নিজেকে ঠকানো নয়?

আদিনাথ বাবু কাজলের কাঁধে হাত দিয়া একটা ঝাঁকুনি দিলেন, তারপর বলিলেন—তবু সে নিছক sound আর fury থেকে ভালো। বড় হয়ে তোর মনে হবে, বিশ্বাসের একটা মূল্য আছে। মনে হবেই দেখিস।

আদিনাথ বাবুর সঙ্গে কাজলের এই শেষ দেখা। এর কিছু দিন বাদেই তাঁর মৃত্যু হয়। ব্যোমকেশ হঠাৎ আসিয়া খবরটা দিয়াই আবার চলিয়া গিয়াছিল।

রাত্রে বিছানায় শুইয়া পরদিন আদিনাথ বাবু আর ঘুম হইতে ওঠেন নাই। ঘুমের ভিতরেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। সংসারের জন্য এক পয়সাও রাখিয়া যাইতে পারেন নাই, কিন্তু দেনা পাই-পয়সা পর্যন্ত মিটাইয়া দিয়াছিলেন।

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের পয়লা সেপ্টেম্বর দ্বিতীয়-বিশ্বযুদ্ধের শুরু। ৩রা সেপ্টেম্বর ব্রিটেন এবং ফ্রান্স যুদ্ধে নামিল। ১৮ই সেপ্টেম্বরের ভিতর পোল্যাণ্ডের পতন হইল। ওয়ারশ-তে নাজী-বাহিনীর এমুনিশন-বুটের শব্দ শোনা যাইতে লাগিল!

প্রথম দিকে কাজল কলিকাতায় বিশেষ-কিছু অস্বাভাবিকতা দেখে নাই। কিন্তু যত দিন যাইতে লাগিল, মানুষ ততই দিশেহারা হইয়া

পড়িল। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে জাপান হঠাৎ পার্ল হারবার আক্রমণ করায় আমেরিকা যুদ্ধে নামিল। ইহার কিছুদিন বাদে ব্রহ্মদেশের পতন হওয়ায় ভারতবর্ষ অনুভব করিল, বিপদ একেবারে ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। শুরু হইল বাক্স-বিছানা ঘাড়ে গ্রামের দিকে সদলে পলায়ন। তাড়া-খাওয়া প্রাণীর মত অবস্থা।

অনেক সময় কাজলের ক্লাস করিতে ভাল লাগিত না। পরমেশের সঙ্গে রাস্তায় ঘুরিতে ঘুরিতে তাহার মনে হইত, মানুষ খামাকা যুদ্ধ করে মরছে কেন? এমনিই তো মরবে ক'দিন বাদে।

সে বলিত—পরমেশ, যুদ্ধ বড় বীভৎস আর অর্থহীন, না?

—হয়তো তাই, কিন্তু যুদ্ধেরও অনেক সৃষ্টিশীল দিক আছে। কলকারখানা বাড়ছে, নতুন-নতুন আবিষ্কার হচ্ছে। কত প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টি হবে হয়তো পরে। প্রথম মহাযুদ্ধের ফসল যেমন রেমার্ক, রুপার্ট ব্রুক—

—ভালো সাহিত্যের জন্য, নতুন আবিষ্কারের জন্য কি মানুষ মারতে হবে?

পরমেশ হাসিল। বলিল—তুমি নিজেই বলে থাকো জীবনের কোন অর্থ হয় না, জীবনটা দীর্ঘ দিন ধরে ক্লান্ত হবার একটা পন্থা মাত্র। মানুষের জীবন থাকলো কি গেল, তাতে তোমার দুঃখিত হবার কারণ নেই।

কাজল ভাবিয়া দেখিল, পরমেশ ঠিকই বলিয়াছে। তাহার দর্শন অনুযায়ী যুদ্ধে মনমরা হইবার কারণ নাই।

অথচ এ কথাও ঠিক যে, সে হাঁপাইয়া উঠিয়াছে। কলিকাতার আলোকহীন নিষ্প্রাণ সন্ধ্যা, লোকজনের পলায়ন, প্রতিদিন যুদ্ধের নূতন নূতন নারকীয় সংবাদ তাহার মনে এত অবসাদ আনিয়াছে যে, আই. এ. পরীক্ষায় যেমন করা উচিত ছিল, তাহা সে পারে নাই। পরীক্ষার হলে বসিয়া অনেকবার কাগজ জমা দিয়া উঠিয়া আসিবার কথা ভাবিয়াছে, কিন্তু মায়ের কথা ভাবিয়া পারে নাই।

মায়ের আশা সে বড় হইবে। টাকার দিক দিয়া নহে, যশের

দিক দিয়া। রাত্রে শুইয়া সে বাচ্চাছেলের মত মায়ের বুকে মুখ গুঁজিয়া থাকে। সারাদিনের চিন্তায় পরিশ্রমে ক্লান্ত মস্তিষ্ক তাহাতে বিশ্রাম পায়। পৃথিবীর বড় বড় ফাঁকির ভিতরে মায়ের ভালোবাসাই তাহার কাছে একটুকু সার-পদার্থ বলিয়া বোধ হয়। প্রায় রাত্রে দুইজনে নিশ্চিন্দিপুরের গল্প করে, মৌপাহাড়ীর গল্প করে। গল্প কিছুক্ষণ চলিবার পর কাজল টের পায়, মা কাঁদিতেছে। তখন সে বলে—মা, তোমার ছোটবেলার গল্প বলো।

হৈমন্তী কাজলকে বুকের কাছে লইয়া মাথায় হাত বুলাইতে তাহার রঙীন শৈশবের গল্প করে।

—তখন ভারি টক খেতে ভালোবাসতাম, জানিস বুড়ো। আমি আর দিদি সারাদিন এ-বাগানে ও বাগানে ঘুরতাম চালতে করমচার খোঁজে। এক বুড়োর বাগানে লুকিয়ে ঢুকেছিলাম। বুড়ো দেখতে পেয়ে আমাদের ডেকে বলল—লুকিয়ে নিচ্ছ কেন খুকীরা, যত ইচ্ছে নিয়ে যাও, কেউ কিছু বলবে না। কোথায় থাকো মা তোমরা?

কাজলের মায়ের জন্য দুঃখ হয়। মা জীবনে কিছু পায় নাই। কত অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছে, এখন পুরাতন স্মৃতি মন্থন করিয়া দিন কাটায়। বাবা মারা যাইবার পর হইতেই কি-ই বা রহিয়াছে! একটা বড় রকমের কিছু করিয়া মাকে খুশী করিতে হইবে। সে বলে—একটা গল্প শুনবে মা?

—কি গল্প রে খোকন?

সে ফিয়োদর সোলোগাব-এর 'দি হুপ' গল্পটা মাকে বলে। সোলোগাব এমন-কিছু বড় সাহিত্যিক নয়। কিন্তু গল্পটা তাহার খুব ভালো লাগিয়াছিল। আশি বছরের এক বৃদ্ধের গল্প। মায়ের সহিত বাচ্চাকে হাঁটিয়া যাইতে দেখিয়া বৃদ্ধের শিশু হইতে ইচ্ছা করিয়াছিল। বাচ্চাটি বেশী দূরে গিয়া পড়িলেই মা ডাকিয়া বলিতেছে—ওদিকে যাস নে, পড়ে যাবি। পরের দিন বৃদ্ধ কাজ কামাই করিয়া সারাদিন বালকের মত নির্জন পাহাড়ের ধারে খেলিয়া বেড়াইল।

বৃদ্ধের কেহ ছিল না। শৈশবে সে মায়ের স্নেহ পায় নাই। অশক্ত শরীরে পাহাড়ের পথে দৌড়াইতে দৌড়াইতে কেবলই তাহার মনে হইতেছিল, মা পিছন হইতে সাবধান করিয়া দিতেছে—ওদিকে যাস নে, পড়ে যাবি।

সম্বলহীন আত্মীয়হীন বৃদ্ধের গল্পটা কাজলের মনে দাগ কাটিয়াছিল। বলিতে বলিতে সে বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। শেষ দিকটায় তাহার গলার কাছটায় একটা কান্না আটকাইয়া যাইতেছিল। অবাক হইয়া সে লক্ষ্য করিল, জীবনের অর্থহীনতা আবিষ্কারের পরেও সে জীবনকে কত ভালবাসে। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—কত লোক জীবনে কিছু না পেলেই মরে যায় মা।

হৈমন্তী তাহাকে কাছে টানিয়া বলিল—ওমা, বুড়ো তুই কাঁদছিস? তুই না বি. এ. পড়িস? বই পড়ে কান্না!

—আমি মানুষের দুঃখ দূর করার জন্য একটা কিছু করবো, দেখে নিও। সারাজীবন যারা কেবল কষ্ট পায়, চোখের জলে ডুবে থাকে, আমি তাদের নতুন-পৃথিবী তৈরী করে দেবো।

—আমি জানি বাবা, তুই পারবি।

—বি. এ.-টা দিয়ে আমি চাকরী নিয়ে চলে যাবো কোন নির্জন জায়গায়। মৌপাহাড়ীর স্কুলে মাস্টারী করবো হয়তো। তুমি আমার সঙ্গে যাবে তো মা?

—তোকে ছেড়ে কোথায় থাকব বুড়ো? তুই তো আমার সব।

আমি বেশী টাকাপয়সা দিতে পারবো না মা, কিন্তু তোমাকে শান্তি দিতে পারবো। তাতে তুমি তৃপ্তি পাবে না?

—আমার কিছু চাই নে। কীর্তিমান স্বামী পেয়েছি, পুত্র যদি বিদ্বান হয় তবেই আমার সমস্ত পাওয়া হবে।

কাজল আবার শুইল বটে, কিন্তু ঘুম আসিল না। বলিল—মা, আমার একদম ভাল লাগছে না এই জীবন। পড়াশুনো হয়ে গেলেই বেরিয়ে পড়ব যেখানে হোক। এই তো ক'দিন পর থেকে মাঠে শিশির পড়তে শুরু করবে। রাত্তিরের পরিষ্কার আকাশে ঝকঝক

করবে নক্ষত্র। পৃথিবীটা আমাকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে--আমি বাইরে বেরুব মা, আমি কিছুতেই ঘরের কোণে সারাজীবন কাটাব না।

—তোর বাবার রক্ত রয়েছে যে তোর শরীরে, কে তোকে আটকাবে খোকন?

—বাঁচতে গেলে যে বিশ্বাস লাগে, তা কেন পাই না?

—ঈশ্বরে বিশ্বাস?

—শুধু ঈশ্বরে নয়, জীবনে বিশ্বাস।

—বিশ্বাস আসবে, দেখতে পাবি। মনটা খুব উদার খুব বড় করে রাখিস, যাতে সুখ-দুঃখ সবাই সেখানে ধরে। দেখবি, দুঃখ আর সুখ তুল্যমূল্য হয়ে গেছে—দুঃখের জন্য আর কোন কষ্ট নেই।

কাজলের মনে হইল, মা এইভাবে দুঃখকে জয় করিয়াছে। সুখ আর দুঃখের বিরাট ভার মনের ভিতর জমা করিয়া দুইটাকে এক করিয়া দেখিতে সক্ষম হইয়াছে মা। এইটাই মায়ের ধৈর্যের মূলকথা।

পরমেশ বলিল—কি অমিতাভ, চুপ করে আছ যে?

কাজল মুখ তুলিয়া তাহার দিকে তাকাইতে সে অবাক হইল। পূর্বের সে আশাহত পাণ্ডুর ভাবটা কাটিয়া গিয়া নূতন একটা উদ্যমের আলো কাজলের মুখে প্রতিফলিত হইয়াছে। চোখ দুটা চকচক করিতেছে।

—তোমাকে বেশ উত্তেজিত বলে মনে হচ্ছে।

—পরমেশ, আমি বোধ হয় ভুল করছিলাম। জীবনের অর্থ হয়তো সত্যিই নেই—আমার এক মাস্টারমশাই বলতেন, জীবন, শুধুই Sound আর fury, আর কিছু নয়। শেকস্‌পীয়রই হয়তো ঠিক, তবু বেঁচে থাকার মানে একটা খুঁজে বের করবোই পরমেশ। লোক-ভুলানো দর্শন নয়, বাস্তবে একটা কিছু দিয়ে যাবো—

পরমেশ কাজলের হাত চাপিয়া ধরিল।—আমি বিশ্বাস করি অমিতাভ, তা তুমি পারবে—

—আমাকে দূরে চলে যেতে হবে মানুষের থেকে, আরও বেশী করে মানুষের ভেতর ফিরে আসার জন্য। আমি পেছনে হাঁটবো পরমেশ।

দুইজনে হাঁটিয়া মিউজিয়ামে গেল। পরমেশ জানে, কাজল সঙ্গে থাকিলে মিউজিয়াম দেখার আলাদা আনন্দ। বেলা গড়াইয়া বিকালের দিকে ঝুঁকিয়াছে। মিউজিয়ামে লোক প্রায় নাই বলিলেই হয়। বড় বড় মূর্তি এবং দুষ্প্রাপ্য অনেক বস্তু বোমার ভয়ে মাটির নিচে পুঁতিয়া ফেলা হইয়াছে। ঘরগুলি কেমন ন্যাড়া-ন্যাড়া লাগে।

পরমেশ বলিল—অনেক কিছু নেই—'রিপ্লেসড'-লেখা টিকিট পড়ে আছে।

—ইউনিভার্সিটিও বহরমপুরে উঠিয়ে নেওয়া হচ্ছে, জান না?

বহুদিন বাদে কাজলের মনে আবার পুরাতন আনন্দটা ফিরিয়াছে মিউজিয়াম হইতে বাহির হইয়া দেখিল রৌদ্র পড়িয়া গিয়াছে, শীতকালের বেলা নাই বলিলেই চলে। গেটের সামনে ফুটপাতের উপর ইটের বেড়া দিয়ে ঘেরা কৃষ্ণচূড়া গাছ। তাহার ডালগুলি অস্তদিগন্তের পটে আঁকা বলিয়া মনে হইতেছে। বাতাস নাই, সব নিঝুম। সন্ধ্যার কেমন একটা বিষণ্ণতা—তাহাদের দিকে তাকাইয়া বুঝি ওষ্ঠে তর্জনী রাখিয়া চুপ করিতে সঙ্কেত করিতেছে।

পাতলা জামা গায়ে কাজলের শীত করিতেছিল। ফিরিতে এত দেরী হইবে, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। পরমেশকে বলিল—চলো, রাত হয়ে এলো।

ধর্মতলার মোড়ে একটা বাচ্চা মেয়ে, নোংরা জামা-পরা, কাজলের গায়ে ধাক্কা খাইল। কাজলের হাত হইতে বইখাতা ধূলায় পড়িয়া গেল। পালায় নাই, মেয়েটি ভয়ে পালাইতে পারে নাই, আতঙ্কে কেমন-যেন হইয়া গিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া আছে। বয়স বেশী

নহে, নয় কি দশ হইবে—হতদরিদ্রের চেহারা, কিন্তু চোখদুটি উজ্জ্বল। কাজলের হঠাৎ 'ওল্ড কিউরিয়সিটি শপ'-এর ডিক সইভেলারের ছোট্ট বান্ধবীটির কথা মনে পড়িল। কাজল ভাবিল—ও ভেবেছে, আমি ওকে বকবো। কি সুন্দর চোখ দুটো ওর!

মেয়েটির হাতে এক আনা দামের পাউরুটি, এটা কিনিতেই সে আসিয়াছিল, রাস্তা পার হইয়া ফিরিবার সময় ধাক্কা লাগিয়াছে। পাউরুটি শক্ত করিয়া ধরিয়া মেয়েটি কাঠ হইয়া আছে। মেয়েটির চোখ, পাউরুটি আঁকড়াইয়া ধরিবার ভঙ্গি, সন্ধ্যাবেলার বিষণ্ণতা—সব মিলাইয়া কাজলের মনে একটা ঢেউ তুলিল—মেয়েটির চোখে চোখ রাখিয়া সে হাসিল। মেয়েটি হাসিল না।

কাজল বলিল—তোমার নাম কি খুকী? কোথায় থাকো?

উত্তর না দিয়া মেয়েটি রাস্তার ওপারে তাকাইল, সেখানে এক অন্ধ ভিখারী ঘোড়ার জল খাইবার চৌবাচ্চার কিনারায় বসিয়া আছে। কাজল বলিল—ও কে হয় তোমার—বাবা?

মেয়েটি ঘাড় নাড়িল। কাজল পকেট হইতে একটা আনি বাহির করিয়া বলিল—এটা তুমি নাও। কিছুতেই লইবে না। অনেক সাধ্যসাধনার পর হাত হইতে আনিটা লইয়া সে সংকুচিতভাবে হাসিল, তারপর হঠাৎ ফিরিয়া লোহার চৌব্বাচ্চাটা লক্ষ্য করিয়া দৌড় দিল।

ট্রেনে জানালার পাশে বসিয়া কাজল সমস্ত রাস্তা ভাবিতে ভাবিতে চলিল। ঠাণ্ডা বাতাসে হাড়ের ভিতরে কাঁপন ধরে। গলা বাড়াইলে দেখা যায়, কালপুরুষ-মণ্ডলীর বেটেলজিয়ুস নক্ষত্রটা লালচে আভায় ঝকঝক করিতেছে।

কাহারা গোপন-ছাউনির নিচে আগুন করিয়া হাত-পা সেঁকিতেছে। হাওয়ায় শীতের ঘ্রাণ, পোড়া ডালপালার ঘ্রাণ। বোমারু বিমানের ভয়ে উন্মুক্ত স্থানে আগুন জ্বালায় নাই।

ট্রেনের এঞ্জিন হইতে বার দুয়েক হুইস্‌লের শব্দ ভাসিয়া আসিল।

গতকাল আমাদের একজন অধ্যাপক না-আসায় একটা পিরিয়ড

ছুটি পাওয়া গেল। পরমেশ লাইব্রেরীতে বসে পড়ছিল, তাকে না-ডেকে আমি একটু হাটছিলাম রাস্তায়।

অন্যমনস্ক ভাবে চলতে চলতে ভেবে দেখলাম, আমার ভেতরে যে দ্বন্দ্বটা চলছে সেটা মোটেই আকস্মিক নয়। ছোটবেলা থেকেই ধীরে ধীরে পরিপক্ক হয়ে উঠছিল, হঠাৎ একদিন বেরিয়ে পড়েছে। আমার সমস্যা অন্যের কাছে অবাস্তব, কিন্তু আমার কাছে অন্ধকারের ভেতর প্রজ্বলন্ত আগুনের মত বাস্তব ও প্রত্যক্ষ। চিন্তার একটা বিশেষ ধাপ পর্যন্ত এসে আটকে গেছি, আমি মৃত্যুকে অতিক্রম করতে পারছি না। হয়তো কেউ তা পারে না।

হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, চলা বন্ধ করে আমি সামনের তেতলা বাড়ির ছাদের ওপরে আকাশের দিকে তাকিয়ে কি ভাবছি। চোখ নামিয়ে নিয়ে হাঁটতে শুরু করবো, দেখি রাস্তার ওপারে মিষ্টির দোকানে গোলমাল—রোগা মত একটা লোকের ঘাড় ধরে বিশালদেহ দোকানদার ঝাঁকানি দিচ্ছে, আর একজন তার কাপড়চোপড়ের ভেতর হাতড়ে কি খুঁজছে। রোগা লোকটি হাতজোড় করে কি বলতে গেল—মারল তাকে এক রদ্দা, ছিটকে সে ফুটপাথে গিয়ে পড়ল।

ভারি খারাপ লাগল ব্যাপারটা। হাতজোড় করে লোকটা কি বলতে চাইছে, কেউ শুনছে না। রাস্তা পেরিয়ে ওপারে গেলাম—ততক্ষণে সে একহাতে ভর দিয়ে উঠে বসেছে। থমকে গেলাম আমি। লোকটি রামদাস বৈষ্ণব!

রামদাস বৈষ্ণবকে এরা মারছে। রামদাস-কাকা!

রামদাস চমকে আমার দিকে তাকাল। কি চেহারা হয়ে গিয়েছে তার। চোখের নিচে গভীর কালি, চুল লালচে উস্কোখুস্কো। শরীর শুকিয়ে অর্ধেক হয়ে গিয়েছে। মারের চোটে এখনও সে অল্প অল্প কাঁপছে।

রামদাস আমায় চিনতে পেরেছে। পুরনো দিনের মতই খুশী-খুশী গলায় বলে উঠলো—বাবাজী, তুমি!

দোকানদার এবং তার দুই সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করলাম—কি হয়েছে? আপনারা মারছেন কেন একে?

দোকানদার খিঁচিয়ে উঠল—মারবে না তো কি সিংহাসনে বসিয়ে পূজো করবে? চার আনার জিলিপি খেয়ে এখন বলছে, পয়সা নেই। শালা ইয়ের বাচ্চা—

ইতর কথা এবং তাদের মুখ-চোখের ইতর ভাব দেখে আমার খারাপ লাগলো। বললাম—বৈষ্ণবকে মারতে হাত উঠলো আপনার! আবার গালাগালও দিচ্ছেন—

—যান যান মশাই, অমন অনেক দেখেছি। ভেক নিলেই বোষ্টম হয় না, ওসব লোক ঠকাবার ফন্দি—

রামদাসকে জিজ্ঞাসা করলাম—কি হয়েছে রামদাস-কাকা?

রামদাস তখন দাঁড়িয়ে উঠেছে। বলল—গেঁজেতে পয়সা রেখে-ছিলাম। কখন পড়ে গেছে বুঝতে পারি নি। সারাদিন ঘুরছি তো রাস্তায় রাস্তায়। তুমি তো জানো বাবাজা, পয়সা নেই জানলে আমি একদানাও মুখে দিতাম না এখানে—

দোকানদারের লোক বলল—ওরে আমার ধার্মিক যুধিষ্ঠির রে!

তাকে থামিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম—কত পয়সা আপনাদের। চার আনা? এই নিন, ছেড়ে দিন একে। চলো রামদাস-কাকা—

রামদাস বলল—আমার একটা থলে ওরা রেখে দিয়েছে। একটা দোতারা ছিল সঙ্গে, সেটা ভেঙে দিয়েছে—

দোকানদার ভেতর থেকে দোতারা এবং ছেঁড়া ক্যাম্বিসের থলে এনে দিল। খানিক দূরে এসে দোতারায় হাত বুলিয়ে রামদাস বললো—একদম ভেঙে দিয়েছে বাবাজী। তারগুলো ছিঁড়ে দিয়েচে, আর বাজানো যাবে না—

থলের ভেতর হাতড়ে খঞ্জনীটা বের করল সে, হেসে বলল—এটা নেয় নি। যাক, একটা তবু রইলো—

খঞ্জনী বাজিয়ে সে তার অভ্যেসমতো হাসলো। বলল—জয় গুরু, জয় গুরু।

তুমি হাসছ রামদাস-কাকা। তোমাকে ওরা অপমান করল, মারল—তার পরেও হাসছ?

—হাসবো না কেন? দুঃখ করার সময় কোথা আমার?

—ওদের ওপর রাগ হচ্ছে না?

—না বাবাজী, সত্যি বলছি—ওরা যদি বুঝতো খারাপ কাজ, তা হলে কি আর মারত আমাকে? না বুঝে যা করেছে, তার জন্য ওদের আমি দোষ দেব না। গুরু ওদের ভালো করুন!

—তুমি বড় ভালোমানুষ রামদাস-কাকা, আমরা হলে অপমান সইতে পারতাম না।

মার খাওয়াটা যেন ভারি একটা মজার ব্যাপার, রামদাস এমনি ভাবে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। হঠাৎ হাসি থামিয়ে বলল—একটা কথা তো তোমায় বলা হয়নি বাবাজী, আমার যক্ষ্মা হয়েছে।

যক্ষ্মা রামদাসের! সে-কথা এতক্ষণ না বলে দিব্যি হাসছিল সে!

—কি বলছো রামদাস-কাকা! যক্ষ্মা?

—হ্যা বাবাজী। ডাক্তার দেখাতে এসেছিলাম কোলকাতায়। গাঁয়ের ডাক্তার বললে শহরে গিয়ে দেখাতে। হাসপাতালে হাঁ করে বসেছিলাম সারাদিন, আমার ডাক আসার আগেই ডাক্তারের রুগী দেখার সময় পেরিয়ে গেল। চাপরাসী বলেছে কাল যেতে। কাল যাব আবার—

—রাত্রিরে থাকবে কোথায়?

—শুয়ে পড়ব রাস্তার ধারে কোথাও কাপড় মুড়ি দিয়ে। রাস্তায় শুলে তো মারবে না।

এই হিমবর্ষী রাতে রামদাস অচেনা শহরের ফুটপাতে শুয়ে থাকবে, খাওয়া মিলবে কিনা ঠিক নেই। তা সত্ত্বেও সে হাসছে!

—তুমি আমার সঙ্গে চলো রামদাস-কাকা, আমাদের বাড়ি চলো। আমি তোমায় ডাক্তার দেখানোর ব্যবস্থা করে দেবো।

খঞ্জনী বাজাতে বাজাতে রামদাস বললো—তা হয় না। কালব্যাধি হয়েছে, বড্ড ছোঁয়াচে। এ রোগ আমি তোমার বাড়িতে

ছড়াতে পারবো না। এইজন্য দোকানেও আজকাল শালপাতায় খেয়ে আঁজলা ভরে জল খাই। এঁটো গেলাস-থালায় খেয়ে অন্য লোকের যদি অসুখ করে!

কিছুতেই সে যেতে রাজী হলো না। পকেট থেকে তিন টাকা (এ ছাড়া আমার কাছে আর ছিল না) বের করে বললাম—টাকা ক'টা তোমাকে নিতে হবে। কোনো আপত্তি শুনবো না—তোমার এখন টাকার দরকার।

আমার দিকে তাকিয়ে রামদাস একটুখানি ভেবে তারপর বলল—দাও।

—থলের ভেতর কিছুতে বেঁধে রাখো, আবার না হারায়।

কাপড়ের খুঁটে সে শক্ত করে বেঁধে নিল। বাঁধবার সময় ফ্যাঁস করে একটু ছিঁড়ে গেল কাপড়টা। রামদাস মুখ তুলে অপ্রতিভ ভাবে হেসে বলল—বড্ড পুরোনো কিনা।

—আবার দেখা কোরো, আমাদের বাড়িতে যেও কাকা।

—যদি গুরু টেনে না নেন, নিশ্চয়ই যাবো খোকন।

—আমাকে খোকন বলছো, আমি কিন্তু আর ছোট নই।

রামদাস হেসে স্নেহপূর্ণ চোখে আমার দিকে তাকাল। একটা হাত আমার কাঁধে রেখে কি বলতে গিয়ে হাতটা সরিয়ে নিল। বলল—তোমাকে না ছোঁয়াই ভালো। যদি তোমার—

তাকিয়ে দেখলাম, ভবঘুরে রামদাস গুনগুন করতে করতে ক্রমশঃ দূরে চলে যাচ্ছে। জানি না, আর দেখা হবে কি না।

আজ রাত্তিরে অপূর্ব জ্যোৎস্না উঠেছে। রাস্তার পাশের গাছে বাসা বেঁধে-থাকা পাখিগুলো ডাকছে সকাল হয়ে গেছে মনে করে। চাঁদের আলোয় একবার বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। ঘাসের ওপর হালকা শিশির চক্‌-চক্‌ করছিল।

অনেকদিন আগে আমার পোষা কুকুর কালু যখন মারা যায়, মা বলেছিলেন—দেখিস বুড়ো, ভগবান ঠিক এসে বসে আছেন ওর কাছে। সেদিন আমি মার কথা বিশ্বাস করতে পেরেছিলাম, আজ হয়তো আর পারবো না। তবে এক নতুন বিশ্বাসে আমার মন ভরে উঠছে। ধর্মতলার মোড়ে সেদিনকার সেই খুকীটা যে পাউরুটি শক্ত করে ধরে দাঁড়িয়েছিল, সোলোগাব-এর গল্পের সেই আশী বছরের দুঃখী বুড়ো—সবাইকে আমার কত আপন বলে মনে হচ্ছে। এদের প্রতি ভালবাসায় আমার অন্ধকার ঘরে একটা নতুন জানালা খুলে দিয়েছে।

ক'দিন খুব নিশ্চিন্দিপুর যেতে ইচ্ছে করছে। এখন সেখানে শুকনো বাঁশপাতা ঝরে বাঁশবাগানের পথ আচ্ছন্ন হয়ে আছে, সোঁদা গন্ধ উঠছে বাঁশতলা থেকে। দুধরঙের সজনে ফুল ঘননীল আকাশের পটে থোকা থোকা ফুটে আছে। আমাদের পুরনো ভিটের সজনে গাছটা—যেটা ঠেলে উঠেছে আকাশে মাথা তুলে অনেকখানি। নদীতে নৌকোয় বসে-থাকা মাঝি হঠাৎ বোঝে, জলে জোয়ারের টান লেগেছে। একটু একটু করে কর্দমময় তীরে ঢেকে গিয়ে জল বাড়তে থাকে।

আমাদের পুরনো ভিটে কি চিরকালই অমনি পড়ে থাকবে—চামচিকে আর বাদুড় বাসা বানাবে কেবল? বাবার স্মৃতি কি একেবারে মুছে যাবে আমাদের সুন্দর গাঁ নিশ্চিন্দিপুর থেকে? আমি তা হতে দেবো না। আমি মাকে নিয়ে আবার ফিরে যাবে গাঁয়ে। শহর আমার থেকে যা কেড়ে নিয়েছে, আমার গ্রাম আমাকে তা ফিরিয়ে দেবে।

বেচারী রামদাসের কথা বড় মনে পড়ছে এ-সময়। এবার দেখা হলে বলবো—দুঃখ কোরো না, রামদাস-কাকা, আমি তোমাকে একটা নতুন দোতারা বানিয়ে দেবো।

॥ সমাপ্ত ॥